বিশেষ রচনা

রাধারমণ মিত্র-প্রসঙ্গে অনুপুঙ্খ আলোচনা

স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক-আন্দোলন

লালন ফকিরের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ
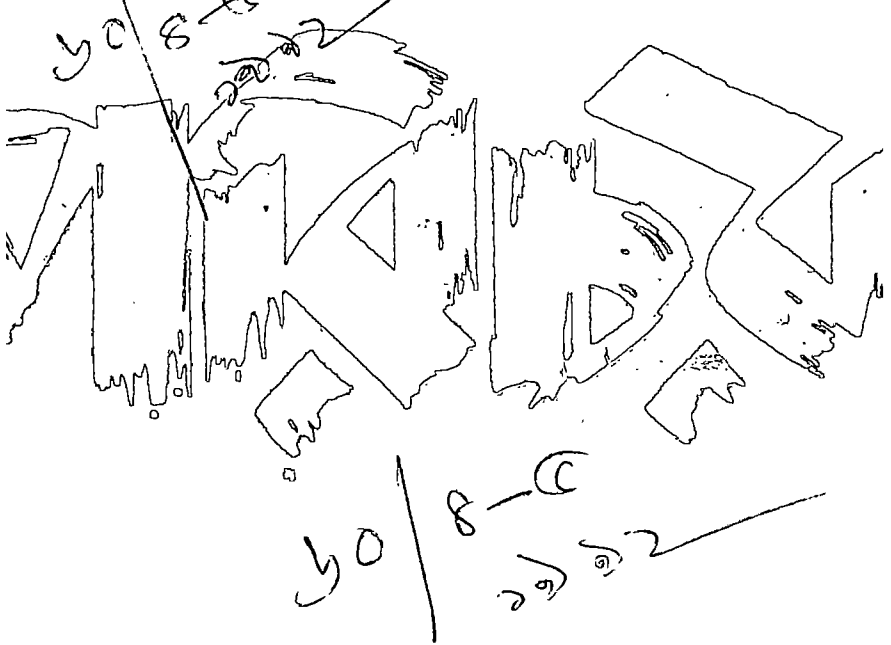
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়-এর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার

গল্প * কাব্যনাট্য * আলোচনা * পুস্তক-পরিচয়

চিত্রপ্রদর্শনী * নাট্যপ্রসঙ্গ * সংস্কৃতি-সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

* বাঙ্গালীর সংস্কৃতি (২ সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৫ টাকা
* বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন ১৫ টাকা
* বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৮ টাকা
* কলকাতা তিনশতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর ১২ টাকা
* ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার ৮ টাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

* সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য ৫ টাকা
* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত ২ টাকা
* রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত ৮ টাকা
* সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত ৩ টাকা
* সুকুমার : লীলা মজুমদার ১৪ টাকা
* বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত ১০ টাকা

সংকলনগ্রন্থ

* সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০ টাকা
* প্রেমচন্দ গল্প সংগ্রহ ৪৫ টাকা
* সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ ৫০ টাকা

মুখপত্র

* আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা
* আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

* আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১।১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০
* ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০৭৩
* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০৭৩
* মনীষা গ্রন্থালয় কলকাতা-৭০০০৭৩
* দে বুক ষ্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
* আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্রনস্কর রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০০১০

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
আই. সি. এ.………

..."ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ....

পরিচয়

৬০ বর্ষ ৪-৫ সংখ্যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ পৌষ-মাঘ ১৩৯৮

প্রবন্ধ

গল্প

কাব্যনাট্য

আত্মকথা

আলোচনা

শোকগাথা

নাট্য-প্রসঙ্গ

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মনীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা

অজয় রায়

আশির দশকে (১৯৮২—৯০) স্বৈরাচার- বিরোধী গণআন্দোলনে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী অংশের ভূমিকা সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে হলে বলতেই হয়, দীর্ঘ আট বছরের আন্দোলনে যখন ছিল ভাটার টান তখন তাঁরা যে-ভূমিকা পালন করেছেন তা সত্যিই সাহায্য করেছে সেই সময়-কালে আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে জাতির সামনে তুলে ধরতে। তাঁদের ভূমিকার সীমাবদ্ধতা যে ছিল না তা নয়। কিন্তু তা ভিন্ন কথা, ভিন্ন প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে এই নিবন্ধের কোনো এক পর্যায়ে আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করবো।

বুদ্ধিজীবীদের এই ভূমিকা আকস্মিক কোনো ব্যাপার ছিল না। আমি যে অংশের কথা বলছি, তাঁরা এ দেশের গণআন্দোলনে সব সময়ই পালন করে এসেছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পাকিস্তানী আমলের সময়পর্বটা বাদ দিয়ে সাম্প্রতিক সময়ের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করা যায় তাহলেও প্রতিভাত হবে উপরোক্ত বক্তব্যের সারবত্তা।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার ১৯৭৫-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর বা তার অব্যবহিত পরের মাসগুলোর। এই সময়েই সপরিবারে বঙ্গবন্ধু নিহত। এর কিছু পরে ৩ নভেম্বর থেকে ৭ নভেম্বর সংঘটিত অভ্যুত্থান ও পাল্টা-অভ্যুত্থানের ধাক্কায় গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরও বিপর্যস্ত। কারাগারের অভ্যন্তরে নিহত হন তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম সহ চার নেতা। এক হঠকারী সামরিক অভ্যুত্থানের বদৌলতে জেনারেল জিয়া হন ক্ষমতাসীন। ফলে দেশব্যাপী চালু হয় সামরিক শাসন। আর ক্ষমতাসীনদের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রুশ-ভারতের দালাল দের বিরুদ্ধে তথাকথিত অভিযানের নামে সমগ্র দেশজুড়ে শুরু হয় গণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে উন্মাদনা সৃষ্টির প্রচেষ্টা। মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বিরোধিতা করেছে সেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তখন পুনর্বাসিত। তৎকালীন একজন উপ-সামরিক প্রশাসকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে [যেখানে আত্মসমর্পণ করেছিল পাক বাহিনী] রাজাকারদের স্মৃতিস্তম্ভ

স্থাপনের সদম্ভ ঘোষণা। এমনি ধরনের আরও বহু ঘটনার উল্লেখ করা যায় সেই সময়কার অবস্থা বোঝাবার জন্যে।

এই সময়কালে বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিরুদ্ধে কোনো কথা বলাটা খুব সহজ ছিল না। যে রাজনৈতিক দলগুলি অংশ নিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে— সেই আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। তাদের অনেক নেতা ও কর্মী তখন জেলে। কেউ কেউ বাধ্য হয়েছেন দেশত্যাগ করতে। এই পরিস্থিতিতে দুটি প্রতিবাদী কণ্ঠ সচকিত করেছিল দেশবাসীকে। এঁদের একজন হলেন আবু জাফর শামসুদ্দিন, এ দেশের প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক এবং অপরজন আবুল ফজল। দুজনেই তাঁদের লেখায় প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন শেখ মুজিবের হত্যার বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্রের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে।

যাহোক, স্বাধীনতার পর আজ বিশ বছর অতিক্রান্ত। এই বিশ বছরের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধারায় দেশ শাসিত হয়েছে বড় জোর সাড়ে চার বছর। বাকি সময়টা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বৈরাচারই চেপে বসেছিল দেশবাসীর মাথার উপর। প্রকৃতপক্ষে, পাকিস্তানী আমল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক ধারা এখানে বিকাশ লাভ করতে পারেনি বললেই চলে। গণতান্ত্রিক জীবনধারা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বস্তুত এখনো রয়েছে প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু তাসত্ত্বেও গণতন্ত্রের জন্য আকাঙ্ক্ষা আমাদের দেশবাসীর মনে কত তীব্র তা বারংবারই অভিব্যক্ত হয়েছে আন্দোলনের বিভিন্ন পর্বে। পাকিস্তানী আমলে তা যেমন প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি স্বাধীনতা-উত্তর কালেও তা অভিব্যক্ত হয়েছে বহুবারই। বাংলাদেশের অগ্রণী বুদ্ধিজীবীরা এক্ষেত্রে বরাবরই পালন করে এসেছেন পুরোধার ভূমিকা। ১৯৭৫ সালে এবং তার অব্যবহিত পরে আবু জাফর শামসুদ্দিন আর আবুল ফজল এই ধারাকেই এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

১৯৮২—৯০ সালের সময়পর্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গেলে এই পটভূমিটিকে বিস্মৃত হলে চলবে না। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি এবার মূল আলোচনায় প্রবেশ করতে চেষ্টা করবো। তবে তার আগে একটি কথা বলা প্রয়োজন। বুদ্ধিজীবী বলতে এখানে আমি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, গায়ক, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও ব্যবহার-জীবীর ন্যায় বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরই কথাই বোঝাতে চাইছি। সমাজের এই অংশের ভূমিকাই বর্তমান আলোচনার প্রধান উপজীব্য।

২

বাংলাদেশে ১৯৮১ সালের ১৫ নভেম্বর দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কারণ, মে মাসে জেনারেল জিয়া নিহত হবার পরে এই নির্বাচন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। অন্তবর্তীকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি অব্দুস সাত্তার। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী হিসেবে তিনিই জয়লাভ করেন। অতঃপর লেঃ জেঃ এরশাদের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় ২৪ মার্চ, '৮২। বস্তুত, জিয়ার মৃত্যুর আগে থেকেই এরশাদ উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠছিলেন, সেই ধারাতেই তিনি পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেন '৮২-র মার্চ। সামরিক শাসন জারী করতে গিয়ে তিনি ঘোষণা করেন ঃ

ক) ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বুধবার থেকে আমি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

খ) আমি যে-কোনো ব্যক্তিকে দেশের প্রেসিডেন্ট মনোনীত করতে পারি।...আমি সময় সময় এই মনোনয়ন বাতিল বা রদ করতে পারি এবং তখন অন্য এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন এবং তিনিই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকরূপে আমার উপদেশ অনুসারে কাজ করবেন এবং আমি যেসব কাজের দায়িত্ব দেবো তা পালন করবেন।"

ঘোষণার এই অংশ থেকে এরশাদ-শাসনের স্বৈরাচারী চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, সংবিধান স্থগিত রাখা হয়েছিল এই সময়।

ক্ষমতা হস্তগত করার পর থেকে ক্ষমতাচ্যুতির মুহূর্ত পর্যন্ত এরশাদ নিষ্ঠার সঙ্গে একটি কাজই করেছেন, তা হলো স্বৈরাচার স্থায়ী করার জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা। বারংবার সংবিধান সংশোধন, বিচার-ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ, প্রশাসনিক কাঠামোর রদ-বদল, শিক্ষা-সংস্কৃতি সহ সমাজজীবনের নানা ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি হাসিল করতে চেয়েছেন উল্লেখিত লক্ষ্য। রাজনীতিকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সুবিধাবাদ, ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া, দুর্নীতি প্রভৃতিকে প্রশ্রয় দান থেকে শুরু করে তাঁর স্বার্থসিদ্ধির জন্য করেননি এমন কোনো কাজ নেই। এমনকি তিনি আশ্রয় নিয়েছেন সাম্প্রদায়িকতারও। প্রশ্রয় দিয়েছেন সর্বপ্রকার প্রতিক্রিয়াশীলতাকে। আন্দোলনের মুখোমুখি হয়ে সময় সময় নমনীয়তার কথা বললেও সুযোগ পাওয়া মাত্র তিনি ফিরে এসেছেন

নিজের লক্ষ্য হাসিল করার কাজে। আর এইভাবেই স্বৈরাচারকে স্থায়ী করার প্রয়াস পেয়েছেন আগাগোড়া।

ক্ষমতা হাতে নেবার পর প্রথম যে কাজগুলিতে এরশাদ হাত দেন তার মধ্যে একটি হলো—নতুন শিক্ষানীতি ঘোষণা। ১৬ জুলাই '৮২তে তিনি ঘোষণা করেন যে, তাঁর সরকার একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। এই ঘোষণার কিছুদিন পর তিনি প্রকাশ করেন একটি 'শিক্ষানীতি'। এই শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষা ছাড়াও প্রথম শ্রেণীতে আরবী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়। ছাত্র-শিক্ষকেরা এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে অক্টোবর মাসেই প্রতিবাদের মাধ্যমে আন্দোলনের সূচনা করেন। 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় অক্টোবর ৮, ১৯৮২তে প্রকাশিত এক খবর থেকে জানা যায়, "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কার্যকরী সংসদের পক্ষ হইতে প্রদত্ত বিবৃতিতে বলা হয়, প্রথম শ্রেণীতে আরবী ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইংরেজি সহ তিনটি ভাষা বাধ্যতামূলক করার ফলে কেবল যে মাতৃভাষার গুরুত্ব কমিয়া যাইবে তাহাই নয়, এইরূপ ব্যবস্থা অপ্রয়োজনীয় এবং তাহা যুক্তিযুক্ত নহে।"

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির বিবৃতিতে বলা হয়, "প্রাথমিক স্তরেই মাতৃভাষা ছাড়া আরও দুইটি বিদেশী ভাষা শিক্ষালাভ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার।"

শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সূচিত স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামের এক পর্যায়ে স্বৈরাচার-বিরোধী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনকে নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৩-এর মধ্য ফেব্রুয়ারীতে প্রণীত ১০ দফা দাবিনামার অন্যতম একটি দাবি হলো :

"সামরিক সরকার ঘোষিত ডাঃ মজিদ খানের গণবিরোধী শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে।

"পাঠ্যসূচীতে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, জাতীয় গৌরবগাথা সমূহ এবং গণমানুষের মুক্তির লক্ষ্যে প্রতিপালিত বিভিন্ন আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস ও চেতনা সমূহ সন্নিবেশিত করতে হবে।

"সাধরণ মানুষের শোষণমুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক, অসাম্প্রদায়িক, গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে।

"মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে হবে।"

এই আন্দোলনের ফলে শিক্ষানীতির নামে এরশাদ-সরকার যা করতে

চেয়েছিল তা পুরোপুরি হাসিল করতে পারেনি ঠিকই [অর্থাৎ, মজিদ খানের শিক্ষানীতি পুরোপুরি চালু করতে পারেনি] তবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ন্যায় কিছু কিছু ব্যাপার তারা কার্যকর করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে একুশে ফেব্রুয়ারীর গৌরবময় অবদান অবশ্যই স্বীকার্য। রাজনৈতিক আন্দোলনে যখন ভাটার টান, স্বৈরাচারের ছোবলে যখন সমগ্র জাতি বিপর্যস্ত ও রক্তাক্ত তখন বহুবারই ২১ ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে সূচনা হয়েছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উত্তাল তরঙ্গ। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে যেসব অগণতান্ত্রিক ও প্রতিক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ড শুরু করেন তার বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীরা প্রতিবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করেন রাজনৈতিক দলগুলোর আগেই। ১৯৮৩-এর ১৯ জানুয়ারী ঐক্যবদ্ধভাবে একুশে ফেব্রুয়ারী পালনের আহ্বান জানিয়ে কয়েকজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন :

"মহান একুশে ফেব্রুয়ারী সমাগত। আজ থেকে ৩১ বছর আগে আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি তথা জাতিসত্তার উপর প্রতিক্রিয়ার আঘাত প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে যে-যাত্রা শুরু হয়েছিল, পরবর্তীকালে তাই মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে এনেছে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ; কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেও আমাদের ভাষা-সংস্কৃতি তথা জাতীয় অগ্রগতি নিষ্কণ্টক নয়। প্রতিক্রিয়া ও কায়েমী-স্বার্থবাদীরা আজও চক্রান্তে লিপ্ত। অপসংস্কৃতির প্রসার ও রক্ষণশীলত র পরিপোষণের ফলে শিল্প ও সংস্কৃতি জগৎ বিপর্যস্ত হতে চলেছে।...আর সেই জন্য আগামী একুশে ফেব্রুয়ারী ঐক্যবদ্ধভাবে পালনের মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধগুলিকে রক্ষার চেতনা পুনরায় শাণিত করে তোলার জন্য আমরা সকল সংস্কৃতিকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক সংগঠন সমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।" ১৯৮৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী গঠিত হয়-৪৪ সদস্য-বিশিষ্ট 'একুশে উদ্‌যাপন কমিটি, ১৯৮৩'। ৪৩টি প্রগতিশীল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'একুশে উদ্‌যাপন কমিটি, ১৯৮৪'। এরপর একই বছরে আরও কয়েকটি সংগঠন সহ মোট ৪৭টি সংগঠনকে নিয়ে গঠিত হয় 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট'। এটি গঠিত হবার পর থেকে এই জোট স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন পালন করে এসেছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। কোনো সময় এককভাবে, কোনো সময় বুদ্ধিজীবীদের অন্যান্য অংশ, যথা— আইনজীবী, চিকিৎসক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষদের সঙ্গে একযোগে 'সম্মিলিত পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ'-এর মাধ্যমে এঁরা রাজনৈতিক

দল ও জোটগুলির পাশাপাশি স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। '৮২—৯০ পর্যন্ত স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের এটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই জোট এখনো সক্রিয়। গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজ-প্রগতির ধারায় স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা থেকেই এঁরা অবদান রেখে চলেছেন এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অগ্রণী অংশও শামিল হয়েছেন একই কাজে।

প্রবন্ধের কলেবরের দিকে লক্ষ্য রেখে এবার আমি এই সময়কালে বুদ্ধিজীবীদের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

৩

সাম্প্রদায়িকতা এ দেশে সবসময়েই প্রতিক্রিয়ার অন্যতম হাতিয়ার। এরশাদও এই হাতিয়ারকে ব্যবহার করতে কসুর করেননি। জনগণের ধর্ম-প্রাণতাকে ব্যবহার করে তিনি গণতন্ত্রের দাবিতে বিকাশমান আন্দোলনের মোকাবিলা করতে চেষ্টা করেছেন বার বার। সাম্প্রদায়িকতা, বিভেদ ও দমননীতি—এগুলিই ছিল প্রকৃতপক্ষে শাসন-পরিচালনায় এরশাদের প্রধান হাতিয়ার।

'৮৭ সালের মে মাসে রমজান মাস উপলক্ষে সকল হোটেল-রেস্তোরাঁ বন্ধ রাখার সরকারী নির্দেশের প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের ২৮ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, আমরা রমজান মাসের পবিত্রতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেই মনে করি এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামের নামে স্বৈরাচারী উদ্যোগ ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রমজীবী ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কথা উল্লেখ করে বলা হয়, হোটেল-রেস্তোরাঁ পুরোপুরি বন্ধ রাখা নির্যাতন ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের শামিল।

এই বিবৃতি সেদিন প্রতিক্রিয়াশীল, তথাকথিত ধর্ম-ব্যবসায়ী ও সরকারের দালাল সংগঠনগুলির মধ্যে সৃষ্টি করে তীব্র উত্তেজনা। ৬মে, '৮৭তে 'ইনকিলাব পত্রিকায় 'অমার্জনীয় ধৃষ্টতা' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয় এই বিবৃতিদাতাদের বিরুদ্ধে।

আন্দোলনের চাপে এরশাদ যখন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তখন আন্দোলনকারী রাজনৈতিক জোট ও শক্তিগুলির দাবি অনুসারে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি রূপে নিয়োগ করে তার হাতে ক্ষমতা

হস্তান্তর এবং উক্ত নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গঠিত সরকারের পরিচালনায় অবধি ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর—এটাই ছিল গণতন্ত্রে উত্তরণের সর্বজনস্বীকৃত ফর্মূলা। ' এরশাদ এই ফর্মূলাকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই ফর্মূলাটি ১৯৮৭ সালের ৩০ মার্চ প্রথম উত্থাপন করেন ৩১ জন ও পরে ২৮ জুলাই ১২৪ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী। শেষের বিবৃতিটিতে তাঁরা বলেন, 'আমরা মনে করি নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমেই শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই লক্ষ্যে দেশে একটি নির্দলীয় বেসামরিক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের দাবিতে ব্যাপক মতৈক্য গড়ে তোলার জন্য আবারও আমরা রাজনৈতিক দল, সামাজিক শক্তিসহ সকল স্তরের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।"

আবার ৮ নভেম্বর '৮৭-তে দেশের ২২জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে সংগ্রামরত বিরোধীদলগুলির কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে নতুন নির্বাচনের দাবী জানান। যে-সময়ের কথা এখানে বলা হচ্ছে, সেই সময় এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন আবার দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ১০ নভেম্বর ৮৭তে ঘোষিত হয়েছে ঢাকা অবরোধের কর্মসূচী। আন্দোলনে দুই প্রধান জোটের নেত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ ও বেগম খালিদা জিয়ার মধ্যে তখনকার মতো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মতৈক্য। পূর্বোক্ত বিবৃতিতে বুদ্ধিজীবীরা বলেন "...আজ দেশবাসীর মনে এই আশার সঞ্চার হয়েছে যে, বিরোধী দলীয় তিনটি জোটসহ দেশের সকল গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তি আরো সংহত, সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ ঐক্য অর্জন করবেন এবং তার ফলে মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক চেতনা ও জনগণের সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে দেশে আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূচনা হবে।"

বস্তুত, আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে তিনজোটের যুক্ত ঘোষণাই আন্দোলনকে বেগবান করে এরশাদের পতন সম্ভব করে তোলে।

এরশাদের শাসনকালে পরিকল্পিতভাবে পীরদের সামনে আনার চেষ্টা হয়। যাঁদের সেদিন সামনে আনার চেষ্টা হয়েছিল আটরশির পীরসাহেব তাঁদের অন্যতম। সেই আটরশিতে পীরসাহেবের বিশ্বজাকের মন্‌জিলে চারদিন ব্যাপী ওরসের প্রথম দিনে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, "দেশে ইসলামের

পুনর্জাগরণ দেখে আমি আনন্দিত। বাংলাদেশ দশ কোটি মুসলমানের দেশ। কিন্তু এখনো আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্ম সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। জনগণের সহযোগিতায় ইসলাম একদিন রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রকৃত মুসলমান।"

১৯৮৮ সালের ১৩ মার্চ শার্ষিনায় বার্ষিক ওরস উপলক্ষে ভাষণ দেবার সময় এরশাদ বলেন, ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণার ব্যাপারে একটি বিল আগামী অধিবেশনে পেশ করা হবে ; এই দিনই জনসভায় দাঁড়িয়ে তিনি বাংলাদেশ রেডক্রসের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ রেড ক্রিসেণ্ট সোসাইটি' করার কথা ঘোষণা করেন। এর পরেই সেই সময়কার তথাকথিত জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রধর্ম বিল উত্থাপনের মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এই ঘোষণাটির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল ও জোটগুলি যেমন প্রতিবাদ জানান, তেমনি প্রতিবাদ জানাতে এগিয়ে আসেন বুদ্ধিজীবীরাও। জুন ২, ৮৮-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের এক সম্মেলনে গঠিত হয় 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি'। সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয় :

'বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার জনগণের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার পর তাদের অবৈধ জাতীয় সংসদে অষ্টম সংশোধনী নামে একটি বিল উত্থাপন করে দেশবাসীকে সাম্প্রদায়িক ও ধর্মগতভাবে বিভক্ত করার এক ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। দেশের সংবিধানের এই সংশোধনী মুক্তি-যুদ্ধের মূল চেতনাকে সরাসরি আক্রমণ এবং জাতীয় জীবনে বিদ্যমান সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করছে বলে আমাদের আশঙ্কা। একই সঙ্গে এই সংশোধনী বিচার-বিভাগের স্বাধীনতাও খর্ব করেছে। এই বিল পাশ হলে একদিকে যেমন নাগরিকদের গণঅধিকার ক্ষুণ্ণ হবে, অপরদিকে তেমনি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

'সবচেয়ে ভয়াবহ বিষয় হচ্ছে এই যে, হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের এই সরকারী পদক্ষেপ সমাজে সাম্প্রদায়িকতাকে পুনরুজ্জীবিত করবে, স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি এর দ্বারা উস্কানি পাবে, যার ফলে তারা দেশের জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল শক্তিসমূহের উপর আক্রমণ করবে, যার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে এবং বহুক্ষেত্রে হত্যার খবরও

পাওয়া যাবেই। এসব ক্ষেত্রে সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ধর্মান্ধ, মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মদদ যোগাচ্ছে।

'আমরা মনে করি যে, এই বিল পাশের মাধ্যমে হিন্দু, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীরা এবং ধর্মনির্বিশেষে নারীসমাজ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত এবং নানাবিধ সামাজিক নিপীড়ন ও রাষ্ট্রীয় বৈষম্যের শিকার হবেন। আমাদের মনন ও সাংস্কৃতিক জীবনে মুক্তবুদ্ধির চর্চাও বিঘ্নিত হবে।

'নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করবার অভিলাষে সরকার যে ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার প্রতিবাদ করাই যথেষ্ট নয়, আমরা মনে করি এর বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আমরা দলমত নির্বিশেষে দেশের সর্বশ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ও প্রগতিশীল নাগরিকদের একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলবার আহ্বান জানাই। আসুন, সাম্প্রদায়িকতা ও স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাই।'

বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিবাদ সত্ত্বেও সেদিন তথাকথিত জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রধর্ম বিল গৃহীত হয়। বিবৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা বিস্তারের উল্লেখিত আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হতেও সময় লাগে না। ভারতের বাবরি মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও উস্কানীতে অক্টোবর ৩১ ও নভেম্বর ১৯৯০ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম সহ সারা দেশে বহু মন্দির ধ্বংস, নানা জায়গায় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দোকানপাট ও কোনো কোনো এলাকায় বাড়িঘরে আক্রমণ চালানো হয়। এর প্রতিবাদে সেদিনও বলিষ্ঠ ভূমিকা নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেন বুদ্ধিজীবীরা।

কবি হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে ভালবাসতেন এরশাদ। নিজেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিদেশে দূতাবাসের মাধ্যমে তিনি যেমন নিজের বই বিলি করেছেন, চেষ্টা-তদ্বির করে বিদেশের বিভিন্ন জনের সার্টিফিকেট যোগাড় করেছেন, তেমনি দেশের মধ্যে স্তাবকদের সহায়তায় 'এশীয় কবিতা উৎসব' নামে এক অনুষ্ঠানও সংগঠিত করেছেন। স্বাভাবিক ভাবে এরশাদের দাবি এবং দেশের মধ্যে কিছু কবির স্তাবকতা কবিদের মধ্যে সৃষ্টি করে এক ব্যাপক ক্ষোভ। আর, এর থেকেই জন্ম হয় জাতীয় কবিতা-উৎসব ও কবিতা পরিষদের।

১৯৮৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারী ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম জাতীয় কবিতা

উৎসব। উৎসবের ঘোষণায় বলা হয়, "... কয়েক দশক ধরে বাংলার মানুষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে স্বৈরাচার ও সমরবাদের দূষিত পরিবেশে। এখানে শৃংখলিত সবাই। এই শৃংখল ভেঙে দেয়ার জন্য আমাদের কবিতা, ওই শেকল যাতে আর বাঙালীর হাতে-পায়ে না জড়ায় তার জন্য আমাদের জাতীয় কবিতা-উৎসব।"

তারপর থেকে একই ধারায় ১ ও ২ ফেব্রুয়ারী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে নিয়মিতভাবে। '৮৮-র উৎসবের মূল শ্লোগান ছিল 'স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কবিতা'। উৎসবের শেষ দিনে শেষ অনুষ্ঠানের সভাপতি শিল্পী কামরুল হাসান মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগে এঁকেছিলেন এরশাদের একটি কার্টুন। নিচে লিখেছিলেন— দেশ আজ বিশ্ব বেহায়ার খপ্পরে।' এই কার্টুন পরে হাজার হাজার কপি বিতরণ করা হয়েছিল সারা দেশে। '৮৯-এর উৎসবের মূল শ্লোগান ছিল—'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবিতা'। '৯০-এর উৎসবের শ্লোগান ছিল—'কবিতা রুখবেই সন্ত্রাস'।

উপরে যেটুকু বিবরণ দেওয়া হলো তার থেকে গণআন্দোলনে বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীরা কোন ভূমিকা পালন করেছেন তা আঁচ করা যায়। এই সংগ্রাম ছিল যেমন স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামে সরাসরি বা প্রায়-সরাসরি সামিল হওয়া, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ও সপক্ষে, গণতন্ত্রের, তেমনি তা ছিল সরকারী উদ্যোগে বাঙালী সংস্কৃতির চিরায়ত মূল্যবোধ ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিনষ্ট করার বিরুদ্ধে পরিচালিত। এজন্য বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিসেবীদের বিভিন্ন অংশ যেমন মিছিলে সামিল হয়েছেন, তেমনি নিজ নিজ ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির মাধ্যমে রচনা করেছেন প্রতিরোধ। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে হয় বাংলাদেশের নাট্য-আন্দোলন ও গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের কথা।

১৯৮১ সালে 'প্রস্তুতি পরিষদ' আয়োজিত প্রথম বার্ষিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। গঠনকালে ফেডারেশনভুক্ত দলের সংখ্যা ছিল ৬৭টি। বর্তমানে আরও বেশি। স্বৈরাচার-বিরোধী গণআন্দোলনের শেষের দিকে, ডিসেম্বর-এর প্রথম সপ্তাহের সেই উত্তাল দিনগুলিতে, গ্রুপ থিয়েটারের কর্মীদের ভূমিকা কোনদিনই বিস্মৃত হবার নয়। সম্মিলিত সংস্কৃতি জোটের অংশ হিসেবে ঢাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল, রাস্তার মোড়ে মঞ্চ তৈরি করে দিনরাত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে

সূচনা করে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সেদিন এঁদের প্রতিষ্ঠিত মুক্তমঞ্চ প্রকৃতই হয়ে উঠেছিল আন্দোলনের এক প্রধান কেন্দ্র।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন গঠনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯৮১ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম বারের জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলন। প্রতিবছর জেলা-পর্যায়ে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা-শেষে কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতা এবং সম্মেলন আজ একটি ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে। এর পরিধি ও প্রভাব আজ বাঙালী সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখায় পরিব্যাপ্ত। ১৯৮২ সালে দ্বিতীয় জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মেলনের ঘোষণায় বলা হয়: "বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পথ ধরে সংকীর্ণ চিন্তাভাবনা বর্জন করে শাশ্বত মানবসত্যের অভিমুখে যাত্রা করার দিন এসেছে। জনজীবনে এ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব সংস্কৃতিবান সকল মানুষের। বাইরের বাধার কথা ভেবে দীর্ঘকাল আমরা এ দায়িত্ব পালনে বিরত থেকেছি। সম্মিলিত হয়ে আজ আমাদের সাংস্কৃতিক উজ্জীবনের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।"

মোটকথা, এই নিবন্ধে বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিকর্মীদের এই সময়কালের বহুমুখী কাজের খুবই সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ দেয়া সম্ভব হলো মাত্র। তবে সব প্রয়াসের একটিই ছিল মূল লক্ষ্য—গণতন্ত্র, সাম্প্রদায়িকতা, বাঙালী সংস্কৃতির উজ্জীবন ও সমাজ-প্রগতির পথে যাত্রা।

৪

বাংলাদেশে স্বৈরশাসন একাধিক দিক থেকে বিভিন্ন মাত্রায় আত্মপ্রকাশ করেছিল অর্থনীতির ক্ষেত্রেও। প্রথমত, রাষ্ট্রের উচ্চতম পর্যায়ে শুরু হয়েছিল এক অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতা: দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপ্রধানের অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচারিতার ফলে দুটো প্রত্যক্ষ মাত্রিকতা যুক্ত হয়। এক, দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শৃংখলা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। দুই, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জবাবদিহি করার মতো কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তৃতীয়ত, প্রতি বছর বল্গাহীন ব্যয়ই হয়ে উঠেছিল রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুখ্য। আর, চলতি ব্যয় বৃদ্ধির কারণেই সংকুচিত হয়ে চলেছিল উন্নয়ন খাতের ব্যয়। ফলে, উন্নয়ন বাজেটের মূল আঘাত গিয়ে পড়ছিল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়নের মতো সামাজিক অবকাঠামোর উপর। চতুর্থত, যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান ও তার সহযোগীদের সম্পদ কুক্ষিগত করার বর্ধিত চাহিদা অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে মেটানো ক্রমেই কঠিন হয়ে উঠেছিল, সেইহেতু তারা

আরও বেশি করে বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যকে স্বাগত জানাতে থাকে। পঞ্চমত, স্বৈরশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পরজীবী চরিত্রের যে ধনিক শ্রেণী গড়ে ওঠে তারা স্বৈরশাসনের দুর্বলতা জানতো বলেই বাইরে সম্পদ পাচারে লিপ্ত হয় গত এক দশক জুড়ে। ষষ্ঠত, জনগণ ও রাষ্ট্রের সম্পদ নির্বিচারে লুণ্ঠন করাই ছিল শাসকশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য।

এই সংকটকালে স্বৈর-অর্থনীতির বিরুদ্ধে অর্থনীতিবিদদের পর্যালোচনা-মূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ যেমন বাঙলার অর্থনীতি-চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি জনমনে স্বৈর-অর্থনীতি সম্পর্কে সৃষ্টি করে এক সাধারণ সচেতনতা। অর্থনীতির ক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান, নিয়ম-শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জবাবদিহির প্রয়োজনীয়তা, উন্নয়ন বাজেটের প্রাধান্য প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সাধারণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জনগণের মধ্যে। জবাবদিহি-সম্পন্ন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ভিন্ন বাংলাদেশ ও জনগণের অগ্রগতি যে সম্ভব নয় সে সত্যটিও অর্থনীতিবিদরা জনসমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হন।

৫

বাংলার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন, ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই বিচার-বিভাগের স্বাধীনতার উপর এরশাদ বারংবারই আক্রমণ করেছেন। এই আক্রমণের একটিই উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো বিচার-বিভাগকে স্বৈরশাসনের অনুগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। এটা তারা করেছে নানা ভাবে, যথা—সামরিক শাসন জারীর সঙ্গে হাইকোর্ট, সুপ্রীমকোর্টে রীট আবেদনের উপর বিচারের এক্তিয়ার নাকচ করে, হাইকোর্ট-সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগের অধিকার রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত রেখে এবং বিকেন্দ্রীকরণের নামে হাইকোর্টের ক্ষমতা হ্রাস করে। এমনি ধরনের অসংখ্য নানা পন্থার মাধ্যমে বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতাকে খর্ব করা হয়।

এরশাদের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আইনজীবীরা সামরিক শাসনের এক বছরের মধ্যেই সংগঠিত আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৮৩ সালের ২০ মে দেশের আইনজীবী সমিতি সমূহের এক সম্মেলন সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বক্তারা সামরিক আইন প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, সংবিধানের পুনরুজ্জীবন, বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা, হাইকোর্ট বিভাগকে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর, সামরিক

আইনের আদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। এই দাবিগুলিকে একত্রিত করে গৃহীত হয় ১৭ দফা দাবি ও প্রস্তাব।

এই সম্মেলনের পর আন্দোলন থেকে আইনজীবীরা আর কোনদিন পিছু হটেন নি। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দাবিতে তাঁরা নিজেরা যেমন সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করেছেন, তেমনি শরিক হয়েছেন রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের ঘোষিত আন্দোলনে। এজন্যে তাঁরা আদালত বর্জন করেছেন, মিছিলও করেছেন রাজপথে। আন্দোলন করতে গিয়ে কারাবরণ করতেও দ্বিধা করেননি আইনজীবীদের নেতারা।

শুধুমাত্র আইনজীবীরাই নন, সাংবাদিক, চিকিৎসকসহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিতরাও সামিল হয়েছেন স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামের ডাকে।

১৯৮২—৯০, এই কালপর্বে স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার যে সামান্য পরিচয় এখানে তুলে ধরা হলো তা থেকে আন্দোলনে এঁদের ভূমিকার ব্যাপকতা ও জাতীয়তা সম্পর্কে কিছুটা আঁচ করতে পারা যায়।

সমাজজীবনে এই অংশের প্রভাবের বিষয়টি মনে রেখে এরশাদ ও তার সরকার নানাভাবে এঁদের প্রভাবিত করতে চেষ্টা করেছেন। সেজন্যে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার একদিকে যেমন নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বুদ্ধিজীবীদের বিপথগামী করার প্রয়াস পেয়েছে, তেমনি ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণাকে প্রশ্রয় দিয়ে সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছে বিভ্রান্তি। অন্যদিকে সংবাদপত্র ও প্রচার-মাধ্যমগুলি নিয়ন্ত্রণ করে তাঁরা আয়ত্তে আনতে চেষ্টা করেছে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। আর জনগণের মধ্যে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেছে পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন সাধন করতে। এর ফল কিছু যে হয়নি তা নয়, ইতিহাস-বিকৃতির জন্য তাদের প্রচেষ্টা কিছুটা হলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে বই কি!

এতদসত্ত্বেও বলা যায়, বুদ্ধিজীবীসমাজের অগ্রণী অংশ সবসময়ই ছিলেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামী যোদ্ধা। গণতন্ত্র, আইনের শাসন এবং জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার দাবিতে তাঁরা সবসময়েই প্রয়াস পেয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তুলতে। বস্তুত, আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি হয় তা বাস্তব করে তোলার আবহ সৃষ্টিতে এঁদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অনেক সময়েই তা পথিকৃতের, বলা যায় এই

সমগ্র সময়কাল জুড়ে আন্দোলনের মাধ্যমে, তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন এক উল্লেখযোগ্য জাতীয় শক্তিরূপে।

বাংলাদেশ বর্তমানে গণতন্ত্র ও সমাজ-প্রগতির অন্বেষায় এক নতুন পর্ব অতিক্রম করছে। বলা বাহুল্য, এই কালপর্বও অবশ্যম্ভাবীরূপে নানা সমস্যা-সংকটে আকীর্ণ। আর, এই পর্বেও গণতন্ত্র ও সমাজ-প্রগতির সংগ্রামে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় তাঁদের ঐতিহ্যময় গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা যে পালন করবেন তাতেও সন্দেহ নেই। তার লক্ষণ ইতোমধ্যেই দৃষ্টিগোচর।*

---

* এই নিবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত অজয় রায় বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রবীণ নেতা। তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং ঐ দেশের অগ্রগণ্য লেখক ও বুদ্ধিজীবী রূপে সুপরিচিত। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে তিনি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা' শীর্ষক এই নিবন্ধটি তাঁর কর্মব্যস্ততার মধ্যেও লিখে পাঠিয়েছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি নিয়ে লেখা বিভিন্ন রচনাও আমরা ভবিষ্যতে 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করি।

—সম্পাদক

লালন সাঁই : তাঁর শিল্পচেতনার স্বরূপ

আবুল আহসান চৌধুরী

বাউলগান বাঙলার একটি প্রধান লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের সাধনসঙ্গীত। তাঁদের অধ্যাত্ম-সাধনার গূঢ়-গুহ্য পদ্ধতি কেবল দীক্ষিত শিষ্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যেই এই গানের আত্মপ্রকাশ। শিল্প-সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস এখানে অনুপস্থিত। লালনও তাই বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণায় তাঁর গান রচনা করেননি, বিশেষ উদ্দেশ্য-সংলগ্ন হয়েই তাঁর গানের জন্ম। তবে উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনকে অতিক্রম করে লালনের গান অনায়াসে শিল্পের সাজানো বাগানে প্রবেশ করেছে স্বমহিমায়। লালনের গান তাই একাধারে সাধনসঙ্গীত, দর্শনকথা ও শিল্পশোভিত কাব্যবাণী। তত্ত্বসাহিত্যের ধারায় চর্যাগীতিকা বা বৈষ্ণব পদাবলী সাধন-সঙ্গীত হয়েও যেমন উচ্চাঙ্গের শিল্প-সাহিত্যের নিদর্শন, তেমনি বাউলগানের শ্রেষ্ঠ নজির লালনের গান সম্পর্কেও এই একই কথা প্রযুক্ত।

দীর্ঘজীবী লালন প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে গান রচনা করেছেন। তাঁর গানের সঠিক সংখ্যা কতো তা নির্ণয় করা না গেলেও কেউ কেউ অনুমান করেন তা অনায়াসেই হাজারের কোঠা ছাড়িয়ে যাবে। লালন ছিলেন নিরক্ষর, প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ তাঁর হয়নি। কিন্তু তাঁর সঙ্গীতের বাণীর সৌকর্য, সুরের বিস্তার, ভাবের গভীরতা আর শিল্পের নৈপুণ্য লক্ষ্য করে তাঁকে শিক্ষা-বঞ্চিত নিরক্ষর সাধক বলে মানতে দ্বিধা থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে লালন ছিলেন স্বশিক্ষিত—'দীর্ঘ শতবর্ষ ধরে ইনি জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছেন'।[১] ভাবের সীমাবদ্ধতা, বিষয়ের পৌনঃপুনিকতা, উপমা-রূপক-চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যহীনতা, ও সুরের গতানুগতিকতা থেকে লালন ফকির বাউলগানকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর সমকালে তাঁর গান লৌকিক ভক্তমণ্ডলির গণ্ডি অতিক্রম করে শিক্ষিত সুধীসমাজকেও গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। উত্তরকালে লালনের গান দেশের ভূগোল অতিক্রম করে বিদেশেও স্থান করে নিয়েছে। তাঁর গান উচ্চ শিল্পমানের পরিচায়ক বলেই এই অসামান্য সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। লালনের গান আজ সঙ্গীত-সাহিত্যের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

বাউলগানের রসিক বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১) প্রসঙ্গক্রমে একবার বলেছিলেন :

> অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চ'লে গেছে, তা চল্‌তি হাটের শস্তা দামের জিনিষ হ'য়ে পথে পথে বিকোচ্চে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ —তার অনেকগুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টান্‌বার প্রচারকগিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিষের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব, খাঁটির জন্যে অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর ক'রে চিন্‌তে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্যে কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চল্‌তে থাকে। এইজন্যে সাধারণতঃ যে-সব বাউলের গান যেখানে সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক্‌ থেকে তার দাম বেশী নয়।[২]

সাধারণ বাউলগানের এই যে বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে লালনের গানের তুলনা করলেই লালনগীতির স্বাতন্ত্র্য ও উৎকর্ষ অনায়াসে ধরা পড়বে। লালনের মতো একজন নিরক্ষর গ্রাম্য সাধককবির শিল্প-ভুবনে প্রবেশ করলে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

লালনের গানে শিল্পের প্রসাধন কিভাবে সেই গানের লালিত্য ও সৌন্দর্য প্রকাশ করেছে এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় গ্রহণ করবো।

কেবল সংখ্যায় নয়, শিল্পগুণেও লালনের গান বাউলসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ভাব-ভাষা, ছন্দ-অলঙ্কার বিচারে এই গান উচ্চ শিল্পমানের পরিচায়ক —এবং তা তর্কাতীতরূপে কাব্যগীতিতে উত্তীর্ণ।

শব্দের জীয়ন-কাঠিই কবিতা কিংবা গানের শরীরে প্রাণ-প্রবাহ সঞ্চার করে থাকে। কুশলী শিল্পীর হাতে প্রচলিত শব্দ নতুন ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য নিয়ে ধরা দেয়। প্রয়োগ-নৈপুণ্যে আটপৌরে শব্দও যে কীভাবে নতুন অর্থ-ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, লালনের গানে তার উজ্জ্বল উদাহরণ বিদ্যমান। লালন ছিলেন শব্দ-কুশলী ও শব্দ-সচেতন শিল্পী। 'বাড়ির কাছে আরশিনগর সেথা এক পড়শী বসত করে' লালনের একটি প্রাতিস্বিক গান। এখানে পরম আকাঙ্ক্ষিত অচিন এক পড়শীর সঙ্গে মিলনের ব্যাকুলতা প্রকাশিত। সেই অধর মানুষের পরশ-লাভ করলে লালনের ভব-বন্ধন-জ্বালা যেতো ঘুচে। কিন্তু 'সে আর লালন একখানে রয়, / তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে'। এখানে 'যোজন' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। দূরত্ব-নির্দেশক 'যোজন' শব্দটি এখানে যেভাবে

সুপ্রযুক্ত, দূরত্ব-জ্ঞাপক আর অন্য কোনো শব্দই এর যোগ্য বিকল্প হতে পারেনা। 'যোজনে'র পরিবর্তে অন্য কোনো শব্দ এখানে ব্যবহৃত হলে শুধু এই পংক্তিটিই নয় সম্পূর্ণ গানটিরই শিল্প-আঁটুনি শিথিল হয়ে যেতো।

'কে কথা কয়রে দেখা দেয়না'—লালনের এই গানটিতেও নিকটে অবস্থিত অথচ স্পর্শ ও দর্শনের অতীত এক সত্তার অন্বেষণে সাধকের ব্যাকুলতা প্রকাশিত। এই গানেরই একটি পংক্তি—'ক্ষিতি জল কি বায়ু হুতাশন'। এই পংক্তির ভিন্নরকম বিন্যাস কিংবা বিকল্প শব্দের প্রয়োগ অচিন্তনীয়।

শব্দের শুদ্ধরূপের বিচ্যুতি বা তার আঞ্চলিক রূপের প্রয়োগও যে লালনের গানে কতো সুন্দর মানিয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন, 'গাহেক' (গ্রাহক) —'খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহেক বিনে', কিংবা 'গেরাম' (গ্রাম)— 'গেরাম বেড়ে অগাধ পানি'। আবার, 'পাগলা-খিজি', 'কোনা-কানৃছি', 'তোড়ানি', 'সই হবা', 'কপ্‌নি ধজা', ইত্যাদি। তাঁর এই শব্দ-প্রয়োগের নৈপুণ্য সম্পর্কে মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯—১৯৬৯) বলেছেন :

> সহজ সরল বাংলা শব্দের মধ্যে কত যে রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে তাঁর গানের শব্দপ্রয়োগ ও অনায়াস বয়নকুশলতাই সে সাক্ষ্য বহন করছে। এমন ঝরঝরে, নির্ভার তদ্ভব শব্দ প্রয়োগের কারুকলা আর কোনো লোককবির গানে দেখা যায়না। লালন তাঁর সমসাময়িক এবং পূর্ব ও পরবর্তীকালের অন্যান্য লোককবি থেকে এখানেই বিশিষ্টতার দাবী করেন। সেইজন্য লালন শ্রেষ্ঠ বাউল ও লোককবি।[৩]

আবার তাঁর তৎসম শব্দের যথোপযুক্ত ব্যবহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করে এবং এই নিরক্ষর গ্রাম্য সাধককবির প্রতি পাঠক শ্রোতার শ্রদ্ধা ও মনোযোগ বাড়িয়ে দেয়। যেমন—বাঞ্ছা, স্বয়ম্ভু, ভাস্কর, নিরঞ্জন, স্কন্ধ, লক্ষ, অন্তিমকাল, অমর্ত্য, নিষ্ঠা, মৈথুন, ত্বরা, অনন্ত, ভুজঙ্গনা, মীন, ব্রহ্মাণ্ড, নপুংসক, জ্যোতির্ময়, বিভূতি, ধূপ, দর্পণ, ত্রিভুবন, সৌদামিনী, চিদানন্দ, শরণ, কিঞ্চিৎ, দিব্য, নির্বিকার, অন্বেষণ। এই উদাহরণ অনায়াসে আরো দীর্ঘ হতে পারে। লালন তাঁর গানে সমার্থক একাধিক শব্দ (আরশি, আয়না, দর্পণ) ব্যবহার করে ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন; যেমন—ক. 'বাড়ির কাছে আরশিনগর', খ. 'আয়নামহল তায়', গ. 'জানো না মন পারাহীন দর্পণ'।

আরবি-ফারসি শব্দের সুষম ব্যবহার লালনের গানকে আরো আকর্ষণীয় ও শ্রীমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করেছে। কয়েকটি প্রয়োগ-উদাহরণ লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে বাঙলা শব্দের সঙ্গে তিনি এইসব শব্দের কী গভীর

আত্মীয়তা-যোগ ঘটিয়েছেন এ-সব ক্ষেত্রে। আরবি-ফার্সি শব্দের ব্যবহার যে কতো প্রাসঙ্গিক, অক্লান্ত ও স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারে তার উদাহরণ লালনের এই গানটি :

বাকির কাগজ মন তোর গেল হুজুরে।
কোন্‌দিন তোর আসবে শমন সাধের অন্তঃপুরে।।
যেদিন ভিটায় হয় বসতি
দিয়েছিলে মন খোস্‌কবলতি
তুমি হরদমে নাম রাখবে স্থিতি
এখন ভুলে গিয়েছ তারে।।
আইন-মাফিক নিরিখ-দেনা
ও মন, তাতে কেন তোর ইতরপনা
যাবেরে মন যাবে জানা
জানা যাবে আখেরে।।
সুখ পা'লে হও সুখ-ভোলা
দুখ পা'লে হও দুখ-উতলা
লালন কয় সাধনের বেলা
মন তোর কিসে জুৎ ধরে।।

অন্যত্র পাওয়া যায় :

ক. গঠেছে সাঁই মানুষ-মক্কা কুদরতি নূর দিয়ে
খ. এলাহি আলামিন গো আল্লা বাদশা আলামপনা তুমি
গ. সেই মোয়াহেদ দায়মাল হবে
ঘ. কুল্লে শাইইন মুহিত খোদা
ঙ, ফেরেবি ফকিরি দাড়া, দরগা নিশান ঝাণ্ডা গাড়া।

লালনের গানে আরবি-ফারসি শব্দ-ব্যবহার প্রসঙ্গে আবু জাফর (জ. ১৯৪২) যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য :

…আরবি-ফারসি শব্দ ও বাক্যবন্ধের সফল প্রয়োগের যে কৃতিত্ব আমরা নজরুল ইসলামে আরোপ করে থাকি, সেই কৃতিত্ব আরো আগে আরো অনিবার্যভাবে লালনের প্রাপ্য।[৪]

লালন তাঁর গানে ইংরেজি শব্দও কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন; যেমন— গড কোর্ট, জুরী, বেরাদর (ব্রাদার), ম্যাজিষ্টারী (ম্যাজিস্ট্রেট) পক্কো (পক্ক) ইত্যাদি। এর থেকে সহজেই অনুমান করা চলে যে নিরক্ষর লালনের শব্দ-

ভাণ্ডার কতো সমৃদ্ধ ছিলো। আশরাফ সিদ্দিকী (জ. ১৯২৭) লালনগীতির শব্দ মটিফ্‌গুলি নিয়ে যে-আলোচনা করেছেন তাতে লালনের শব্দ-ব্যবহারের বিশেষ প্রবণতা তাৎপর্যের আভাস দিয়েছেন।[৫]

এই স্ব-শিক্ষিত বাউলকবির শব্দ ভাণ্ডার এবং তাঁর শব্দ-নির্বাচন ও প্রয়োগের নৈপুণ্য ও সচেতনতা লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয়। এ-বিষয়ে আবু জাফরের সতর্ক বীক্ষণে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে :

> ...শব্দ ব্যবহারে লালন যে অস্বাভাবিকরূপে দক্ষ ছিলেন, তাঁর ব্যবহৃত সব শব্দই যে বিপুল পরিমাণে ভাবগর্ভ ও বিদ্যুৎবাহী ; এ বিষয়ে সকলে একমত হবেন। সবাই মেনে নেবেন, লালনের অসংখ্য গানের মধ্যে এমন একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য যা যথাযথ এবং সুপ্রযুক্ত নয়, এমন একটি চরণও অনুপস্থিত যার বিন্যাস কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে। আর শুধু শব্দের বিন্যাস নয়, আধুনিক নিয়মে অসংখ্য শব্দ এই লালনের স্পর্শেই নতুনভাবে অর্থ পেলো, সঙ্কোচন-প্রসারণে পেলো নতুন আয়তন, কখনো কখনো নতুনভাবে নির্মিতও হলো শব্দ।[৬]

উপযুক্ত বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক যথার্থই সিদ্ধান্ত করেছেন যে :

> কবিতা প্রসঙ্গে একটি সুপরিচিত সংজ্ঞা, 'Best words in the best order', উৎকৃষ্টতম শব্দের সুন্দরতম বিন্যাসই কবিতা—লালনগীতির প্রতিটি চরণ এই পরিচয়ে নিবিড়।[৭]

বাউলগানের রসগ্রাহী রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের ছন্দ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি লালনের 'আছে যার মনের মানুষ আপন মনে / সে কি জপে মালা' এবং 'এমন মানব জনম আর কি হবে' – এই গান দুটি উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেন :

> এই ছন্দের ভঙ্গি একঘেয়ে নয়। ছোটো-বড়ো নানা-ভাগে বাঁকে বাঁকে চলেছে। সাধুপ্রসাধনে মেজে-ঘষে এর শোভা বাড়ানো চলে, আশাকরি এমন কথা বলবার সাহস হবেনা কারো।[৮]

রবীন্দ্রনাথ দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিমত পোষণ করেছেন যে, "এই খাঁটি বাংলায় সকল রকম ছন্দেই সকল কাব্যই লেখা সম্ভব"।[৯] এই প্রবন্ধেরই অন্যত্র 'বাঙালির দিবারাত্রির ভাষা'য় রচিত লালনের একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছে, "প্রাকৃত-বাংলাকে গুরুচণ্ডালি স্পর্শই করেনা। সাধুছাঁদের ভাষাতেই শব্দের মিশোল সয়না।"[১০]

ছন্দের শাসন লালনের গানকে একটি নিটোল শিল্পে পরিণত করেছে।

তাঁর ছন্দবোধ অনুশীলনের ফসল নয়, বরঞ্চ তা তাঁর স্বভাবেরই অন্তর্গত শিল্প-ধারণা থেকে উৎসারিত। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত—বাঙলা ছন্দের এই ত্রিবিধ মাধ্যমেই তাঁর সার্থক পরিক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।[১১]

অলঙ্কার-প্রয়োগের ক্ষেত্রেও লালনের নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। উপমা-রূপক-চিত্রকল্প-উৎপ্রেক্ষা লালনগীতিকে শ্রীমণ্ডিত করে তুলেছে। উপমা ও চিত্রকল্পের যুগল ব্যবহার লালনের গানকে কেমন দীপ্তিময় করে তুলেছে এখানে তার উদাহরণ পেশ করা হলো :

মাকাল ফলের বরণ দেখে
যেমন ডালে বসে নাচে কাকে
তেমনি আমার মন, চটকে বিমন
সার পদার্থ নাহি চেনে॥

কিংবা,

মেঘের বিদ্যুৎ মেঘে যেমন
লুকালে না পায় অন্বেষণ
কালারে হারায়ে তেমন
ও রূপ হেরিয়ে স্বপনে॥

আবার,

এক নিরিখ দেখ ধনি, সূর্যগত কমলিনী
দিনে বিকশিত কমলিনী, নিশিথে মুদিত রহে।
তেমনি জেন ভক্ত যেজন, এক রূপে বাঁধে হিয়ে॥

বাউলগান রূপকাশ্রিত, তাই লালনের গানে অনিবার্যভাবে রূপকের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন নীচের এই গানটি :

লাগল ধুম প্রেমের থানাতে
মন-চোরা পড়েছে ধরা রসিকের হাতে।
ও সে ধরেছে চোরকে হাওয়ায় ফাঁদ পেতে॥
ভক্তি-জমাদারের হাতে
দু'দিন চোর জিম্মা থাকে
তিনদিনের দিন দেয় সে চালান
আষ্টেপিষ্টে বেঁধে॥

অন্যত্র পাওয়া যায় ঃ 'কুলের বউ', 'মনের লেংটি', 'মানব-তরণী'. 'মন-কাশ', 'পাপ-সাগর', 'মানুষ-মক্কা', 'আরশিনগর', 'প্রেম-ফাঁদ', 'ভব-কারাগার', 'দয়ালচাঁদ', 'আবহায়াত-নদী' ইত্যাদি।

প্রচলিত ইঙ্গিতধর্মী প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণের ব্যবহার তাঁর কাব্য-গীতিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। তাঁর বক্তব্যের যৌক্তিক ভিত্তি-অর্জনের জন্য এই প্রয়োগ বিশেষ সহায়ক হয়েছে। লালনগীতিতে ব্যবহৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবাদ-প্রবচন-সুভাষণ ঃ

ক. কাক মারিতে কামান-পাতা
খ. সুঁই-ছিদ্রে চালায় হাতী
গ. পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর
ঘ. গুড় বললে কি মুখ মিঠে হয়
ঙ. দীপ না জ্বাললে কি আঁধার যায়
চ. মারে মৎস্য না ছোঁয় পানি
ছ. ঠাকুর গড়তে বাঁদর হলোরে
জ. যজ্ঞের ঘৃত কুত্তায় খেলোরে
ঝ. হাওয়ার চিড়ে, কথার দধি, ফলার হচ্ছে নিরবধি
ঞ হাতের কাছে হয়না খবর, কি দেখতে যাও দিল্লী-লাহোর।

অনুপ্রাসের ব্যবহার লালনের গানকে বিশেষ ধ্বনি-ব্যঞ্জনায় মণ্ডিত করেছে। যেমন ঃ

ক. গুরু, তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী
গুরু, তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী
গুরু, তুমি যন্ত্রের যন্ত্রী
না বাজাও বাজবে কেনে॥
খ. যার যেখানে ব্যথা নেহাত, সেইখানে হাত ডলামলা।
গ. ধররে অধরচাঁদেরে অধরে অধর দিয়ে।
ঘ. কারুণ্য তারুণ্য এসে লাবণ্যে যখন মিশে।
ঙ. আঁখির কোণে পাখির বাসা।

লালনের অতুলনীয় কবিত্ব-শক্তির পরিচয় তাঁর অনেক গানেই বিধৃত। বিশেষ করে তাঁর 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়', 'বাড়ির কাছে আরশিনগর', 'কোথা আছেরে দীন দরদী সাঁই', 'এ দেশেতে এই সুখ

হলো', 'কে কথা কয়রে দেখা দেয়না', 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে', 'পাখি কখন উড়ে যায়', 'আমার আপন খবর আপনার হয়না', 'আমার এ ঘর-খানায় কে বিরাজ করে', 'এমন মানব-জনম আর কি হবে', 'মিলন হবে কতদিনে আমার মনের মানুষেরি সনে', 'আর কি বসবো এমন সাধুর বাজারে', 'গুরু দোহাই তোমার মনকে আমার লওগো সুপথে', 'কবে সাধুর চরণধুলি লাগবে মোর গায়', 'এলাহি আলামিন আল্লা বাদশা আলমপনা তুমি', 'তোমার মত দয়াল বন্ধু আর পাব না', 'ঘরে কি হয়না ফকিরি', 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে', 'পার কর হে দয়ালচাঁদ আমারে' প্রভৃতি শিল্প-সৌকর্যমণ্ডিত গান আজ বাঙলাসাহিত্যের পরম মূল্যবান সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত ও গৃহীত।

বহুল উচ্চারিত তত্ত্বকথা ও সীমাবদ্ধ বিষয়ের অনুবর্তন সত্ত্বেও লালন তাঁর সঙ্গীতে সেই গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করে নতুন ভাব-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছেন। তত্ত্বকথার দুরূহ ও ক্লান্তিকর বদ্ধ আবহে এনেছেন শিল্প-সৌন্দর্যের সুবাতাস। তাই বাঙলার মরমী কবিদের মধ্যেই যে কেবল তিনি শ্রেষ্ঠ তাই নয়, বাঙলার সঙ্গীতসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি এক কালোত্তীর্ণ স্মরণীয় শিল্পী-ব্যক্তিত্ব।

লালনের শৈল্পিক কৃতিত্ব, উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তি ও বাঙলা-কাব্যে তাঁর স্থান সম্পর্কে সুধী-সমালোচকবৃন্দ যে বক্তব্য-মন্তব্য পেশ করেছেন তা লালনের শিল্পী-সত্তার মূল্যায়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। আমরা এখানে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক অভিমত উদ্ধার করে দিলাম।

কাজী মোতাহার হোসেন মন্তব্য করেছেন :

> সঙ্গীতপ্রিয় বাংলা-দেশীয় সমাজে লোকগীতির ক্ষেত্রে সাধক লালন শাহ এত অজস্র ও অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন যে, এইসব পরমার্থ-সূচক মরমী গানের সহজ প্রকাশমাধুর্য ও লালিত্যের গুণেই তিনি বেশ কয়েক শতাব্দী যাবত বাঙালীর হৃদয়ে ভাব-লহরীর উদ্রেক করতে পারবেন।[১২]

অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন :

> তিনি স্বভাব-কবি। মুখে মুখে গান বানিয়ে তখনি তখনি শোনাতেন। শোধনের অবকাশ পেতেন না। ছন্দ মিল নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তা সত্ত্বেও যা হতো তা সাধনার দিক থেকে উচ্চকোটির। কবিতা হিসাবেও উচ্চাঙ্গের। সংগীত হিসাবে তো অপূর্ব।[১৩]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালনের গান বিশ্লেষণ করে অভিমত পেশ করেছেন যে :

> সব দিক দিয়া বিবেচনা করিলে বাউলগান রচয়িতা হিসাবে মুসলমান বাউল লালন ফকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। মূল-তত্ত্বজ্ঞতা, সাধনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-লব্ধ জ্ঞান, প্রত্যয় ও দিব্যদৃষ্টি, বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সুফীতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, বক্তব্য ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাময় করিয়া বলিবার কৌশল, সহজ কবিত্ব শক্তি প্রভৃতিতে তাঁহার গানগুলি বাংলা-সাহিত্যের একটি সম্পদ। গান-গুলির মধ্যে রচয়িতার সংগীত-জ্ঞানেরও যথেষ্ট নিদর্শন আছে। সুরের সহিত গানগুলির ছন্দ ও মিলের সুন্দর সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। গানগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র,—এক-একটি ভাব যেন ফুলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুর-সংযোগে অভিব্যক্ত তাঁহার গানের অকৃত্রিম আবেগের মধ্যে একটা অনির্বচনীয়ত্বের বিদ্যুৎ খেলিয়া গিয়া আমাদের চিত্তকে অপূর্ব ভাব-লোকে যেন উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।[১৪]

আহমদ শরীফ লালনের গানের দার্শনিক ও সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারণ করে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য :

> ভেদবুদ্ধিহীন মানবতার উদার পরিসরে সাম্য ও প্রেমের সুউচ্চ মিনারে বসেই লালন সাধনা করেছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাধক ও দার্শনিকদের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি সাম্য ও প্রেমের বাণী শুনিয়েছেন। তিনি রুমী, জামী ও হাফেজের সগোত্র এবং কবীর, দাদূ ও রজবের উত্তর-সাধক। লালন কবি, দার্শনিক, ধর্মবেত্তা ও প্রেমিক। তাঁর গান লোকসাহিত্য মাত্র নয়। বাঙালীর প্রাণের কথা, মনীষার ফসল ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর।[১৫]

মূলত লালনের গানের অসামান্য শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য, উচ্চাঙ্গের দর্শন ও প্রবল মানবিকতাবোধের জন্যই বাঙলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-মনীষা রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বিদেশে ধীমান সাহিত্য-সমালোচক Edward C. Dimock থেকে Carol Salomon লালনের গানের প্রতি আকৃষ্ট হন। বাউলগানের রসজ্ঞ মরমী বোদ্ধা রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক কবিতায় বলেছিলেন :

> সাহিত্যের ঐকতানসংগীতসভায়
> একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
>
> [ঐকতান : জন্মদিনে]

—তাঁর এই আন্তরিক প্রত্যাশা বাঙলাসাহিত্যের দরবারে লালন ফকিরের স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সার্থকভাবে পূরণ হয়েছে।

তথ্য-নির্দেশ

১। অন্নদাশঙ্কর রায়, 'লালন ও তাঁর গান'। কলিকাতা, বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৮৫। পৃঃ ১৯

২। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, 'হারামণি' (১ম খণ্ড)। কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৩৭। 'আশীর্বাদ', পৃঃ ৯

৩। মুহম্মদ আবদুল হাই, 'লালন শাহ ফকির'। ঢাকা, মে ১৯৮০। পৃঃ ১০-১১

৪। আবু জাফর, 'বাংলা গানের সুখদুঃখ'। "লালনগীতি"। ঢাকা। আষাঢ় ১৩৯১। পৃঃ ৪৮

৫। 'দৈনিক সংবাদ', ১৮ ও ২৫ পৌষ ১৩৮৩। আশরাফ সিদ্দিকী, "লালনগীতিতে শব্দ-মটিকিম"।

৬। আবু জাফর, পূর্বোক্ত। পৃঃ ৪৮

৭। ঐ, পৃঃ ৪৫

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছন্দ'। পরিবর্ধিত সং, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, নভেম্বর ১৯৬২। পৃঃ ১৩০

৯। ঐ, পৃঃ ১৩০

১০। ঐ, পৃঃ ১৩২

১১। আবদুল কাদির তাঁর 'ছন্দ-সমীক্ষণ'। (ঢাকা, ১৯৮২) ও এস, এম লুৎফর রহমান, তাঁর 'লালন-জিজ্ঞাসা' (ঢাকা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪) গ্রন্থে লালনগীতির ছন্দ-অলঙ্কার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

১২। আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত, 'লালন স্মারকগ্রন্থ'। ঢাকা, চৈত্র ১৩৮০। কাজী মোতাহার হোসেন, "সাধক লালন শাহ"। পৃঃ ৬১

১৩। অন্নদাশঙ্কর রায়। পূর্বোক্ত। পৃঃ ১৭-১৮

১৪। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'বাংলার বাউল ও বাউল গান'। দ্বি-সং: কলিকাতা, নববর্ষ ১৩৭৮। পৃঃ ১০৫

১৫। আহমদ শরীফ, 'বিচিত বিন্তা'। ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮। পৃঃ ৪০৫

সৌজন্য : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লালন মেলা সমিতি

চীফের নিমন্ত্রণ

ভীষ্ম সাহনী

[ভীষ্ম সাহনী : জন্ম ৮ই আগস্ট ১৯১৫ রাওয়ালপিণ্ডি। শিক্ষা এম. এ, পি এইচ ডি। ৮টি গল্প সংকলন, ৪টি উপন্যাস ও ৩টি পূর্ণদৈর্ঘ্যের নাটক ছাড়াও স্বর্গত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভিনেতা বলরাজ সাহনীর জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় ও বিদেশী মিলে প্রায় ১৫টি ভাষায় তাঁর লেখা অনূদিত হয়েছে। দু'টি উপন্যাস, তমস ও বসন্তী চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। 'মোহন জোশী হাজির হো'-ছবিতে নাম ভূমিকায় ও 'তমস' ছবিতে একটি বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বামপন্থী রাজনীতির শরিক এ লেখক দীর্ঘদিন অ্যাফ্রো-এশিয়ান লেখক-সংঘের মুখপত্র 'লোটাস ইণ্ডিয়া' সম্পাদনা করেছেন। ১৯৭৫ সালে 'তমস' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া তাঁর প্রাপ্ত পুরস্কারের মধ্যে শিরোমণি লেখক, সাহিত্য কলা পরিষদ, লোটাস, সোভিয়েত ল্যাণ্ড নেহরু পুরস্কার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ।]

আজ মিস্টার শামনাথের বাড়িতে চীফের নিমন্ত্রণ ।

শামনাথ ও তার বউয়ের ঘাম মোছারও সময় ছিল না। বউ ড্রেসিং গাউন পরে, অগোছালো চুল বেঁধে, শুকনো মুখে পাউডার লাগিয়ে—আর মিস্টার শামনাথ সিগারেটের পর সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে, জিনিসপত্রের তালিকা হাতে নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ছোটাছুটি করছিলেন।

শেষ পর্যন্ত পাঁচটার দিকে সব কাজ মোটামুটি হয়ে গেল। চেয়ার, টেবিল, সতরঞ্চি, ন্যাপকিন, ফুল সব বারান্দায় পৌঁছে গেল। ড্রিঙ্কের ব্যবস্থা করা হল ড্রইংরুমে। আর যখন ঘরের ফালতু জিনিসপত্র আলমারির পেছনে, খাটের নীচে লুকিয়ে ফেলা হচ্ছে তখুনি শামনাথের মাথায় একটি সমস্যা এসে দাঁড়াল, মা'র কি হবে ?

ব্যাপারটা আগে তাঁর বা তাঁর সুদক্ষ গৃহিনীর মাথায় আসেনি। মিস্টার শামনাথ, শ্রীমতীর দিকে ঘুরে ইংরেজীতে বললেন, 'মা'র কি হবে ?'

শ্রীমতী কাজ করতে করতে থেমে গেল। কিছু ভেবে নিয়ে বলল, 'ওকে পেছনে ওর বান্ধবী বাড়িতে পাঠিয়ে দাও না। রাত-ভর সেখানেই থাকুক। কাল ফিরে আসবে।'

শামনাথ সিগারেট মুখে নিয়ে আড় চোখে শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি চাই না,এখানে আবারবুড়িটার যাতায়াত শুরু হোক। আগে অনেক কষ্টে বন্ধ করেছি। মাকে বল,

তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যেই নিজের ঘরে চলে যাক্। অতিথিরা আটটার দিকে আসবে, তার আগেই নিজের কাজকর্ম সেরে নিক।'

উত্তম প্রস্তাব। দু'জনেরই পছন্দ হয়ে গেল। কিন্তু শ্রীমতী বলে উঠল, 'ও যদি ঘুমিয়ে পড়ে আর ঘুমের ঘোরে যদি নাক ডাকতে শুরু করে, তবে? পাশেই তো বারান্দা যেখানে লোক খাবে।'

'তাহলে ওকে বলে দেব যাতে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে নেয়। আমি বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দেব।...নাকি মাকে বলে দেব, যে ভেতরে যাতে না ঘুমিয়ে বসে থাকে, হ্যাঁ?'

'আর যদি ঘুমিয়েই পড়ে তাহলে? কে জানে ডিনার কতক্ষণ চলবে! এগারোটা পর্যন্ত ত ড্রিঙ্ক করবে।'

শামনাথ হাত ঝেড়ে রেগে বললেন, 'ভালয় ভালয় ও ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছিল। তুমি নিজে ভাল সাজার জন্য মাঝখানে এসে ব্যাগড়া দিলে।'

'বারে! তোমাদের মা-ব্যাটার মাঝখানে আমি কেন অপ্রিয় হব! তুমি জান আর মা জানে।'

মিস্টার শামনাথ চুপ করে গেলেন। এখন ঝগড়া-ঝাঁটি করার সময় না, সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। ওরা পিঠ ফিরিয়ে মা'র দিকে তাকাল। ঘরের দরজাটা বারান্দার দিকে খোলে। বারান্দার দিকে তাকিয়ে ঝট করে বললেন, 'বুদ্ধি পেয়েছি', আর পায়ে পায়ে মা'র ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। মা দেয়াল ঘেঁসে চৌকিতে বসে দোপাট্টায় মাথা ঢেকে মালা জপছিল। সকাল থেকে প্রস্তুতি দেখে দেখে তার বুক ধুক ধুক করছিল। ছেলের অফিসের বড় সাহেব বাড়িতে আসছে, সবকিছু ভালয়-ভালয় মিটে যাক।

'মা তুমি আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে নিও। অতিথিরা সাড়ে সাতটায় চলে আসবে।'

মা আস্তে করে মুখ থেকে দোপাট্টা সরিয়ে বলল, 'আজ আমি খাব না. খোকা। তুমি তো জানই, মাছ মাংস রান্না হলে আমি কিছুই খাই না।'

'যাই হোক, নিজের কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে নিও।'

'আচ্ছা খোকা।'

'আর মা, আমরা আগে বৈঠকখানায় বসব। ততক্ষণ তুমি এই বারান্দায় বসবে। তারপর আমরা যখন এখানে চলে আসব, তখন তুমি বাথরুমের দিক থেকে বৈঠকখানায় চলে যাবে।'

মা অবাক হয়ে ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'আচ্ছা খোকা।'

'আর মা আজ আবার তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড় না। তোমার নাক ডাকার শব্দ কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যায়।'

মা লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি করব খোকা। আমার হাতের ব্যাপার না। অসুখ থেকে ওঠার পর থেকে আর নাক দিয়ে ঠিকমত শ্বাস নিতে পারি না।'

মিস্টার শামনাথ ব্যবস্থাপনা তো ভালই করেছিলেন, তাও তিনি নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। চীফ যদি আচমকা এদিকে চলে আসেন তাহলে? আট-দশ জন অতিথি থাকবেন। দেশী অফিসার, তাদের বউ যে কেউ বাথরুমের দিকে যেতে পারে। ক্ষোভ ও ক্রোধে তার গা জ্বলতে লাগল। একটি চেয়ার উঠিয়ে বারান্দার ঘরের বাইরে রেখে বললেন, 'এসো মা, এখানে একটু বস তো।'

মা মালা সামলে, আঁচল ঠিক করে উঠে দাঁড়াল আর ধীরে ধীরে চেয়ারে এসে বসল।

'এভাবে না মা, পা তুলে বসে না। এটা খাট না।'

মা পা নামিয়ে নিল।

'আর দয়া করে খালি পায়ে ঘুরবে না। ওই খড়ম পরেও হাঁটবে না। একদিন তোমার ওই খড়ম উঠিয়ে বাইরে ফেলে দেব।'

মা চুপ করে থাকল।

'কোন্ পোশাকটি পরবে মা?'

'যা আছে তাই পরব খোকা। যেটি বলবে, পরে নিচ্ছি।'

মিস্টার শামনাথ সিগারেট মুখে নিয়ে ভুরু কুঁচকে মা'র দিকে তাকিয়ে পোশাকের কথা ভাবতে লাগলেন। শামনাথ সবকিছুই নিজের মনের মত চান। বাড়ির সব ব্যবস্থাপনা তার হাতেই ছিল। হ্যাঙ্গার ঘরের কোন জায়গায় লাগানো যেতে পারে, বিছানা কোথায় পাতা হবে, কি রঙের পর্দা লাগানো হবে, শ্রীমতী কোন শাড়ী পরবে, টেবিলে কোন সাইজের হবে··· শামনাথ ভাবছিলেন—চীফের সঙ্গে যদি মা'র সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তাহলে যাতে লজ্জিত না হতে হয়। মা কে মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখে বললেন, 'তুমি শাদা সালোয়ার কামিজ পরে নাও, মা! ওটা পরে এসো তো দেখি।'

মা পোশাক পরতে নিজের ঘরে চলে গেল। 'মা র এই ঝামেলা থাকবেই। উনি আবার ইংরেজীতে বউকে বললেন, 'কোন বলার মত কথা বললে ক্ষতি

নেই। যদি, কোন উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলে, চীফের যদি খারাপ লাগে, তাহলে সব মজাই নষ্ট হয়ে যাবে।'

মা শাদা সালোয়ার কামিজ পরে বেরিয়ে এল। ছোট্ট শরীর শাদা কাপড়ে ঢাকা, ধোঁয়াটে চোখ। মাথায় যে সামান্য চুল ছিল, আঁচলে ঢাকা পড়েছিল। তাকে আগের তুলনায় সামান্যই ভাল দেখাচ্ছিল।

'চলো ঠিক আছে। কোন চুড়ি-টুড়ি থাকলে, সেগুলোও পরে নাও। তাতে ক্ষতি নেই।'

চুড়ি কোত্থেকে আনব খোকা? তুমি তো জানই, সব গয়না তোমার পড়াশুনোর পেছনে খরচ হয়েছে।'

বাক্যটি শামনাথের মনে তীরের মতো বিঁধল। চটে গিয়ে বললেন, 'এ আবার কোন প্রসঙ্গ তুললে মা! সোজাসুজি বল যে গয়না নেই, ব্যস্! এর সাথে পড়াশুনোর কি সম্পর্ক! গয়না বিক্রি হয়েছে, বদলে কিছু হয়েছি। একেবারে জলে তো যায়নি। যতটা দিয়েছিলে, তার দ্বিগুণ ফেরত নিয়ে নিও।'

'আমার মুখ পুড়ে যাক, খোকা। তোমার কাছ থেকে গয়না নেব? মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। থাকলে, হাজারবার পরতাম।'

সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। এবার মিস্টার শামনাথকে স্নান করে তৈরী হতে হবে। শ্রীমতী অনেক আগেই নিজের ঘরে চলে গেছে। শামনাথ যেতে যেতে মাকে আরেকবার বুঝিয়ে গেলেন, মা রোজকার মত জড়সড় হয়ে বসে থেকো না। সাহেব যদি এদিকে চলে আসেন আর কোন প্রশ্ন করেন, তাহলে সবকথার ঠিকমত উত্তর দেবে।'

'আমি লেখাপড়া জানিনা খোকা। আমি কি কথা বলব! তুমি বলে দিও, মা নিরক্ষর, কিছু জানে টানে না। ও আর জিজ্ঞেস করবে না।'

সাতটা বাজার সঙ্গে-সঙ্গেই মার বুক কাঁপতে লাগল। চীফ যদি তার কাছে আসে আর কিছু জিজ্ঞেস করে বসে, তাহলে সে কি উত্তর দেবে! ইংরেজদের তো দূর থেকে দেখেই ঘাবড়ে যেত, এতো আমেরিকান। কে জানে কি জিজ্ঞেস করে বসে। আমি কি বলব। মা'র ইচ্ছে হল চুপচাপ পেছনের বান্ধবীর বাড়িতে চলে যায়। কিন্তু ছেলের হুকুম কিভাবে অমান্য করবে। চেয়ারে পা ছড়িয়ে চুপচাপ সেখানেই বসে থাকল।

সফল পার্টি সেটাই, যেখানে ড্রিঙ্কস সাফল্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়। শামনাথের পার্টি সাফল্যের চূড়া স্পর্শ করতে লাগল। কোথাও কোন সঙ্কোচ

ছিল না। সাহেবের হুইস্কি পছন্দ হয়েছিল। মেম সাহেবের পর্দা, সোফা কভারের ডিজাইন, ঘরের সাজানো গোছানো সবই। এর বেশী আর কি চাই! সাহেব তো ড্রিঙ্কের দ্বিতীয় পর্যায়েই জোক ও গল্প বলতে শুরু করলেন। অফিসে যতটা গাম্ভীর্য রক্ষা করে চলেন, এখানে ততটাই বন্ধু হয়ে উঠছিলেন। আর তার বউ, কাল গাউন, গলায় সাদা মুক্তোর হার, সেন্ট ও পাউডারের গন্ধে মাখামাখি হয়ে উপস্থিত প্রতিটি মহিলার কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানানো, আর শামনাথের বউয়ের সঙ্গে তো এভাবে কথা বলছিলেন, যেন তার কত কালের পুরনো বান্ধবী।

দেখতে দেখতে সাড়ে দশটা বেজে গেল। সময় যে কিভাবে কেটে গেল, বোঝাই গেল না।

শেষে সবাই নিজ নিজ গেলাস থেকে শেষ চুমুক পান করে ডিনার খেতে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এলেন।

আগে-আগে শামনাথ রাস্তা দেখাচ্ছেন, পেছনে চীফ ও অন্যান্য অতিথি। বারান্দায় পৌছেই শামনাথ হঠাৎ থমকে গেলেন। যে দৃশ্য দেখলেন তাতে তাঁর পা কাঁপতে লাগল, মুহূর্তেই যেন সমস্ত নেশা কেটে গেল। বারান্দার পাশের ঘরের বাইরে, মা নিজের চেয়ারে আগের মতই বসেছিল। তবে দুটো পা ই চেয়ারে তুলে রাখা, মাথা একবার ডান দিক থেকে বাঁয়ে অন্যবার বাঁ দিক থেকে ডাইনে ঝুঁকে যাচ্ছিল, মুখ দিয়ে ক্রমাগত নাক ডাকার শব্দ বেরিয়ে আসছিল। মাথা কিছুক্ষণের জন্য একদিকে কাত হয়ে থেমে গেলে নাক ডাকা আরো গভীর হয়ে যাচ্ছিল। আর যখন ঝটকা পেয়ে ঘুম ভাঙত, তখন মাথা আবার ডাইনে থেকে বাঁয়ে ঝুকতে লাগল। মাথা থেকে আঁচল সরে গিয়েছিল। মাথার হাল্কা চুল বিশ্রিভাবে ছড়িয়ে ছিল।

দেখেই শামনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। ইচ্ছে হল, মাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দেন আর সোজা ঘরের ভেতরে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু এরকম করা সম্ভব ছিল না, চীফ ও অন্যান্য অতিথিরা পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মাকে দেখেই দেশী অফিসারদের বউরা হেসে উঠল। তখুনি চীফ আস্তে করে বললেন, 'পুওর ডিয়ার।'

মা ধড়ফড় করে উঠে বসল। সামনে এতগুলো লোককে দেখে এমন ঘাবড়ে গেল যে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ঝট করে মাথায় কাপড় তুলে দাঁড়িয়েই মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে নিল। ওর পা টলতে লাগল, হাত কাঁপতে লাগল।

'মা, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়। তুমি কেন এতক্ষণ পর্যন্ত জেগে আছ?' বলে ভীত সন্ত্রস্ত চোখে শামনাথ চীফের মুখের দিকে তাকালেন।

চীফের মুখের হাসি। উনি সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'নমস্কার।'

মা ভয়ে ভয়ে হাত জোড় করল। কিন্তু একটি হাত দোপাট্টার ভেতরে মালা ধরেছিল, অন্যটা বাইরে, ঠিকমত নমস্কারও করতে পারল না। শামনাথ এতেও ক্ষুণ্ণ হলেন।

ইতিমধ্যে চীফ তাঁর ডান হাত মা-র দিকে এগিয়ে দিলেন। মা আরো ঘাবড়ে গেল।

'মা, হাত মেলাও।'

কিন্তু কিভাবে হাত মেলাবে? ডান হাতে তো মালা ধরে রেখেছে। ঘাবড়ে গিয়ে মা বাঁ হাত সাহেবের হাতে রেখে দিল। শামনাথ মনে মনেই জ্বলে উঠলেন। দেশী অফিসারদের বউরা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'এভাবে না, মা! তুমি তো জানই ডান হাত এগিয়ে দিতে হয়। ডান হাত মেলাও।'

কিন্তু চীফ মা'র ডান হাতটাই বারবার ঝাঁকিয়ে বলছিলেন, 'হাউডু ইউ ডু?'

'বল মা আমি ভাল আছি। খুব ভাল আছি।'

মা বিড়বিড় করে কিছু বলল।

'মা বলছেন আমি ভাল আছি।' বলো মা, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

মা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত ভাবে বলল, 'হাউ ডুডু ...।'

আবার সবাই হেসে উঠল।

আবহাওয়া হালকা হতে লাগল। কিন্তু সাহেব পরিস্থিতি সামলে নিলেন। লোকেরা হাসাহাসি করছিল। শামনাথের মনের ক্ষোভও কিছুটা কমে এসেছিল।

সাহেব এখনো মা'র হাত ধরে ছিলেন। এদিকে মা সঙ্কুচিত হচ্ছিল। সাহেবের মুখ দিয়ে মদের দুর্গন্ধ বেরচ্ছিল।

শামনাথ ইংরাজীতে বললেন, 'মা গাঁয়ের মেয়ে। সারাটা জীবন গাঁয়েই কাটিয়েছে। সেজন্যই আপনাকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে।'

সাহেব শুনে খুব খুশী হলেন। বললেন, 'তাই নাকি। আমার আবার গাঁয়ের লোকদের খুব ভাল লাগে। তাহলে তো তোমার মা গাঁয়ের নাচ

গান জানেন নিশ্চয়ই ?' চীফ খুশীতে মাথা নেড়ে মা' কে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন।

'মা সাহেব বলছেন কোন গান শোনাও। কোন পুরনো গান, তোমার তো অনেক মনে আছে ?'

মা ধীরে ধীরে বলল, 'কি গাইব খোকা। আমি কি কখনো গেয়েছি ?'

'ওঃ মা! অতিথির অনুরোধ কি কেউ ফেলতে পারে ? সাহেব এত আগ্রহ করে বলছেন, না গাইলে সাহেব খারাপ মনে করবেন।'

'আমি কি গাইব খোকা। আমার কি মনে আছে ?'

'কোন ভাল টপ্পা শুনিয়ে দাওনা। দোপত্তর অনারা দে···।'

দেশী অফিসার ও তাদের বউরা এ প্রস্তাবে হাততালি দিল। মা করুণ চোখে কখনো ছেলের দিকে তাকাচ্ছিল, কখনো পাশে দাঁড়ানো বউয়ের দিকে।

ছেলে হঠাৎ গম্ভীর আদেশের স্বরে বলল, 'মা।'

এরপর আর হ্যাঁ-না-র প্রশ্নই ওঠেনা। মা বসে পড়ল, আর ক্ষীণ, দুর্বল কাঁপা-কাঁপা গলার একটি পুরনো বিয়ের গান গাইতে লাগল—

হরিয়া নী মায়ে, হরিয়া নী ভেনে
হরিয়া তে ভাগী ভরিয়া হয়।

দেশী বউরা খিলখিল করে হেসে উঠল। তিন পংক্তি গেয়ে মা চুপ করে গেল।

বারান্দা হাততালিতে ফেটে পড়ল। সাহেব তো হাততালি বন্ধই করছিলেন না, শামনাথের রাগ খুশী ও গর্বে বদলে গেল। মা পার্টিতে নতুন রঙ এনে দিয়েছে।

হাততালি থামিয়ে সাহেব বললেন, 'পাঞ্জাবের গাঁয়ের হাতের কাজ কি ?'

শামনাথ খুশীতে অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন। বললেন, 'ও অনেক কিছু সাহেব। আমি আপনাকে ওসব জিনিসের একটি সেট উপহার দেব। আপনি দেখে খুশী হবেন।'

কিন্তু সাহেব মাথা নেড়ে ইংরেজীতে আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'না আমি দোকানের জিনিস চাইছিনা। পাঞ্জাবীদের বাড়িতে কি তৈরী হয়, মহিলারা নিজেরা কি বানায় ?'

শামনাথ একটু ভেবে বললেন, 'মেয়েরা পুতুল বানায়। মহিলারা ফুলকারী বানায়।'

ফুলকারী কি জিনিস ?'

শামনাথ ফুলকারীর অর্থ বোঝাতে ব্যর্থ হলেন, মা কে বললেন, 'কেন মা, বাড়িতে কোন পুরনো ফুলকারী নেই ?'

মা চুপচাপ ভেতরে গিয়ে একটি পুরনো ফুলকারী তুলে আনল।

সাহেব খুব আগ্রহ সহকারে ফুলকারী দেখতে লাগলেন। ফুলকারীটি বেশ পুরনো, নানা জায়গায় সুতো আর কাপড় ছিঁড়ে গিয়েছিল। সাহেবের রুচি দেখে শামনাথ বললেন, 'এটা ছিঁড়ে গেছে সাহেব। আমি আপনাকে নতুন বানিয়ে দেব। মা বানিয়ে দেবে। কি মা, সাহেবের ফুলকারী খুব ভাল লেগেছে, ওকে এরকম একটা ফুলকারী বানিয়ে দেবেনা ?'

মা চুপ করে থাকল। পরে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'এখন আমার কি সেই চোখ আছে খোকা! বুড়ো চোখে ঠিকমত··· ।'

কিন্তু মা'র কথার মাঝখানেই শামনাথ সাহেবকে বললেন, 'ও ঠিকই বানিয়ে দেবে। আপনার দেখে ভাল লাগবে।'

সাহেব ঘাড় নাড়লেন। ধন্যবাদ জানিয়ে দুলতে-দুলতে ডিনার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। অন্য অতিথিরাও পেছন-পেছন গেলেন।

যখন অতিথিরা বসে গেলেন আর মা'র দিক থেকে সবার চোখ সরে গেল, তখন সে ধীরে-ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অবশেষে সবার অলক্ষ্যে নিজের ঘরে চলে গেল।

কিন্তু ঘরে গিয়ে বসতেই চোখ বেয়ে ছলছল করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। যেন বহু বছরের বাঁধ ভেঙে নেমে আসছে। মা বহুবার নিজেকে বোঝাল, দোপাট্টা দিয়ে বারবার চোখ মুছল···কিন্তু অশ্রু, বৃষ্টির জলের মত, যেন থামতেই চায়না।

মাঝরাত। অতিথিরা ডিনার খেয়ে একে-একে চলে গিয়েছেন। মা চোখ বড়-বড় করে চুপচাপ দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ছিল। বাড়ির আবহাওয়ায় টানটান ভাব কমে এসেছিল। পাড়ার নিস্তব্ধতা শামনাথের বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়েছিল, শুধু রান্নাঘরে প্লেটের শব্দ কানে আসছিল। তখুনি সহসা মা'র ঘরের দরজায় আঘাত পড়ল।

'মা, দরজা খোল!'

মা ধড়ফড় করে উঠে বসল। আমি কি আবার কোন ভুল করে বসেছি ? মা কতক্ষণ থেকে নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল, কেন তার ঘুম পেয়েছিল! কেন

সে ঝিমোচ্ছিল! ছেলে কি এখনো ক্ষমা করেনি? মা কাঁপা কাঁপা হাতে দরজা খুলে দিল।

দরজা খুলতেই শামনাথ নাচতে-নাচতে এগিয়ে এসে মাকে আলিঙ্গনবদ্ধ করে নিলেন।

'ওমা! তুমি তো আজকে কামাল করে দিয়েছ!…সাহেব তোমার ওপরে এত খুশী হয়েছে যে কী বলব। ওমা! মা!…।'

মা'র ছোট্ট শরীর সঙ্কুচিত হয়ে ছেলের আলিঙ্গনে লুকিয়ে গেল। তার চোখে আবার জল এসে গেল। মুছতে মুছতে ধীরে ধীরে বলল, 'খোকা তুমি আমাকে হরিদ্বায়ে পাঠিয়ে দাও। আমি কতদিন থেকে বলছি।'

শামনাথের নাচানাচি সহসা বন্ধ হয়ে গেল, তার মুখ আবার থমথমে হয়ে গেল। মা'র শরীর থেকে হাত সরে এল।

'কি বলছ মা? তুমি আবার এ কোন প্রসঙ্গ তুললে?' শামনাথের ক্রোধ বাড়ছিল, বলতে লাগলেন, তুমি কি চাও লোকে আমার বদনাম করুক!… সবাই বলবে ছেলে মাকে নিজের কাছে রাখতে পারে না।'

না, খোকা। এখন তুমি বউয়ের সাথে যেমন মন চায় সেভাবে থাকো। আমি আমার খেয়ে-পরে নিয়েছি। আর এখানে থেকে কি করব! যে ক'দিন বেঁচে আছি, ভগবানের নাম নেব। তুমি আমাকে হরিদ্বারে পাঠিয়ে দাও!'

'তুমি চলে গেলে ফুলকারী কে করবে? সাহেবকে তোমার সামনেই ফুলকারী দেবার কথা দিয়েছি।'

'আমার আর সেই চোখ নেই যে ফুলকারী করব। তুমি অন্য কোন জায়গা থেকে বানিয়ে নাও। তৈরী করা জিনিস এনে দাও।'

'মা তুমি আমাকে এভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে? আমার তৈরী হওয়া ভবিষ্যত নষ্ট করবে? জানোনা, সাহেব খুশী হবে, তাহলে আমি প্রমোশন পাব!'

মা চুপ করে গেল। তারপর ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার কি উন্নতি হবে? সাহেব কি তোমার উন্নতি করে দেবে? ও কি তোমাকে বলেছে?'

'বলেনি। কিন্তু দেখছ না, কত খুশী হয়েছে। বলছিল, যখন তোমার মা ফুলকারী করতে শুরু করবে, তখন আমি দেখতে আসব যে কিভাবে বানায়। সাহেব খুশী হলে আমি এর চেয়েও বড় চাকরি পেয়ে যেতে পারি, আমি বড় অফিসার হয়ে যেতে পারি।'

মা'র মুখের রঙ বদলে গেল। ধীরে ধীরে তার জরাগ্রস্ত মুখে হাসি ফুটে উঠল। চোখে হালকা চমক আসতে লাগল।

'তাহলে তোমার উন্নতি হবে খোকা?'

'প্রমোশন কি এমনি এমনি হবে? সাহেবকে খুশী রাখব তাহলেই কিছু করবে। নইলে ওকে তোয়াজ করার মত লোকের অভাব নেই।'

"তাহলে আমি বানিয়ে দেব খোকা। যেরকম পারব বানিয়ে দেব।" আর মা ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কামনা করতে লাগল। এদিকে মিস্টার শ্যামনাথ, 'এবার শুয়েপড় মা' বলে, টলতে-টলতে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

(হিন্দী থেকে অনুবাদ অনিন্দ্য সৌরভ)

বাঁদর

অশোককুমার সেনগুপ্ত

ধীরেন প্রতিরোধের সুযোগ পায় না। আচমকা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। পশুপতির বাঁদরটা কী ভাবে যেন শেকল খুলে ফেলে। তারপর বেরিয়েই বুঝি ধীরেনকে দেখতে পায়। কাপড় কাচা সাবান কিনতে দোকান যাচ্ছিল ধীরেন। বাঁদরটা এক লাফে তার কাঁধে। ঝেড়ে ফেলার জন্যে ঝটকান দিতেই আঁচড়াতে সুরু করে ধীরেনের মুখে, কাঁধে, বাহুতে। ভয়ে আতঙ্কে ধীরেন একদিকে ঝেড়ে ফেলার, চেষ্টা এবং ছুটে পালানর উদ্যোগ নেয়। আছাড় খায় তারই ফলে রাস্তার উপর। ততক্ষণে মুখ রক্তাক্ত করে ছেড়ে দিয়েছে তার।

সারা মুখে বাঁদরটার নখরের রক্তাক্ত জ্বালা। আছাড় খাওয়ায় হাঁটুতে ব্যথা নিয়ে সে আর্তনাদ তোলে। ভয় এবং কান্নার সংমিশ্রিত সে এক অমানুষিক স্বর। থরথর করে কাঁপুনি জাগে রোগা কালো শরীরে। উঠে দাঁড়াতে পারে না। বিহ্বলতার ঘন কুয়াশায় তার চোখের সামনে কোন দৃশ্য থাকে না।

সময়টা সকাল। চৈত্রমাস। ঝড় কী মেঘের গন্ধ নিয়ে আকাশ একদিনও কালবৈশাখীর নামে তাণ্ডব করেনি। দিনজুড়ে বিরামহীন রৌদ্রবর্ষণ। তাতা প্রকৃতি, হা জলে আকুতি প্রাণীদের। সকালেও রৌদ্রের যথেষ্ট অগ্নিতীক্ষ্ণতা। ঘটনাটা রাস্তার উপর। একেবারে মাঝ গাঁ। দু'পা হাঁটলেই হাটতলা। আজ হাটবার নয়। ফলে পথে মানুষ নেই। একটা কালো গরু কেবল আঁকড় ঝোপের ওপাশে। তবে পিছনে নরেন হেঁটে আসছিল। আর সাইকেলে বাদল। দু'জনেই ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছে। বাদল ঝট্ করে সাইকেল থেকে ধীরেনের পাশে দাঁড়ায়। হাত ধরে বসিয়ে দেয়।

বাদলের গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, কালো রঙ। প্যান্টের উপর নীল নাইলনের গেঞ্জি। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। প্রাথমিকে শিক্ষকতার চেষ্টা চালাচ্ছে। গাঁয়ের এখন সব ব্যাপারেই সে থাকে উপকারে এবং ঝামেলাতে। দাদা যাদব বলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান। দাদাকে গ্রাহ্য করে না বাদল। দাদার অন্নও খাচ্ছে না। জমি রেখে গিয়েছে বাবা। সারাদিন তার সাইকেল নিয়ে ঘোরা, এখানে ওখানে বসা। কী করবে। কিছু ঘটলে তো ছুটতেই হয়। তা ধীরেনকে বাঁদরটা আক্রমণ করল তার চোখের

সামনে। পাশ কাটিয়ে চলে যায় কী করে। এখন ধীরেনের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু করা তার জরুরী হয়ে ওঠে।

পশুপতির দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে সে হাঁক পাড়ে, 'এই কে রয়েছিস্। কানু —এই কানু।' কানুর বদলে বেরিয়ে আসে ওর দিদি কুন্তী। বছর সতের আঠার বয়স। এবার মাধ্যমিক দিল। সুন্দরী নয়। কালো রঙ। মোটা। মুখও শ্রীহীন। যৌবনের প্রচণ্ডতা আছে দেহরেখায়। আঁট ফ্রকে তার উচ্চারণ এত স্পষ্ট যে চোখ সরাতে হয়।

'দেখ তোদের বাঁদরটা কী করেছে। ডেটল তুলো আছে তো নিয়ে আয়।'

কুন্তী সভয়ে দেখে। তারপর বলে, 'ওসব ত নাই।' ঘরের দিকে চোখ ফেরায়। বোধ করি বাঁদরটার খোঁজে। দেখতে পায় না। বলে, 'গেল কোথা বাঁদরটা।'

বাদল উত্তর দেয় না।

কুমোরপাড়ার নরেন কোমর ভাঙা কুঁজো মানুষ। থমকে আহা আহা—করছিল। বলে, 'ও বাদল, কম্পাউণ্ডার বাবুর কাছে নিয়ে চল। রক্ত বেরুচ্ছে।'

বাদল দায়িত্ব নিয়েছে। ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, 'ঠিক বলেছ। ও ধীরেন ওঠ। ওঠ।' ধীরেন ওঠে। দাঁড়াতে হয় কষ্ট করে।

'হাঁটতে পারবে তো। না হলে সাইকেলে পিছনে চড়ে পড় দেখি।'

সাইকেলে চড়ে না ধীরেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে।

গাঁয়ে সাবসিডারি প্রাইমারি হেলথ সেণ্টার। ডাক্তারবাবুর বাড়ি আট-মাইল দূরে। সারাদিন খাঁ খাঁ করে হাসপাতাল। সকালবেলায় খোলা থাকে। তাও নিত্য ডাক্তারবাবু আসেন না। তাঁর স্কুটারের ভটভটানি শব্দ শোনা যায় মাঝে মধ্যে; কম্পাউণ্ডার হরিধন, ড্রেসার মুক্তোই সব সামলায়। হরিধন বয়স্ক মানুষ। অভিজ্ঞতা আছে। ওরই ব্যবস্থাপনায় ইনজেকসান পড়ে এবং ট্যাবলেটের ব্যবস্থা হয়। হাত পায়ের হাড় ভাঙেনি। ব্যথা শুধু আছাড়ের।

সংবাদটা সারা গাঁয়ে চাউর হয়ে যায়। নানান মন্তব্য হয়। ধীরেনের পক্ষেই বেশি। বাঁদরটার স্বভাব যে বিশ্রি, কার কাপড় ধরে টেনেছিল, কাকে তেড়ে এসেছিল, ভাগ্যিস্ খুঁটিতে শেকল বাঁধা ছিল, তাই রক্ষে! সঙ্গে বাঁদর যে কেন পোষে, খেলা দেখিয়ে পয়সা রোজগারের না হয় যুক্তি আছে। কিন্তু স্রেফ

খেতে দিয়ে দাঁত খিঁচুনি দেখার কী সুখ, এমন বেয়াড়া শখের ঠিকঠাক ব্যবস্থা কেন করে না ইত্যাদির যোগে সর্বত্র আলোচিত হয়। তার সঙ্গে ঘটনাটার পরবর্তীকালের আশঙ্কাও প্রকাশ পায়। বাঁদরের আঁচড়ে কামড়ে কী হয় কে জানে! সাঙ্ঘাতিক কোন রোগ হতে পারে বৈকী। কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক হয়, বাঁদরেও নিশ্চয় কিছু। এখন হয়ত বোঝা যাবেনা। তাছাড়া মুখের কাঁধের কাটা ছেঁড়া থেকে বিষাক্ত ঘাও হতে পারে। পশুপতির গরীব মানুষটার চিকিৎসা করান উচিত একথাও সব বলে।

রাস্তায় বাদলের সঙ্গে আসার এবং ঘরে খবর করতে আসা মুখগুলোর কথাবার্তায় ধীরেন নীরব থাকে। কী ভাবে ঘটল তাকে বারকয়েক বলতে হয়েছে। কৌতুহল মানুষের বড় বিশ্রি। বিহ্বলতার মুহূর্ত কেটে গিয়েছে। ভয় এবং আতঙ্ক শিরা উপশিরাকে ঝাঁকিয়ে বেশ কিন্তু রেখেছে।

ধীরেনের বৌ ছেলে তিনটিকে নিয়ে বাপের বাড়ি গিয়েছে। রাজনগরে বাপের বাড়ি। মাইল ছয়েক দূরত্ব। কালই আসবে। রাতে ভাত বেড়েছিল। পান্তা আছে। রান্না করতে হবে না। তবে কাদু জেঠি চা নিয়ে এল। দাওয়ায় বাদল বসে আছে। তাকেও দিল। বলল, 'রাঁধতে হবে না আমি ভাত দুব।'

বাদল বলল, 'সেই ভাল। দেখি কী করতে পারি। বাঁদর খুন করবে—তার দায়িত্ব তো যে পুষেছে। কাদু জেঠি বলল, 'দেখ বাবা। গরীব মানুষ। আহা কী করেছে বেচারার।'

ধীরেন বলল, 'পান্তা আছে জেঠি। ভাত দিতে হবে না।' ঘর থেকে খেজুর পাতার তালাইটা নিয়ে দাওয়ায় বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

ধীরেন ছাপোষা মানুষ। ভীতু স্বভাবেরও বটে। ভিটেটুকু ছাড়া কোন ভূমি নেই। কোন ধরা বাঁধা বৃত্তিও না। যখন যেমন কাজ পায় করে। খাটালির কাজ। বিত্তের ঘর ঢুঁ ঢুঁ। শ্রমই একমাত্র উপার্জন সহায়ক। রোগা চেহারা হলেও অলস নয়। বৌ খুসীও বসে খায় না। ঝিগিরি করে তারক সেনের ঘরে। খালে বিলে মাছ ধরে বেচে। সংসার তারই দায়িত্বে। নিয়ন্ত্রণও তার নির্দেশিত।

বাঁদরটা আঁচড়ে কামড়ে দেওয়ায়—কামড়েছে কী না কে জানে—যাই হোক এখন ধীরেন ভাবে, বৌ কী বলবে। অহেতুক আক্রমণ সে কেমন করে বোঝাবে! তার তো দোষ ছিল না। সে রাস্তা হাঁটছিল। বাঁদরটাকে দেখেইনি। মুখ ভ্যাঙচানো, কী ওর মুখের খাবার কেড়ে নেওয়ার মত আগে ও কোন ঘটনা ঘটায়নি। তবু কেন যে তার উপর আক্রোশে ঝাঁপাল।

খুসী নির্ঘাত বলবে, 'শেষে কী না তোমাকে। বোঝ কেমন মানুষ। বাঁদরেও গ্রাহ্য করেনা ছিঃ।'

ধীরেন ভাবে, সে নীরব থাকবে। খুসীর উপর কথা বলবে না। কবেই বা বলে! তবে এটা ঠিক তাকে দোষ দিয়েই খুসী শান্ত হবে না। পশুপতি এবং তার বেয়াড়া বাঁদরটার শ্রাদ্ধ দেবে। কে জানে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে যাবে কী না। যতই হোক সে তো স্বামী। মেয়েমানুষ কথা শোনাক, জৈষ্ঠ্যের রৌদ্রের মত চামড়া পোড়াক, তাকে তো স্নানও করায় আদরে ভালবাসায় বর্ষাধারার মত। সব দিক হিসাব করে দেখলে ধীরেনকে বলতে হবে, খুসী তাকে ভালবাসে।

বৌ খুসীকে ছেড়ে ধীরেন ভাবে, জ্বালা তো কমেছে, ওষুধটাও পড়েছে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় কী হবে। তা শুকোবে তো? শুধু আঁচড়েছে না কামড়েছেও? সব জীবের মধ্যেই বিষ থাকে। মানুষেরও বিষ আছে। বাঁদরের বিষ কেমন? কতটা উগ্র? সাপের মত নিশ্চয় নয়। মনে পড়ে যায় ধীরেনের একটু আগে ঘরে এসে বলা ভোলানাথের কথাটা! ভোলানাথ আনাজপত্রের ব্যবসা করে। তাকে দেখে বলল, 'ভাল' করে চিকিৎসা করাও। বাঁদরের বিষ কম ভেবো না। দেখবে এমনিতে কিছু্য হলনা। তারপর ক'বছর কাটতেই শালার বিষ কাজ শুরু করে দিল। যেমন কুকুর কামড়ালে হয়। তখন তুমিও বাঁদরের পারা হয়ে যাবে। বাঁদরের স্বভাব হবে!' কী সাঙ্ঘাতিক। ধীরেন তখন শোনায় বোঝেনি, এখন বুঝছে। বুক ধড়াস ধড়াস করছে তার। সে বাঁদর হয়ে যাবে। বাঁদরের স্বভাব। অবিশ্বাস করার মত সাহস এবং বুদ্ধি তার কোথা। ঘেমে ওঠে সে। বিষ, রক্তে তার ক্রিয়াকাণ্ড, মানুষের রহস্যময় শরীরে তার ফল—ধীরেনের শুধু মনে হয়, সে হুপ হুপ না করে ওঠে!

বাদল বলে, 'তাহলে আমি চললাম। পরে খবর নেব। ভাবনার কিছু নেই। আমি টাকা আদায় করে দেব। এখানে কী হয় দেখি—বড় ডাক্তার দেখাব তারপর।'

ভরসা বটে। কিন্তু আটত্রিশ বছরের ধীরেন জানে, মানুষের কথাবার্তা দ্রুত বদলায়। কথার সঙ্গে কাজের বিস্তর ফারাক। বড় মানুষ সহজে করতে পারে। যে কোন ঘটনায় বন্ধুও শত্রু হয়ে যেতে পারে। সে ভাবে তার ক্ষমতাটুকুই সম্বল। খুসীর ক্ষমতা সংযোজনে যেটুকু বৃদ্ধি।

স্যাঁতস্যাঁতে গলায় ধীরেন বলে, 'তুমি আমার লেগে অনেক করলে।'

বাদল বলে, 'করব না। গাঁয়ের মানুষ। তুমি কী পর আছ। বাঁদরটার

স্বভাব খারাপ। কেন যে লোকে বাঁদর পোষে!' জিজ্ঞাসার সঙ্গে সে হাঁটা দেয়।

পশুপতি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারত বটে। রানীগঞ্জে দাদার বাড়ি গিয়ে নিয়ে এসেছে। মানুষের শখের সীমা পরিসীমা নেই। তবে পশুপতি ওদিকে যায় না। বিকেলে সে খবর করতে হাজির হয় ধীরেনের ঘরে। বাঁদরকে ধীরেন কিছু করেনি, অহেতুক আক্রান্ত হল, এটা বিশ্বাস করতে তার কষ্টটা ফোলা গালের কালো ভারী মুখে ফুটে ওঠে। সে বোঝায় বাঁদরটার স্বভাব বড়ই শান্ত। দু'মাস এসেছে, বাড়ির কাউকে কামড়ায়নি। বেঁধে রাখা হয় বটে; না রাখলেও চলত। বলে না সে বিরক্ত। কুন্তীর মায়ের আঁচল ছিঁড়ে দিয়েছে। দাঁত কিড়মিড় করে সব সময়ই। মুখ ভ্যাংচায়। বলে, বাঁদরটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। বলাই বাউরী প্যাড়া থেকে ধরে এনেছে। তার সঙ্গে বলে ঘটনা যখন ঘটেছে, ধীরেনকে সে টাকা দিচ্ছে। দশটা টাকা। কিনে যেন কিছু খায় ধীরেন। নোটটা কথার সঙ্গে মাটিতে নামিয়ে রাখে। তীক্ষ্ণ চোখে ধীরেনকে দেখে। প্রতিক্রিয়া পড়ে নিতে চায়।

ধীরেন নীরব। পশুপতির উপর চাউনিতে তার নেহাতই মানুষ দেখার ভঙ্গী। যেন দেখেনি এতদিন পশুপতিকে। লম্বা চওড়ায় দশাসই শরীর। ত্রস্ত ছাতি। ধুতির উপর শার্ট। হেঁড়ে মাথা। আধা সত্যি বলা যেতে পারে। ভাবে, জমি আছে লোকটার বিঘে সতের। সরেস জমি। চাষ করে কিষানে। মানুষটা দেখভাল করে। চাকরিবাকরি কোনদিন করেনি। তা জমির উৎপাদনই কী কম। এখনতো আবার পঞ্চায়েতের একজন। না ভোটে দাঁড়ায়নি। মেম্বার নয়। কিন্তু ভূমিকা বিস্তর। প্রধান অধীর ঘোষের ডান হাত। অধীর ঘোষ পশুপতিকে দিয়ে কাজ করায়।

দশ টাকা যথেষ্ট এবং গ্রাহ্য হয়ে গেল ভেবে পশুপতির যাওয়ার উদ্যোগে ধীরেন বলে: 'সবাই বলছে এর থেকে খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে।'

'খারাপ আবার কী হবে?'

বাঁদরের তো বিষ আছে। সেই বিষে—।'

'বিষ নষ্ট করার তো ওষুধ পড়ল। বাদল তোকে নিয়ে যায়নি? বাদল বলল, সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।' পশুপতি বলে, 'ছেলেটা ভাল। ভাগ্যিস ছিল। এই তো একটু আগে কথা হল আমার সঙ্গে। বললাম, তোকে দশটা টাকা দেব। বলল, দিয়ে এস।'

'আমার যদি কিছু হয়ে যায়।' ধীরেনের কান্না চলে আসে।'

পশুপতি বলে, 'আরে বাবা কিছু হবে না। দিব্যি ভাল আছি। চলিরে। টাকাটা তুলে রাখ।'

পশুপতির কথা, কিছু হবে না। দিব্যি ভাল আছে সে। কিন্তু খুসী শুনবে কেন? তার না স্বামী। মানুষটার জীবনের দাম তার কাছে মস্ত। মেয়েমানুষের স্বভাবে প্রথমে সে হাউমাউ করে চেঁচায় কী সর্বনাশ হয়েছে তা ঘোষণায়। যেন এইমাত্র কাণ্ডটা ঘটল। গালাগালি দেয় পশুপতি এবং বাঁদরটাকে। পড়শীরা এমন ঘটনায় যে চুপ করে আছে তার জন্যে চিৎকারে অনুযোগের বাণও হানে। তারা গরীব বলেই না অগ্রাহ্য। তারপর মস্তিষ্ক শীতল হতে ভাবে, মানুষটাকে নিয়ে নতুন গাঁয়ের বঙ্কু ওঝার কাছে যাবে। ঝাড়ফুঁক করিয়ে আনবে। কবচ যদি দেয় তো মঙ্গল। ব্যবস্থাটা তাকেই নিতে হবে। ধীরেনের উপর রাগও সে এ ভাবনার মধ্যে প্রকাশ করল।

'তোমাকেও বলিহারি। দেখে পথ চলতে পার না?'

'আমার কী দোষ। ঘর থেকে চেন খুলে যদি বেরিয়ে আসে।'

চিন্তার ভঙ্গীতে খুসী বলে, 'তুমি ত বলতেও পারছ না, খালি নুচুছে না কামড়িনছে!'

'বল কী। আঁচড়ে জ্বলছে। কাঁধে চেপে বসেছে। ছাড়াতে পারছি না। তখন কী আমার হুঁশ আছে যে বলব! পড়ে গেলাম ধড়াস করে—তা বাদে চোখে আঁধার।'

'এমন আঁধার যে তুমি উর কিছু করতে পারলে না? হুঁ।' তাচ্ছিল্যের শব্দ তুলে খুসী বলে, 'টুঁটি টিপে ধরতে হত। অতবড় মানুষ নই। ওইটুকুনও বাঁদর।' আক্রোশে চোখ জ্বলে খুসীর।

ধীরেন চুপ করে থাকে।

খুসী থামে না। বলে, 'দশটা টাকা দিলে, কোন আক্কেলে হাত পেতে তুমি নিলে?'

'ঘর বয়ে দিয়ে গেল। না করি কী করে?'

'তোমার চিকিচ্ছের সব টাকা উ হারামজাদার কাছে আদায় করব। আমি ছাড়ব নাই। থানা মজলিস করব। প্রধানের লোক বলে লেহাল লয়।' খুসী উঠোনে বারান্দায় শুধু কথা ছড়িয়ে যেন ভেতরের দাহকে কমানর চেষ্টা করে।

রাত্রিবেলায় খুসী পুরুষের শরীরে লগ্ন হয়ে কপালে মাথায় হাতের নরম

তালু রাখে। কী হবে সেই শঙ্কা তার যায় না। মানুষটার যন্ত্রণা পাওয়াও যেন সে অনুভব করে। ফিসফিস করে বলে, 'গা গরম লাগছে। জ্বর আসে নাই ত?'

'না। না।' ধীরেন গলা সহজ করে। মেয়েমানুষকে বুকে টানে। সব জ্বালা যেন তার জুড়িয়ে যায়। খুসীর বুকের ধকধকানি সে টের পায়।

'হ্যাগো কিছু হবে না ত তুমার?'

'আচ্ছা বোকা মেয়ে বট তুমি যা হোক। কী হবে? ওষুধ পড়েছে।'

'আমার ডর লাগছে।' স্বর যেন কান্নার ঝিরঝিরানি পার হয়ে আসে খুসীর। 'বেদনা এখনও তোমার রইছে।'

'না। না। কাল ছিল। তা কেটেছে কুটেছে একটু থাকবেই।'

'পড়ে গেইছিলে। ভাগ্যিস হাত পা ভাঙে নাই।'

'এখন কিছুদিন তোমাকে কাজ কর্ম করতে হবে না।' ধীরেনকে নিরুত্তর দেখে বলে, 'এই তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দুব?'

'না, শুয়ে থাক।' আঁকড়ে ধরে ধীরেন।

ধীরেনের মুখে আঁচড়ের সরু লম্বা লম্বা দাগ থেকে যায়। ঘা হয় না। নতুন গাঁয়ের বন্ধু ওঝা ঝাড়ফুঁক করে দিয়েছে। একটা তাবিজও দিয়েছে। বলেছে 'ডরের কিছু নাই। আমার কাছে এসেছ। এ যাত্রা বেঁচে গেলে।' শুনে স্বস্তি জোটে। কিন্তু ভাবনা বড় নচ্ছার। দুঃশ্চিন্তা এমন আঠালো যে ছাড়তে চায় না। ধীরেন ভাবে, রক্তের মধ্যে নিঃশব্দ বিষক্রিয়া চলেছে কী না কে জানে। সময় না এলে তা কখনও বোঝা যাবে না। পশুপতির ঘরে সে যায়নি। বাঁদরটাকেও আর দেখেনি। বলতে কী ওই রাস্তাটা সে এখন সভয়ে পার হয়।

দিন একভাবে রাত্রি হয়। অভাব, কাজ থাকা আর না থাকার মধ্যে আগুনে শরীর গ্রীষ্মদিন হামলে পড়ে। কাল বৈশাখী আসে। ঝড়ের সঙ্গে একদিন বৃষ্টির পর ধীরেন মাটি কাটার কাজ পায়। সামান্য বৃষ্টিতে পাথুরে মাটি পাথুরেই থেকেছে। উপরটা ভিজেছিল, অগ্নিপাতে আবার শুষ্ক। কিন্তু কাজ পেয়ে ছাড়বে কেন? যতীন দাসের ধেনো জমির মাটি সমান করতে হবে। জল বেয়ে কিছু কিছু ঢিবি গজিয়ে যায়। জমিরও যেন মানুষের মত 'আব' তৈরী হয়। তাকে ছেদন না করলে ওই 'আবে' ধানের গুছি পলকা-অপুষ্টতায় ভোগে। উঁচু ওই খণ্ডগুলোকে জমির সমতার কাজে সে লেগে পড়ে।

যতীন দাস মানুষটা সুবিধের নয়। ভাইকে বঞ্চিত করে ভাল জমি নিজের দিকে টেনেছে। চোরাই মাল কেনে। স্বার্থপর, কৃপণও বটে। তাতে কী ধীরেনের। সে কাজ করবে। টাকা নেবে।

ছাতা মাথায় রোদ বাঁচিয়ে যতীন মাঠে কাজ দেখতে এসে বলে, 'হ্যারে শুনলি পশুপতির বাঁদরট নাকি মরে গেল! তোকে কামড়েছিল যেটা!'

কোদাল বাজছিল শক্ত মাটিতে ঠনঠন করে। ঘামে ভেজা শরীর। কথাটা শোনামাত্র কোদাল চোট দিয়ে ওঠে না। ঘুরে যতীনকে দেখে ধীরেন। বলতেই হয়, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, আমাদের শিবু বলল। তা তোর তো কিছু হয় নাই?'

ধীরেন অবাক হয়। মুখের ঘাম মুছে বলে 'কী হবে?'

'না। তোকে তো কামড়েছিল। তারপর মরে গেল। কুকুর কামড়ানর পর সে কুকুর মারা গেলে জানতে হবে বিষ লেগেছে। বলে না, কুকুরটা নজরে রাখতে।'

তা ঠিক। তবে তাকে আঁচড়েছে। কামড়েছে কী না সন্দেহ আছে। ধীরেন ভয় পায়। বাঁদরটা মরেছে এটা তার কাছে সংবাদ ছিল মাত্র। সুখ দুঃখ কিছু না। আসলে রাগটা যে কোন কারণেই হোক তার আসেনি। জন্তু বলেই বোধ হয়। বলে, 'তাই নাকি।'

'তবে আর বলছি কী। এ সব বিষ দু' দশ বছর পর চাগাড় দিতে পারে। শুনিস্ নাই, দশ বছর আগে কুকুরে কামড়েছে, হঠাৎ ঘেউ ঘেউ করতে থাকল মানুষটা। এমনটি হয়।'

ধীরেনের বুক ধকধক করে। বলে, 'তাই হয়।'

'হয় বৈকী।' যতীন বলে, 'বিষ কখন চাগাড় দেয়-তার ঠিক কী। তবে তোর ভয় নেই। ওষুধ পড়েছে। নে-নে, দাঁড়িয়ে থাকিস্ না। মাটি কাট। মাটি কাট।'

ধীরেন আবার চোট লাগায়। বুক ধড়ফড় করছে। মাটি যেন আরও পাথুরে হয়ে উঠল। কিছুতেই কোদালের তীক্ষ্ণতাকে বসতে দেবে না। হাঁফ ধরে। মস্তিকে তার ঘুরপাক খায়, দিব্যি ভুলে ছিল। বেটা মরে এ আবার কী ভাবনায় তাকে ফেলল। সত্যি-সত্যি সে বাঁদর হয়ে যাবে না তো!

সন্ধে ঢলা বিকেলে মাটি কাটার দাম নিতে গিয়ে অবাক হয় ধীরেন। যতীন দাস বলে কী না, 'ওই তো কাজ। তোকে বলেছিলাম. একটু সড়গড়

করে দে, তা সারাদিন যদি মাটি চুটিয়ে মরিস। মুনিষের দাম দেব কেন? আমি কী মুনিষ লাগিয়ে ছিলাম। পাঁচ টাকা নে।'

আচমকা মুখে যেন থ্যাবড়া বসে যায় ধীরেনের, 'সারাদিন মাটি কেটে পাঁচ টাকা?'

'দিনের কথা আসছে কী করে? তোকে বলেছিলাম মুনিষ লাগ?'

কী বলেছিল মনে পড়ে না। ধীরেন বলে, 'সারাদিন ত খেটেছি।'

'সারাদিন—তুই যদি দু'দিন খাটিস। ওই তো কাজ। পাঁচদিন করলে পাঁচদিনের দাম দেব?'

'কী রকম কথা বলছ?' পলক পড়ে না ধীরেনের।

'বাংলাই বলছি। নে ধর। দাঁড়িয়ে থাকিস না। ঘর যা।'

ধীরেন শক্ত গলাতে বলে, 'পুরো মুনিষের দাম লাগবে। দিন ভর মাটি কেটেছি। দেখ'—হাতের তালু সামনে মেলে ধরে। ফোস্কা পড়েছে। রক্তাক্ত। বলে, 'জ্বলছে।'

'তার আমি কী করব? মাটি কাটা আয়েসের কাজ নাকি? হাঁ করে কী দেখছিস। টাকা নিয়ে যা। অমন করিস-তো কোনদিন মুনিষ লাগাব না।'

ভ্যাগ্যিস বাদল। সাইকেলে। থমকে বলে 'কী হল?'

যতীন দাস ব্যস্ত গলাতে বলে, 'ভাল হল—তুই এসে পড়েছিস বাদল। দেখ না মাটি খানিকটা সড়গড় করে দিল মাঠের। পাঁচটাকা দিলাম। কথাও হয়েছিল তাই! আরে তুই হাঁ করে কী দেখছিস। চোখ যে জ্বলছে। দাঁত কিড়মিড় করছিস। ও বাদল, তাহলে বাঁদরের বিষে বাঁদর হয়ে গেল? আঁচড়ে কামড়ে দেবে না তো।'

বাদলও দেখে। সত্যিই তো। বলে, 'ধীরেন টাকা ধরো। সোজা ঘর।'

কিন্তু বাদলের কথা কানে যায় না ধীরেনের। সে কী বাঁদর হয়ে যাচ্ছে? হয়ে সে ঝাঁপাবে যতীনের উপর? আঁচড়ে কামড়ে দেবে? ফেলে দেবে মাটিতে? বাঁদর হতে পারলে কী ভাল যে হত! বিষের ভয় নয়—এখন বিষক্রিয়ার আকৃতি তার মধ্যে। কিন্তু বাঁদর হওয়া কেন যে যায় না। কোথায় যে আটকায় সে অবাক চোখে, যতীন দাস অবিকল পশুপতির বাঁদর হয়ে গিয়েছে। বিষক্রিয়া কী ভাবে হয়েছে যাতে কী না বাঁদর! তাকে আঁচড়াচ্ছে। কী সাঙ্ঘাতিক! বাদল দেখতে পাচ্ছে না। অথচ সে দিন তো দিব্যি দেখতে পেয়েছিল। বাদলকে দেখাবে নাকি হাতের তালু—বাঁদরটার আঁচড়ের দাগ!

তারপরই ওদের মুখ দেখে কেন যে সারাদিনের শ্রমক্লান্ত চোখে ভয় আসে। সে দাঁড়াতে পারে না। পাঁচ টাকা নিয়ে ছোটে।

ঘরে আসতে খুসী বলে, 'কী হল! অমন হন্তদন্ত হয়ে আসছ।'

'বাঁদর।'

'বাঁদরটা মরেছে। আমি শুনেছি। বেশ হয়েছে। তা তোমার কী হল আবার?'

'বাঁদর কী মরে? এই দেখ—।' হাতের ফোস্কা পড়া রক্তবর্ণ তালু সে দেখায়।

আঁতকে ওঠে খুসী, 'ওমা হাতের দশা কে করেছে এমন? মাটি চুটিন—।'

'বললাম না বাঁদরের আঁচড়। যতীন বাঁদর—।'

খুসী ভয় পায়। আতঙ্কিত স্বরে বলে, 'কী বলছ খ্যাপার পারা।'

ধীরেন বুঝিয়ে দেয় ব্যাপারটা। খুসিকে মানতেই হয়, মানুষটা পাগল নয়। প্রলাপও বকছে না। সত্য কথাই বলছে। কিন্তু চিল চেঁচানি তুলে ফেলতে সে পারে না। এ তো আর কিচমিচ ঘিঁচঘিঁচ করা বাঁদর নয়, কথা বলা বাঁদর। দু' পেয়ে। দু'পেয়ের বিষ নখরের আঁচড়ের দাগ যে দেখা যায় না। কেমন করে সে প্রমাণ করবে।

কবি কিম্বা বিপ্লবীদের জন্য

প্রিতম মুখোপাধ্যায়

টানা সাতটা বছর জেলের মধ্যে কাটালাম। ওরা অনেকেই বলেছিল জেল টপকে কেটে পড়তে। হ্যাঁ, সেটা আমার পক্ষে মোটেই শক্ত কোন ব্যাপার ছিল না। বিশেষ করে, গতবছর শীতের সময় ইয়াসিন বলে যে রাজ-মিস্ত্রীটা জেলে পাঁচিল সারাই-এর কাজ করছিল সে তো একরকম রাজীই হয়ে গিয়েছিল। মাত্র পাঁচশো টাকার বিনিময়ে ও রাজী হয়েছিল আমাকে সুযোগ করে দিতে। বিকেলে কাজের শেষে বড় মইটাকে ও ইচ্ছে করেই ফেলে যেত জেলের মাঠে, যাতে আমি···। যাক্, যা হয়নি তা বলে লাভ নেই। কিন্তু লোকটা ছিল কি অদ্ভুত রকমের খোলামেলা। ওদের লোভটাও কত কম—মাত্র পাঁচশো টাকাতেই এতবড় একটা দুর্ঘটনার দায় ও নিজের কাঁধে বইতে রাজী হয়েছিল। অথচ লোকটার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল মাত্র সাতদিনের পুরোনো। কয়েকটা মাত্র বিড়ির সুবাদে বন্ধুত্বটা সবে গড়ে উঠেছিল বলা যায়।

কেন পালালাম না সেটা সত্যিই একটা রহস্য। মাঝে মাঝে আমার বৌ আর ছেলেটা দেখা করতে আসত। বৌটা কাঁদত, ইনিয়ে বিনিয়ে তার দুঃখের কথা বলত। ছেলেটা বলত, বাবা তুমি কবে বাড়ী আসবে? আর ওরা চলে গেলে জেলের বারান্দায় বসে ভাবতাম, আর নয়—এবার যে করেই হোক কেটে পড়তে হবে।

বেশি ভাবনাচিন্তা করা কোনদিনই আমার অভ্যেস ছিল না। যে কোন সিদ্ধান্তের জন্য মাত্র পাঁচ মিনিটই ছিল যথেষ্ট। তবু সত্যেন রায় বলে ঐ লোকটার জন্য আমার যাওয়া হয়ে উঠল না।

অথচ সত্যেন রায়ের মতো লোকদের কোনদিনই আমি সহ্য করতে পারি নি। লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে আর রাতে শোবার আগে গুনগুন করে গান অথবা কবিতা আওড়াতে থাকে। একটা লোক জেলের মতো একটা জঘন্য ধরনের নরকের মাঝখানে গান বা কবিতা করছে এটা যে কী ধরনের অসহ্য ছিল তা বলে বোঝান যাবে না।

প্রথম দিন তো আমি প্রবল চীৎকার করে উঠেছিলাম, কে রে—কোন শুয়োরের বাচ্চা? চীৎকার শুনে পাশের সেল থেকে আসা গানটা সামান্য

থমকে গিয়েছিল তারপর আগের মতই আবার শুরু হল। আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, সঙ্গে একটা বিশ্রী গালাগাল। একই রকম থমকে গানটা আবার আরম্ভ হল, একই রকম টানা সুরে :

ও রে আমার চৌকিদার
ছাড়ো এবার, পরের বার—
সঙ্গে থাকবে হাটের থেকে
নতুন কেনা রিভালবার।

তখনই বোঝা গিয়েছিল লোকটার ধাত আলাদা। মালটা সহজে টসকাবে না।

রোজই সকালে গোনাগুনির একটা ঝামেলা সহ্য করতে হত। সেল থেকে বার করে একটা বড় লাইনে দাঁড় করানো হত আমাদের। ঐ লাইনে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারতাম কোনটা গতকাল এসেছে, কোনটা বেরিয়ে গেছে। সেখানেই একদিন আমি আবিষ্কার করলাম সত্যেনকে। চোখে বোতলের তলার মতো মোটা কাচের চশমা, এতই রোগা যে মাথাটা সবসময়ই ঘাড়ের ওপর লকপক করছে।

গলা নামিয়ে আমরা কথা বলতে শুরু করলাম।

গান করেন কেন?

আপনি গালাগাল দেন কেন?

এটা কি গান গাওয়ার জায়গা? ওয়াডারদের বলে কয়েকটা হুড়কো খাওয়ালে তবে থামবে।

লোকটা হাসল। কেমন যেন অবজ্ঞার ভাব। ওর কপালের ওপর একটা বড় কাটা দাগ—পুরোনো তাই কালচে মেরে গেছে। সেদিকে চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ওটা কিসের?

ওয়াডারদের হুড়কো। দশবছর আগের।

পুরোনো পাপী?

পবিত্র পাপী।

চার্জটা কি? রেপ না ডাকাতি?

দুটোই। যা পেরেছে খান পাঁচ-ছয় চার্জ লাগিয়ে দিয়েছে।

ও গানটা, যেটা রোজ রাতে গান—ওটার মানে কি?

আপনার নাম কি।

মদন। কেন?

ওটার কোন মানে আছে? যেন আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে ওর চোখে সেইরকম একটা ভাব।

ধ্যুস্‌শালা!

লোকটা গলা চেপে খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসল, মানে না থাকাটাই একটা মানে।

এইভাবে আমাদের শুরু হয়েছিল। কেমন যেন একটা আকচাআকচির সম্পর্ক। যখনই দেখা হত যেন একে অপরকে টিপেটুপে দেখতাম। লোকটা কবি বা বিপ্লবী কিছু একটা হবে হয়ত। এই দুটো জাতকেই আমি একদম পছন্দ করতাম না। কিন্তু ওকে অস্বীকার করার কোনো উপায় ছিল না আমার। আমার আর ওর সেলের মাঝখানে, অনেকটা উঁচুতে একটা জানলা ছিল। রোজই রাতে ঐ জানলার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তাম। পাশের সেল থেকে খাওয়ার চপরচপর শব্দ পাওয়া যেত, তারপর জলের শব্দ। সত্যেন রায় হাত ধুচ্ছে। আমার বিরক্তি আরো বাড়তে শুরু করত—কারণ এরপরই রোজকার মত ও আমার সঙ্গে বকরবকর শুরু করবে। ও এমনসব কথা বলত যার অনেকটাই আমার মাথায় ঢুকত না। মাঝে মাঝে একটা কাগজের গোলা জানলা দিয়ে আমার ঘরে ছুঁড়ে দিত। তাতে এমনসব কথা লেখা থাকত যার কোন মানে নেই। আমার কাছে কোন পেন ছিল না, থাকলে পচাপচা কয়েকটা খিস্তি লিখে কাগজগুলো আবার ফেরত দিয়ে দিতাম ওকে।

প্রায় মাস ছ-সাত ধরে অনেক গালাগাল দিয়েছি সত্যেনকে। দিতে দিতে একসময় আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। এমন একটা অসহ্য অবস্থা তৈরি হয়েছিল, লোকটা যদি মারা যেত বা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হত তাহলে আমি বেঁচে যেতাম।

এরইমধ্যে সত্যেন রায়কে অস্বীকার করার একটা উপায় বার করে ফেললাম। প্রতিরাতে দু-কানে আঙুল পুরে ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাসটা রপ্ত করে ফেললাম। ও যা-ই বলুক না কেন কোনকিছুই আমার শোনার দরকার নেই। ওর ছুঁড়ে দেওয়া কাগজের গোলাগুলো আর খুলেও দেখতাম না। আমার ঘরে আস্তে আস্তে জমে উঠছিল কাগজের গোলা। একটা, দুটো, পাঁচটা…পনেরটা আরো অনেক। সত্যেন রায় এবার কি করে আমি দেখতে চাই। একটা করে গোলা এসে পড়ত আর কানে আঙুল পুরে বেশ মজার সঙ্গে আমি ব্যাপারটা উপভোগ করতাম।

আমি জানতাম একদিন সত্যেনকে থামতেই হবে। এবং অবিশ্বাস্যভাবে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ও চুপ করে গেল। আর কোন কথা শোনা যায় না, কোন কাগজ ছুঁড়ে দেয় না। কয়েকদিন মাথা গুনতির মধ্যেও সত্যেনকে দেখতে পেলাম না। সত্যেন কি ছাড়া পেয়ে গেল বা অন্য কোন জেলে বদলি হয়ে গেল ?

জানলার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একরাতে ওকে ডাকলাম, সত্যেন—সত্যেন তুমি আছ ?

কোন উত্তর পাওয়া গেল না। আরো কয়েকবার ডাকলাম। কোন সাড়া নেই। জানলাটা আর একটু নীচুতে হলে একবার না হয় ওঠার চেষ্টা করা যেত। ঘরের কোণে পড়ে থাকা কাগজের কয়েকটা গোলা ছুঁড়ে দিলাম ওর ঘরে। আমাকে জানতেই হবে লোকটা আছে কি নেই। আরো কয়েকটা গোলা হাতে নিলাম—প্রত্যেকটা ঐ জানলা দিয়ে ছুড়ে দেব আর, সত্যেন সাড়া দাও, বলে চীৎকার করব ঠিক করলাম।

কিন্তু তার আগে গোঙ্গানির মতো একটা কান্নার শব্দ ভেসে এল। জানলার নিচে দেয়ালে কান পাতলাম। হ্যাঁ, সত্যেন কাঁদছে। হাতে ধরা দুমড়োনো কাগজগুলো খুলে পড়তে লাগলাম—পরপর কয়েকটা কাগজের টুকরোয় একই কথা লেখা।

আজই সেই শেষরাত। কাল সূর্য ওঠার আগেই ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।

আরো কয়েকটা মোড়ক খুলে দেখলাম। হাতের লেখাটা অস্পষ্ট, আঁকা-বাঁকা। প্রত্যেকটি কাগজে লেখা সেই একই কথা। চীৎকার করে জানতে চাইলাম, সত্যেন কারা তোমাকে মেরে ফেলবে ? উত্তর দাও—কেন মারবে ?

আমার চীৎকারে ওপাশের কান্নাটা বন্ধ হয়ে গেল। সত্যেন একজন বিপ্লবী কিম্বা কবি। ও কেন জেলে এসেছে তাও জানি না। কখনও বলে একটা মেয়েকে খুন করেছে, কখনবা এক কোটিপতির শোবার ঘরে কেমন করে ও আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল সেই গল্প বলত। কিন্তু তা বলে ওকে কখনই আমার পাগল মনে হয় নি। সত্যেন গুছিয়ে কথা বলতে পারত আর কথাগুলো বলার সময় ওর চোখের তারায় খেলে যেত রাগ, ঘৃণা আর বেদনা। সত্যেন যে আমাদের মতো দাগী আসামী নয় সেটা বুঝতে পেরেছিলাম, আরো অনেকের মতো সে যে পুরোপুরি সুস্থ তাও নয়

কিন্তু তা বলে সত্যেনকে পাগল বলা যাবে না। সে ছিল একটা অন্য ধরনের লোক—একজন কবি বা বিপ্লবী যার সঙ্গে আর পাঁচজনের মেলে না।

কান্নাটা থেমে যাবার পর আরো অনেকক্ষণ দেয়ালের ওপর কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকলাম। জেলের ঘণ্টাতে জানলাম রাত দশটা। বাইরে একটা ভারী বুটের শব্দ। শব্দটা আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে পাশের ঘরের সামনেটায় দাঁড়িয়ে গেল। ওটা নিশ্চয়ই কোন জাঁদরেল পুলিস অফিসারের। সত্যেনের সেলের সামনে দাঁড়িয়ে কি দেখছে অফিসারটা?

না, আমি একটু বেশীই উৎসাহ দেখাতে শুরু করেছি। খাওয়াদাওয়ার পর এতক্ষণে অনেকটা ঘুমিয়ে নেওয়া যেত তার বদলে ওর ঐ কাগজের টুকরোগুলো আর কান্নাটায় অথবা সময় নষ্ট করেছি। কে এই সত্যেন রায়? জেলে যখন আছে তখন নিশ্চয়ই কোন অপরাধ করেছে। তাছাড়া, সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল ওকে আমি ঘৃণা করি। বৃথা সময়টা নষ্ট করার জন্য নিজেকেই আহাম্মক বলতে হয়। জীবনে অনেক আহাম্মুকি হল, আর নয়।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, বোধহয় সেটা মাঝরাত হবে। কয়েকজনের চাপা ফিসফিসে কথাবার্তায় ঘুম ভাঙল। প্রথমে মনে হল ব্যাপারটা স্বপ্ন জাতীয় কিছু, কিন্তু তারপরই বুঝতে পারলাম পাশের ঘরে কয়েকজন লোক কথা বলছে। কি ব্যাপার? উঠে গিয়ে দেয়ালে কান পাতলাম। একটা মোটা কণ্ঠস্বর প্রশ্ন করে যাচ্ছে আর সত্যেন উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু ওর গলাটা স্বাভাবিক নয়। যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এমন এলানো আর ধরাধরা।

তুমি আর কতদিন বেঁচে থাকবে?

অনেকদিন। হা-জা-র ব-ছ-র।

তুমি যা করছ, একে খ্যাপামি ছাড়া আর কিছু বলে না।

প্রতিটি খ্যাপামি দিয়েই পৃথিবীটা পাল্টেছে।

তুমি বড় তর্ক কর।

যে বেঁচে আছে সে তর্ক করবেই।

তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?

করলে যদি আপনাদের সুবিধে হয় তাহলে করি না।

অবিশ্বাস করলেই আমাদের সুবিধে হয়।

তাহলে বলব আমিই ঈশ্বর।

তোমার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ আনা হচ্ছে।

যে প্রতিমুহূর্তে ধর্ষিত হচ্ছে তারও ধর্ষণ করার অধিকার আছে।

তুমি সাধারণ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক।

ফ্লেমিং আবিষ্কার করেছিলেন, কোন ক্ষতিকারক বীজানুকে রক্তের মধ্যে বুনে দিলে তা এমন প্রতিরোধ তৈরি করে যা আরো বড় ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে তোলে।

তোমার গায়ে একজন মৃত মানুষের গন্ধ লেগে আছে।

জন্ম মানেই একটা মৃত্যু।

দার্শনিকের মতো কথা বোলো না। আসলে তুমি একটা জাত বজ্জাত।

পৃথিবীটা অনেক পুরোনো, আর এসব কথাবার্তা এর আগে বহুবার হয়ে গেছে।

আঃ চুপ। আর একটা কথা বললে টুঁটি চিপে ধরব।

ছায়াটা তখনই শেষ হয় যখন আলো নিভে যায়।

একমুহূর্ত আর কোনো কথা নেই। সব চুপচাপ। আমি বুঝতে পারছিলাম সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। অদ্ভুত কোন কিছুর জন্য আমার কানদুটো উদগ্রীব হয়ে থাকল।

অদ্ভুত নিস্তব্ধতা। নিঃশব্দ থাকার জন্য নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেপে রেখেছি। এক···দুই···তিন···চার···তারপরই শুনলাম ভারী কিছু দিয়ে মারার শব্দ। আমি চীৎকার করে সত্যেনকে ডাকতে চেষ্টা করলাম। গলাটা বুঁজে এল।

ঝপ্, কি যেন পড়ল পাশের ঘরে। চমকে ওপরের জানলার দিকে তাকালাম। জানলাটা এত ওপরে যে কিছুই দেখার উপায় নেই। আর দেওয়ালটাও এত মসৃণ যে ওঠার চেষ্টা করা বৃথা। শুধু কান পেতে থাকা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমার। পাশের ঘরে ভারী কিছু একটা হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চেয়ার সরে যাওয়ার শব্দ। একটা বুটপরা পা ঘরের মধ্যে কয়েকবার চলে ফিরে বেড়ানোর শব্দ। তারপর হঠাৎ-ই জানলা দিয়ে একটা কাগজের গোল্লা এসে আমার ঘরে পড়ল। তার মানে সত্যেনের কিছু হয়নি, ও বেঁচে আছে। মোড়কটা দ্রুত খুলে ফেললাম। বাঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা :—

আমার মৃত্যুর জন্য সকলেই দায়ী

এ লেখার মানে কী? সত্যেন কি তাহলে বেঁচে নেই? ওকে ওরা মেরে ফেলেছে? আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। ঘরের একটা জায়গায় থপ্ করে বসে পড়লাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই সত্যেনের খোঁজ নিতে আরম্ভ করলাম। ওয়াডারদের মধ্যে যে লোকটা কর্তাব্যক্তি সেও কিছু বলতে পারল না—এমনকি সত্যেন বলে আদৌ কেউ ছিল কি না সে বিষয়েও সন্দেহ প্রকাশ করল। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন রহস্যজনক। আমিও ক্রমে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লাম। রোজই রাতে ঐ জানলার দিকে তাকিয়ে বসে থাকতাম। ওদিক থেকে কোন সাড়া পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে থাকতাম। সত্যেন যে সত্যিই বেঁচে নেই, এটা চিন্তা করলে মনটা হু হু করে উঠত। জেল সম্পর্কে আমার কোন উৎসাহ থাকল না আর। সত্যেনকে আমি কখনও ভালবাসিনি, আসলে তাকে ঘৃণা করতাম—তবু তার উপস্থিতিটুকু এত আকর্ষক ছিল যে জেলের ভেতরের জীবনটা উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল আমার কাছে।

এইসময় রোজই পালিয়ে যাবার কথা ভাবতাম। ইয়াসিনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আরো পরে। সেই দোদুল্যমান অবস্থায় যদি ইয়াসিনের প্রস্তাবটা আসত, তাহলে কি হত বলা যায় না।

এরইমধ্যে একদিন মাঠের ধারে বসে কাজের তদারকি করছি, একজন কালো কোট পরা লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি যেহেতু পুরোনো আর আস্থাভাজন আসামী তাই অন্যান্যদের কাজের দেখভাল করার দায়িত্বটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল। এই কাজটার মধ্যে এমন একটা বসে বসে দেখে যাওয়ার ব্যাপার ছিল যে প্রতিদিনই দুপুরের দিকে আমার ঘুম পেয়ে যেত। সেদিনও ঘুমে প্রায় চোখ জুড়িয়ে আসছে, এমনসময় কালো কোটওলা লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল।

আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

বলুন।

সত্যেন রায় বলে কাউকে চিনতেন?

বহুদিন পরে নামটা শুনে চমকে উঠলাম। মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

কি রকম চিনতেন?

সে একজন কবি কিম্বা বিপ্লবী। জেলের মধ্যে ওকে খুন করা হয়েছিল।

খুন না আত্মহত্যা সেটা বিতর্কের বিষয়।

লোকটা আমার চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে থাকল। ঠিক কিভাবে যে এরপরের কথাবার্তাগুলো চালানো যায়, আমার মাথায় আসছিল না। শুধু লোকটা কে, কেন সত্যেন রায় সম্পর্কে জানতে চাইছে এই একটা প্রশ্নই আপাতত তোলা যেতে পারে।

গরম হচ্ছিল সম্ভবত, লোকটা তার গায়ের কোট খুলে যত্ন করে পাট করে নিল। একটা সিগারেট ধরাল। আমাকেও দিল একটা। তারপর বলল, সত্যেন কে, কি করতে চাইছিল, কেনই বা তাকে জেলে আনা হল এবং জেল থেকে সে কোথায় গেল সেই সমস্ত অনুসন্ধানের জন্য একটা কমিশন বসানো হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি আপনার কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য আছে। কমিশনের তরফ থেকে প্রাথমিক কথাবার্তার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। পরে আমাদের চেয়ারম্যান আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

একটানা কথাগুলো বলে লোকটা থামল। এরপর একটা কিছু বলতে হয়, তাই ধীরে ধীরে বললাম, সত্যেনের হত্যাকারীদের ধরতেই হবে।

যেন বিরাট কোন ভুল শব্দ ব্যবহার করে ফেলেছি। আক্ষেপের শব্দ করে, কয়েকবার মাথা নেড়ে লোকটা বলল, হত্যা কি না সে বিষয়ে আমরা কেউই নিশ্চিত নই।

কোটটা পরে নিয়ে সে উঠে পড়ল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, চেয়ারম্যান কবে আসবেন?

সময় হলেই আসবেন। লোকটা হেসে উত্তর দিল।

আমি কিন্তু এখানে বেশিদিন নেই। বছর দুয়েক।

তার মধ্যেই আসবেন। চলি।

লোকটা চলে গেল। তারপর থেকে রোজই আমি চেয়ারম্যানের জন্য অপেক্ষা করতাম। সত্যেনের লেখা প্রত্যেকটা মোড়ক পরপর সাজিয়ে রেখেছিলাম। এগুলো প্রত্যেকটা হল জলন্ত প্রমাণ যে সত্যেনকে মেরে ফেলা হয়েছে। চেয়ারম্যানের জন্য অপেক্ষা করতে করতে জেল থেকে পালানোর ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গেলাম। আসলে ওটা আর কখনই আমার মাথায় আসেনি। এরকম একটা মূল্যবান সময়ে আমি যদি পালিয়ে যাই তাহলে সত্যেনের প্রতি অপরাধ করা হবে।

এরমধ্যে সুপারের হাত থেকে একদিন একটা চিঠি পেলাম যে অনিষ্টকারী না হওয়ার জন্য আমার মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার মানে, আর মাস চারেক বাকি আছে। এই চার মাসের মধ্যে যদি চেয়ারম্যান না আসে তাহলে সত্যেন সম্পর্ক অনেক কিছুই ওদের জানানো যাবে না। ছাড়া পাওয়ার পর আমি তো আবার সেই অন্ধকার জগতে ফিরে যাব—আবার সেই ওয়াগানের মাল সরানো, বাজারদখল, ছোট-খাট ছিনতাই। তখন কি

সত্যেনের জন্য আর সময় পাব? বা সময় পেলেও একজন এ্যান্টিসোসালের সাক্ষী কি ওরা পাত্তা দেবে?

একদিন এ্যাসিঃ সুপারের সঙ্গে দেখা করে চেয়ারম্যান কবে আসবে জানতে চাইলাম। উনি বেশ কয়েকটা ফাইল উল্টেপাল্টে বললেন- নাঃ, আমাদের কাছে কোন ইনফরমেশন নেই।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই আমি বিমর্ষ হয়ে পড়লাম। আমি আর মাঠে যেতাম না। পেচ্ছাপ-পায়খানা ছাড়া বাকি সময়টা সেলের মধ্যেই শুয়ে শুয়ে কাটাতে লাগলাম। চাদরের তলায় সত্যেনের মোড়কগুলো রাখা ছিল। রোজই সেগুলো বার করে একবার করে পড়ে আবার যত্ন করে রেখে দিতাম।

তখন বোধহয় আর মাসখানেকের মেয়াদ, এমন এক বিকেলে সেই কালো কোট পরা লোকটা আর সঙ্গে মোটামতন থপথপে গোছের একজন আমার সেলের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বোধহয় কালোকোট-ওলা লোকটা সেলের দরজায় টোকা মারতেই জেগে উঠলাম।

লোকটা বলল, চেয়ারম্যান এসেছেন।

চেয়ারম্যান মাথা নাড়ল। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মুছল।

আমি তাড়াতাড়ি বিছানার চাদরের তলা থেকে সত্যেনের মোড়কগুলো বার করলাম। গুনে নিলাম দ্রুত। হ্যাঁ, সব মিলিয়ে বিয়াল্লিশটা। চেয়ারম্যানকে কাগজগুলো দিয়ে বললাম, এই যে স্যার—সত্যেনের নিজের হাতে লেখা। দেখলেই বুঝবেন স্যার, ওকে মার্ডার করা হয়েছে।

চেয়ারম্যান ভাবলেশহীন ভাবে কাগজগুলো নিল। কোটপরা লোকটার হাতে দিয়ে বলল, রেখে দাও।

আমি বললাম, আপনি এসেছেন খুব ভাল হয়েছে স্যার। আমার হাতে মাত্র আর একমাস সময় ছিল। খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম স্যার।

জেলের এক কর্মচারী এসে চেয়ারম্যানকে চেয়ার দিয়ে গেল। চেয়ারে বসে চেয়ারম্যান একটা ফাইল ওল্টাতে লাগল। একটা পাতার ওপর চোখ বুলিয়ে কি যেন পড়ল চেয়ারম্যান। কপালটা কুঁচকে গেল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বেশ রুষ্ট স্বরে জিজ্ঞেস করল, শুনুন—মোট সাতটি পয়েন্ট আমাদের কমিশনের বিচার্য বিষয়। ফার্স্ট পয়েন্ট হল, সত্যেন রায় কে?

আমরা এখন প্রথম পয়েন্টটাকেই বিচার করতে চাই—বাকীগুলো পরে আসবে।

কিন্তু ততদিনে আমি যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যাব স্যার। তারপর হয়তো—।

প্রথম পয়েন্টটার উত্তর খুঁজে পেলেই, বাকীটা জানতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না।

কিন্তু স্যার সত্যেন রায়কে জেলের মধ্যেখুন করা হয়েছিল। আমার কাছে প্রমাণ আছে স্যার।

বলছি তো ওটা আপাততু আমাদের বিচার্য বিষয় নয়।

কিন্তু স্যার…

স্যার যা জিজ্ঞেস করছেন শুধু সেইটুকুর উত্তর দিন। পাশ থেকে কালো কোট পরা লোকটা বলে উঠল।

আপনি বলছেন্ সত্যেন রায় কবি বা বিপ্লবী। একথার মানে কি?

মানে স্যার, এটা আমার মনে হয়েছিল।

অনুমান?

ঠিক অনুমান নয়, লোকটা রোজ রাতে কবিতা বলত।

কবিতা বললেই কেউ কবি হয় না।

না, তাছাড়া স্যার, ও এমন সব কথা বলত—।

কি কথা?

এমন সব কথা, যার এমনিতে কোন মানে হয় না—। যেমন ধরুন একদিন বিকেলের দিকে আমরা সেলের দিকে ফিরে আসছি, হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ল একজায়গায়। লাল হয়ে যাওয়া আকাশটার দিকে তাকিয়ে বলল, বিকেলের পর রাত, তারপর আবার প্রভাত—আর তখন আকাশটা আবার গায়ে জড়িয়ে নেবে লাল ওড়না।

আমার কথা শেষ হতেই চেয়ারম্যান হো-হো করে হেসে উঠল। সেলের ভেতরটা সেই প্রচণ্ড হাসিতে গমগম করে উঠল। খানিকটা ধাতস্থ হয়ে চেয়ারম্যান বলল, এরকম কথা তো আমরাও বলে থাকি। আমার ছেলেটাও বলে মাঝে মাঝে। কিন্তু আমাদের চোদ্দপুরুষে কেউ কোনদিন কবিতা লিখেছে বলে শুনিনি!

কি বলব। লজ্জিত, কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে থাকলাম। চেয়ারম্যান ঘড়ি

দেখে উঠে দাঁড়াল। কোটপরা লোকটার দিকে ফিরে বলল, ব্যাস—আজ এই পর্যন্ত।

আবার কবে আসবেন স্যার?

দেখা যাক।

একমাস পরে স্যার আমাকে পাবেন জলার বস্তীতে। তিন নম্বর ময়না বক্সী লেন।

ও আমরা ঠিক খুঁজে নেব। ঠিকানাটা নোট করে নাও তো। কোটপরা লোকটাকে বলল চেয়ারম্যান। একটা ডায়রির মধ্যে আমার ঠিকানা লিখে নিয়ে ওরা চলে গেল।

ব্যস, আমার আর কোন চিন্তা রইল না। শুধু একটাই ব্যাপার যে জেলের বাইরে ঐ তিন নম্বর ময়না বক্সী লেনের ঘরে আমাকে চেয়ারম্যানের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তাই করব ঠিক করলাম। আর কোন কাজ নয়। ওরা এসে যদি আমাকে খুঁজে না পায়। যদি সত্যেন রায়ের হত্যাকারী সাক্ষীর অভাবে ধরা না পড়ে।

দেখতে দেখতে আমার ছাড়া পাওয়ার দিন এসে গেল। সবাইকে নমস্কার করে, জেলের খাতায় জমা করা জিনিসপত্র নিয়ে বাইরে এলাম। সাতবছর বাদে আবার বাইরের পৃথিবীতে। কিন্তু হাজতের বাইরেও আমার মুক্তি নেই। সেলের মতই সেইরকম ছোট্ট একটা ঘর—তিন নং নম্বর ময়না বক্সী লেনের সেই চেনা জায়গায় বন্দী হয়ে থাকতে হবে আমাকে।

আমাকে নিতে এসেছিল আমার বৌ, বাচ্চা আর দুজন সাগরেদ। ওরা সকলেই খুব আনন্দিত। কিন্তু আমার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে ওরা কেমন যেন ঘাবড়ে গেল।

একজন বলল, কি গুরু! এতদিন আমাদের নিরামিষ যাচ্ছিল—কাল থেকে শুরু হবে পুরো এ্যাকসান।

না. সত্যেন রায়ের হত্যাকারী ধরা না পড়লে আমাকে তোমরা পাবে না।

কে সত্যেন?

আছে। একজন কবি কিম্বা বিপ্লবী। তার আসল পরিচয় আমরা জানি না—কিন্তু সে ছিল। তাকে মার্ডার করা হয়েছিল।

কেউ আর কথা বাড়াল না। আমরা ঘরে ফিরে এলাম। প্রথম প্রথম লোকে আসত। তারপর যখন বুঝল সত্যিই আমি ঘরের বাইরে যাব না,

চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে তবেই আমি মুক্তি পাব—তখন আর কেউই বড় একটা আসত না। বস্তীর লোকজন আমার নামে নানান কথা বলতে আরম্ভ করল। বলল, জেলে মারের চোটে আমার না কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলেরা জানলা থেকে, কাকু ঐ যে চেয়ারম্যান আসছে, বলে আমাকে খ্যাপাত।

চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে আমার মাথায় হঠাৎ একদিন কবিতা লেখার কথা মনে হল। কবিতা জিনিসটা বেশ শক্ত, তাছাড়া আমার আবার পড়াশুনোও বেশী নেই কাজেই চারটে লাইন লিখতেই বেশ ঘেমে যেতে হল। তবু চেষ্টা করতাম। রোজ রোজ আরো চেষ্টা করতাম কবিতার জন্য।

ভোরবেলা উঠে এইরকম একদিন খাতা আর পেন নিয়ে লিখতে বসেছি, হঠাৎ একটা কাগজের মোড়ক এসে পড়ল জানলা দিয়ে। নিশ্চয়ই কেউ আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছে। ছুটে জানলার কাছে গেলাম। না, সেখানে কেউ নেই। হয়তো ছুঁড়ে দিয়েই দৌড়ে পালিয়ে গেছে। ঘরের বাইরে গেলাম। সত্যিই কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মনে পড়ল, কতদিন ঘরের বাইরে আসি নি। সুন্দর হাওয়া বইছে। নরম সকাল ছড়িয়ে পড়ছে। বুক ভরে শ্বাস নিলাম।

কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরে থাকার উপায় নেই। ঐ কাগজের মোড়কটা আমাকে টানছে। মোড়কটা গড়িয়ে খাটের তলায় ঢুকে গিয়েছিল। শুয়ে পড়ে বার করলাম। মোড়কটা খুলে চমকে যেতে হল। অবিকল সেই একই হাতের লেখা, সেইরকম কাঁপা কাঁপা অক্ষরে সত্যেন লিখেছে :

আমি বেঁচে আছি। বেঁচে থাকব আরো হাজার বছর।

আমি চীৎকার করে উঠলাম, সত্যেন বেঁচে আছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা পুলিস ভ্যান এসে দাঁড়াল আমার বাড়ীর সামনে। নেমে এল দুজন বন্দুকধারী পুলিস। ওদের একজনের হাতে হ্যাণ্ডকাপ। আমার হাতে হ্যাণ্ডকাপটা পরিয়ে দিল একজন। আর একজন বলল, ইউ আর আণ্ডার অ্যারেষ্ট।

আমার অপরাধ?

সেটা থানায় গেলেই জানতে পারবে।

ওরা হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাকে ভ্যানে ওঠাল। চারপাশে বস্তীর লোকেরা ভিড় করে এসেছে। বৌ, বাচ্চা কান্নাকাটি করছে। গাড়ীতে ওঠার আগে সকলের উদ্দেশে বললাম, শোনো—চেয়ারম্যান এলে বোলো, সত্যেন মারা যায় নি সে বেঁচে আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী

নন্দদুলাল আচার্য

যাজ্ঞবল্ক্য। এখনো ততখানি শান্ত হতে পারিনি মৈত্রেয়ী। ব্রহ্ম কে কি সে ভাবে জেনেছি এ সংশয়ে দ্বিধান্বিত এ ব্রাহ্মণ। যাকে তুমি প্রজ্ঞা বল কখনও তা স্থিত করে, ফের প্রবৃত্তির সঞ্চালিত অঞ্জন শলাকা বিদ্ধ করে আঁখির পল্লব।

মৈত্রেয়ী। তোমার মর্মের বৃত্তে খেলা করে বসন্ত উৎসব। হে সৌম্য যৌবন ওই এখনও অরুণ বর্ণে রাঙায় আকাশ। এ সময় সে ত নয় অস্তাচলগামী।

যাজ্ঞবল্ক্য। আমি বোঝাই কি ভাবে
তত্ত্বে যা জেনেছি সত্য
জীবনের প্রতি বর্ণে তাকে কেন
মেলাতে পারি না।

মৈত্রেয়ী। তুমি জ্ঞানী, সিদ্ধ নও প্রিয়।
জীবনের প্রতিব্রজে অমোঘ সঞ্চার
যখন সম্পূর্ণ হবে চলা
তুমি সিদ্ধ হবে। আর দূরে দূরে সরে যাবে যত অধীরতা।

যাজ্ঞবল্ক্য। এখনো কি বাকী আছে আরো পথ?
ওগো শান্তশীলা,
আনন্দ নদীর এত কাছে এসে
পঙ্ক কেন টানে পদতল।

মৈত্রেয়ী। মাঝে মাঝে মেধার হীরকগুলি
সন্না দিয়ে তুলে নেয় কেউ।
দ্যুতিমান হে পুরুষ,
যাকে তুমি পঙ্ক ভাবো, ছাখো,
প্রতিটি চরণপাতে হয়ে ওঠে
সিতাভচন্দন।

যাজ্ঞবল্ক্য। তোমার নন্দিত বাক্যে ভরে ওঠে প্রাণ।
তবু মনে হয়, মহান বিশ্বের এই বিন্দুবৎ গ্রহে কি আমার
আত্মপরিচয়?

স্মরণ অতীত কালে কি ছিলাম আমি?
কে আমি, কোথায় আমি?
এই অনিকেত, খণ্ডজীব কতদূর
যেতে হবে তাকে?

মৈত্রেয়ী। তর্কে তুমি জিতে এলে জনকের বিতর্ক সভায়।
বাচাল ঋষির মুণ্ড
খসে গেল তোমার প্রখর ব্রহ্মতেজে। একে একে সব ঋষি
ফিরে গেল পরাভূত, নতশির, নতনেত্রপাতে
জয়ের পল্লব শিরে তবু তুমি রয়ে গেছ
প্রশ্নাতুর, সংশয়ের সিন্ধুতীরে একা?

যাজ্ঞবল্ক্য। একা। গ্রহণের অন্ধকারে ছেয়ে গেছে
দিগ-দিগঞ্চল। হে মৈত্রেয়ী,
এই নাও শুষ্ক বোধি,
আমাকে সম্পূর্ণ কর
তর্ষময় দুটি ঠোঁটে এনে দাও
এক কুষি জল।

মৈত্রেয়ী। একদিন আর্তব সৌরভে
ছুটে এসেছিলে প্রিয়
এ নারীর পাতার কুটিরে।
আলবালে যত জল ছিল
সবই ত দিয়েছি।
তবে কোন তৃষ্ণা তোমার
পরাবৃত্ত এই দ্বারে?

যাজ্ঞবল্ক্য। গার্হস্থ্য চর্যার আর ততখানি প্রাণ নাহি টানে।
দূর দেশে যেতে চাই,
প্রকৃতির তীর্থপথে, বনে। আপনারে চিনে নিতে আরো কিছু
পাঠ চাই, অভিজ্ঞতা চাই।

মৈত্রেয়ী। তোমার গৌরব গাথা
ছড়িয়েছে দিকে দিকে,
আর্যাবর্তে, ইলাবর্ষে
আরো দূর দেশে। আরও কি
আকাঙ্ক্ষা আছে কিছু ?

যাজ্ঞবল্ক্য। কে চায় বিজয় গাথা
পৌরপরিচয় ?
আমাকে বিদায় দাও আজ।
সংসারের সংকীর্ণ বলয় থেকে
আমি যাব প্রসারিত প্রকৃতির কাছে।

মৈত্রেয়ী। আর আমি ?

যাজ্ঞবল্ক্য। তুমি রবে পুত্র-পরিজন নিয়ে
সংসারের নিবিড় বন্ধনে।
আমার যা কিছু বিত্ত
ধান্য, কড়ি, পয়স্বিনী গাভী
কাত্যায়ণী সহ সমভাবে
নিও ভাগ করে।

মৈত্রেয়ী। ঐশ্বর্য ? কি ঐশ্বর্য ভাগ করে
দিতে চাও প্রভু ?
যে বৈভব অমৃতপারে না দিতে
কিভাবে দক্ষিণ কর পেতে নেব তাকে।
যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি জানো
কি চাই আমার।

যাজ্ঞবল্ক্য। তুমি মনস্বিনী, প্রগাঢ় বিস্ময়।
আমার যৌবন
ধন্য করে এসেছিলে তরুণ ফাল্গুনে।
ওষ্ঠাধরে প্রিয় কথা,
গণ্ডের কুমার অগ্নি সিক্ত করে দিয়েছিলে
চুম্বনে চুম্বনে।

মৈত্রেয়ী। তখন কিশোরী বেলা,
গার্গী পুঁতে দিয়েছিল বুকের নিহিতে কিছু
অনুভূতি মালা।
তোমাকে প্রথম দেখি জনকের বিতর্কসভায়
বোধিঋদ্ধ উজ্জ্বল পুরুষ……
আমার প্রথম মৃত্যু সেই দিন
হয়ে ছিল হায়।
করোটিতে কৃষ্ণমেঘ গুরু গুরু করে ওঠে
ভেতরে অশান্ত বৃষ্টিধারা।
হে সৌম্য ও দুটি চোখে সেদিন হয়েছি
আত্মহারা।

যাজ্ঞবল্ক্য। দুকানে দ্রাক্ষার দুল,
রাখাল চূড়োয় বাঁধা খোঁপা,
গোপন কুমারী কথা ফুটেছিল নীরব নয়নে,
অধরে সিতাভ হাসি, কণ্ঠে সিঁথি হার,
স্তনভারে ঈষৎ আনত।
করভোরু, এলে শান্ত পায়।
আমি তৃপ্ত বনদেবী,
আমার জীবন ধন্য করেছিলে
অমেয় প্রমায়।

মৈত্রেয়ী। দীর্ঘদিন হয়ে গেল গার্হস্থ্য জীবনচর্যা,
স্থির যদি করে থাকো বানপ্রস্থে যাবে ?
ঋতদৃক,
সকল সম্পদ তবে কাত্যায়নী নিক।
এই আমি জানুপাতি হতে অনুব্রতী
দ্যুতিমান হে পুরুষ, নেবে না আমাকে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। তুমি হবে অনুব্রতী ?
এ বড় দুস্তর পথ। এ ত নয়
সংসারের নিবিড় কুলায়।
তবু যদি অনুব্রজী হবে
তবে এসো, পরম সিদ্ধির পথে
এক সাথে যাই স্নিগ্ধমতী।

মৈত্রেয়ী। ওগো সিদ্ধকামী,
আমরা মুক্তির পথে চলে যাব—
আর এই অসংখ্য মানুষ?

যাজ্ঞবল্ক্য। এই স্থূল জনতার কথা, এই ক্লীব
দ্বন্দ্বে দীর্ণ নীচ প্রজাতির কথা থাক।
স্বার্থান্বেষী কূট ও কপট
অলস নিন্দুক এরা ভ্রষ্ট ও কামুক।
আমি মুক্তি চাই—আমি চাই
আয়তনবান, স্তবনীয়, ধূম্রহীন জ্যোতি
জগৎ আশ্রয় কাম্য, মহৎ, বিশাল, ক্ষয়হীন।
এদের মুক্তির জন্য না আমার কোন দায় নেই।

মৈত্রেয়ী। দায় নেই? হায় ঋষি, তুমিও কি
স্বার্থপর হবে?
যারা মাটিতে লাঙল দেয় শস্য বোনে
জল সেচ করে; খনি থেকে নিষ্কাষণ
করে আনে ধাতু, চালাঘর তোলে
হাতে হাতে, যারা মরে তবু বেঁচে
ওঠে, নদী ও সমুদ্রে বায় দাঁড়,
তারা যদি ভেঙে পড়ে, তারা যদি
ভুলে যায় গান? তারা যদি
নিদ্রাতুর হয়ে পড়ে বিটের শাসনে?
যাবে না তাদের ঘরে ভাঙাবে না ঘুম
জাগরণ মন্ত্র তুমি দেবে না
তাদের কানে কানে?

যাজ্ঞবল্ক্য। এই আত্মনাশী মানুষের জাগরণ
চাও? দুঃশীল দ্বিপদ এই অভিশপ্ত
প্রাণী, যারা জেগে জেগে নিদ্রা যায়।
এই মৈত্রীহীন, স্বজন বিদ্বেষী নীচ
প্রজাতির প্রতি
না আমার কোন দায় নেই।

মৈত্রেয়ী। ধিক্, এ বাক্য শোনার আগে
আমার মরণ ছিল ভাল।
হায় ঋষি, তুমি প্রজ্ঞাবান
তুমি কি জান না
আলোকের পুত্র এরা,
মাঝে মাঝে তিমিরে লুটিয়ে পড়ে শুধু।
প্রত্যাশা ও আনন্দের কথা বলো।
বোধনের কথা বলো, যোগপরায়ণ।

যাজ্ঞবল্ক্য। মাৎস্যন্যায়ে ভরে গেছে
অসংখ্য গ্রামের পরে গ্রাম।
স্ফীত গর্বী দ্বিপদেরা শুভবোধ
জলাঞ্জলি দিয়ে
এ ওকে হনন করে।
পথে পথে আর্তনাদ শোন নি কি
ধর্ষিতা নারীর ?
এই তমোচ্ছন্ন শপ্তপ্রজাতির
কোন দায় নিতে
শ্রীময়ী, অক্ষম আমি।

মৈত্রেয়ী। চমৎকার! তুমি সব দায় ফেলে
নির্জন প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে চলে যাবে
নির্ভার জীবনে।
আর এই অসংখ্য মানুষ
যারা মহৎ ও সৃষ্টিশীল
নষ্ট সমাজের দোষে নষ্ট হয়ে যায়
উচ্চাদর্শকামী এই অন্তঃশীল স্রোতটিকে
বেগবান করে তোল
শক্তি ও প্রেরণা দিয়ে স্বামী।

যাজ্ঞবল্ক্য। প্রতিভাশালিনী, এই কৃশ ব্রাহ্মণের
সমস্ত জীবনচর্যা জানো। এক বেলা
একমুষ্ঠি যবমণ্ড করেছি গ্রহণ।
দুঃখকে করেছি ব্রত।

সমস্ত জ্বালানী দিয়ে সন্দীপিত করেছি যাদের
বলো, সেই ছাত্রদল হারালো কোথায় ?

মৈত্রেয়ী। গো-ক্ষুর ধুলিতে লাল বনে বনে যারা
এনেছে অর্বুদ পূর্ণ করে,
যাদের শ্রমে ও ঘামে পরিচর্যায়
পৃথিবীর শেষ মাঠ অন্নপূর্ণা নারী
মেঘ ছিঁড়ে বজ্রের সন্ত্রাস ছিঁড়ে
পূর্বাচল থেকে যারা ডেকে আনে উষা,
অলিঞ্জর থেকে স্নিগ্ধ জল ঢেলে তৃপ্ত করে
আমাদের মর্ম ও পিপাসা,
যারা ঝড়কে বাঁহাতে রোখে
ডান হাতে সাগরের গ্রীবাকে বাঁকায়,
হে ধীমান প্রিয়,
তাদের চরণ পথে পেতে দিও
তোমার গানের উত্তরীয়।

যাজ্ঞবল্ক্য। আমি ক্লান্ত-অবসন্ন যূথচারী মানুষের তীরে।
তাই স্বয়ং সিদ্ধির পথে যেতে চাই
স্বেচ্ছা নির্বাসনে।
তুমি যাকে অগ্নিপিণ্ড ভাবো,
সে আজ অঙ্গার হয়ে গেছে।

মৈত্রেয়ী। মিথ্যে কথা। হে আমার ধ্যানের আদর্শ,
তুমিই আস্থানভূমি এই প্রজাতির।
নদীপ্লাবনের মত দুকূলে ভাসিয়ে সব কিছু
চলে যাবে? বলো কোন নিরালোক
সংস্কারে আচ্ছন্ন তোমার দৃষ্টি।

যাজ্ঞবল্ক্য। মেধাবিনী,
এ কোন দ্বিধার তীরে নিয়ে এলে
প্রবীণ ব্রাহ্মণে ?

মৈত্রেয়ী। তুমি অংশ, খণ্ডজীব। সম্পূর্ণকে
বাদ দিয়ে একা সিদ্ধি চাও।

তা হলে ত মিথ্যা হয়ে যাবে যত
যোগলব্ধ বিভূতি ও জ্ঞান।
এই শেষ বিনতি আমার
ছিন্ন করে সংশয়ের সব আবরণ
প্রত্যাশা ও আনন্দের কথা বলো,
বোধনের কথা বলো, যোগপরায়ণ।

যাজ্ঞবল্ক্য। মনস্বিনী, খুলে দিলে তৃতীয় নয়ন।
নিরঞ্জন ছিল যে অন্তরতম
প্রহারে প্রহারে তাকে জাগালে কল্যাণী।
সন্তানপ্রতিম এই মানুষের থেকে
কত দূরে সরে গেছি।
আজকে ফেরার পালা।
সত্যের সৌরভে যেন স্নিগ্ধ হল
প্রাণ ও শরীর।
যাব গো দেবিকা আমি
মানুষের দুয়ারে দুয়ারে।

মৈত্রেয়ী। তবে এসো
বেঁচে থাকা অর্থময় করে তোল
শুদ্ধতম চৈতন্যের গানে।
চেয়ে ছাখো অদ্ভুত পন্নগ ঘোরে
মানুষের অন্তিমে ও দূরে
চোখের সুনীলে বিষ ঢেলে দেবে বলে
ফেরে খল, ধূর্ত আর বিট.
প্রকৃতি বধির বলে মানুষের আর্তি-স্বর তার
যায় না শ্রবণে।
এত যে মিনতি করি, এত যে প্রণাম রাখি
সুর-দেবতার পদমূলে
তবুও গর্জনকারী পর্জন্য আবার
ধ্বংসই ঘোষণা করে
হায় চৈত্য গাছে জাগবে না মঞ্জরী?
রুদ্ধ বুঝি হয়ে যাবে চিরঞ্জীব মানুষের স্বর?

যাজ্ঞবল্ক্য। স্থচিরহাসিনী, কোন দিন রুদ্ধ হবে নাকো
এই চিরঞ্জীব মানুষের স্বর।
দীপ্যমান তপোবনে ফের শুরু হবে সামগান।
যজ্ঞের সমিধ আনো ঋষি-বালকেরা।
মানুষের দুঃখ মোচনের হোমে
নিজেকে আহুতি দেব আজ।
চেয়ে ছাখো ওই পূর্বাশায়
অমৃত কলস কাঁখে হাস্তমুখে
আলোর বধুরা।
হে ব্রহ্মবাদিনী, উচ্চারণ করো ঋক্,
বলো—

(যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী দ্বৈত কণ্ঠে)
শৃনন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা···

(নেপথ্য থেকে সমবেত কণ্ঠে)
আমরা পার হয়ে এসেছি হিম যুগ প্রলয়বাণ
আমরা বাস করে এসেছি গুহাঘরে প্রস্তকাল
আমরা নদীচরে বেঁধেছি চালাঘর মুক্তভয়
আমরা দ্বীপে দ্বীপে আমরা জঙ্গলে রক্তবীজ
আমরা বশ করি প্রবল বাইসন কৃপণ মাঠ
শস্যে ভরে তুলি আমরা গড়ে তুলি নগর গ্রাম
আমরা মরণের ভস্ম মেখে জাগি নতুন প্রাণ।

আত্মকথা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

অনুলিখন : দীপা মুখোপাধ্যায়

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৬২ সালে। চৌরঙ্গী নির্বাচন কেন্দ্র থেকে তখন তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের নেতার নির্দেশে সেখানে কাজ করছি, বিশেষ করে উর্দু ও ইংরেজি ভাষাভাষী অঞ্চলে। এমন সময়ে একদিন বিশ্বনাথদা এলেন নির্বাচনী অফিসে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। হাফ হাতা শাদা শার্ট ও ধুতি পরনে। একটা খাটিয়ার ওপর বসে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের একটা আধো অন্ধকার ঘরে আমাদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বললেন। প্রথম পরিচয়েই কেমন আপনজন বলে মনে হল।

তারপর বিবাহসূত্রে আমি তমলুকেরই হয়ে যাই। তখনও তাঁর বাড়িতে বহুবার গেছি। যতবার গেছি তাঁর বাল্য কৈশোর সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলতেন যা শুনে আমার মনে হত এ এক অন্য মানুষ। আমি রাজনীতির লোক নই। কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমার একটা শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক গড়ে উঠল। ১৯৮৩-তে আমি ওঁকে বললুম যে ওঁর এইসব না জানা অধ্যায় আমি লিখতে চাই। কয়েক মাসের অনুরোধ উপরোধে শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। আমার কাছে যা কিছু তিনি বলেছিলেন তাই এখানে লিখলাম। বিশ্বনাথদার জন্মকাল (১৯১৫) থেকে শুরু করে ১৯৩৪-এ কলকাতায় আসা পর্যন্ত কালপর্ব এই আত্মকথার অন্তর্গত।

দীপা মুখোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

১৯১৫ সালের ১৭ এপ্রিল মেদিনীপুর জেলার তমলুকে আমার জন্ম। আমার বাবার নাম শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। মা ছিলেন ইন্দুমতী দেবী। আমাদের আদি বাস ছিল বালী উত্তরপাড়ায়। সেখান থেকে আমার বাবা তমলুকে আসেন। আমার মেজ দাদামশাই কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় তমলুকে ওকালতি করতেন। আমার বাবাও আইনজীবী ছিলেন। মেজ দাদামশাই আমার বাবাকে তমলুকে নিয়ে যান ঐখানে প্র্যাক্টিস করার জন্য। সেখানে খুব তাড়াতাড়ি বাবা ভাল পশার জমান—তাই পরে আর

তমলুক ছেড়ে চলে যাবার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। ছ ভাই, তিন বোনের মধ্যে আমি সবচেয়ে ছোট ছিলাম।

তমলুকের হ্যামিলটন স্কুল তখন আমাদের জেলার মধ্যে নামকরা স্কুল। 'নিমকির সাহেব' হ্যামিলটন প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল তখন বিলেতের যে কোনো ভাল পাবলিক স্কুলের অনুসরণে চলত। আমার বাবা এই স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু ছেলেবেলায় তিনি আমাকে এই স্কুলে না দিয়ে বাড়ির কাছে অন্নদা পণ্ডিতমশাইয়ের পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন। বাবা কি মনে ভেবে আমাকে পাঠশালায় দিয়েছিলেন জানি না। বোধহয় এত অল্প বয়সে আমাকে স্কুলে দিতে চাননি। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন যে পাঠশালায় গিয়ে স্কুল সম্বন্ধে ভীতি ভাঙিয়ে নেওয়া ঠিক হবে। একটু-আধটু অঙ্ক, বাংলা শেখা যাবে, আর সবচেয়ে বড় কথা, সারাদিন আটক থাকা যাবে। কিন্তু আমি আর পাঁচটা ছেলের মতই শয়তান ছিলাম। সুযোগ বুঝে কখনোও পণ্ডিত-মশাইকে বলে, কখনো না বলে পাঠশালা থেকে পালাতাম। তারপর মাঠে-মাঠে ঘুরতাম, লোকের বাগানে ঢুকে ফল চুরি করতাম। আম গাছে ঢিল মেরে আম পাড়ার চেষ্টা করতাম। পণ্ডিতমশাই মাঝে মাঝে বকতেন, এমনকি বাবাকে বলে দেবেন বলে শাসাতেন। কিন্তু কখনো মারেননি বা বাবাকে বলেও দেননি।

আমার এই সব অভিযানের সঙ্গী ছিল আমার ভাইপো দেবব্রত। সে আমার চেয়ে দেড় বছরের ছোট ছিল। সেই শিশুকাল থেকেই আমাদের খুব বন্ধুতা। বাবা বেরিয়ে গেলে সে আমাকে ইশারা করে বাইরে থেকে জানাতো। আমিও কোনো না কোনো অজুহাতে ঠিক পাঠশালা থেকে পালিয়ে যেতাম। একদিন পুকুরের ধারের একটা কুলগাছ থেকে আমরা কুল পাড়ছি। হঠাৎ কুল কুড়োতে গিয়ে পিছলে দেবব্রত ঝুপ করে পুকুরের মধ্যে পড়ে গেল। চ্যাঁচামেচি করে লোক জড়ো করলাম। সে সাঁতার জানে না। জলে ডুবে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাকে তোলা হল। বাবা নিজে একটা বিরাট দা নিয়ে গাছটা কাটতে লেগে গেলেন। এরপর তিনি অন্নদা পণ্ডিতমশায়ের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে আমাকে নিয়ে ভর্তি করলেন হ্যামিলটন স্কুলে।

হ্যামিলটন স্কুলের হেডমাষ্টার মশাই ছিলেন শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী। তাঁদের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। অকালে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। তখন নানা ভাবে আমার বাবা এঁদের পরিবারকে দেখাশোনা করেছিলেন। তাঁর মা আমার বাবাকে "বাবা" বলে ডাকতেন। সেই সুবাদে

শ্রুতিনাথবাবু আমার বাবাকে দাদামশাই বলতেন। বাবা যখন আমাকে স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে গেলেন, তখন শ্রুতিনাথবাবুর ভাগ্নে সুনীতি ভট্টাচার্যও ভর্তি হয়েছে সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসে—শ্রুতিনাথবাবু আমাকেও সেভেন্‌থ্‌ ক্লাসে ভর্তি করতে চাইলেন। দুজনে তাহলে একসঙ্গে পড়াশোনা করব এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু আমার বাবা আমাকে একেবারে গোড়া অর্থাৎ এইট্‌থ্‌ ক্লাস থেকে ভর্তি করতে চাইলেন। এখনকার হিসাবে ক্লাস থ্রি। অতএব সেই এইট্‌থ্‌ ক্লাস থেকে আমি হ্যামিলটন স্কুলে ভর্তি হলাম।

এইট্‌থ্‌ ক্লাসে পড়ার সময় আমার দুজন সহপাঠী ছিল যাদের দুটি বিশেষ কারণে আমার আজও মনে আছে। তাদের নাম অবশ্য আজ আর মনে নেই। একজন ছিল পূর্ববাংলার ছেলে। তাই তার কথাবার্তা যেন কেমন শুনতে লাগত তখন আমার কানে। বিশেষত যেখানেই 'শ' বলতে হোত, সেখানেই সে 'ছ' বলত। যেমন পশ্চিমের বদলে 'পচ্ছিম'। তার সেই সব উচ্চারণ শুনে এক এক সময় হেসে আমরা কুটোপাটি হতাম। আর একজন, ক্লাসে মাষ্টারমশাই পড়া জিজ্ঞাসা করলেই বলত 'মনে পড়ে গেছে।' কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পড়া বলত না। মাষ্টারমশাই যত বলতেন, 'মনে পড়ে গেছে তো বলে ফেল,' সে ততই গোঁ ধরে এক কথা বলে যেত, 'বলছি তো মনে পড়ে গেছে!' আমরা সবাই অবাক। মনে পড়ে গেছে অথচ পড়া বলছে না, একি ছেলেরে বাবা! কিছুদিন পরে আবিষ্কার করা গেল যে 'মনে পড়ে গেছে' বলতে ও বোঝায় মন থেকে পড়ে গেছে অর্থাৎ ওর মনে নেই, ও ভুলে গেছে।

শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী একজন দক্ষ পরিচালক ছিলেন। তাঁর পরিচালনায় হ্যামিলটন স্কুল সর্ব বিষয়ে তুঙ্গে। তিনি এমনকি স্কুলের বাইরেও যেন চারচোখ মেলে তাঁর ছেলেদের ওপর কড়া নজর রাখতেন। ফর্শা রং, রাশভারী চেহারা, একমুখ দাড়ি গোঁফ—ছেলেরা ঠাট্টা করে আড়ালে তাঁকে 'ভীমরুলের চাক' বলে ডাকত।

আমাদের অঙ্কের মাষ্টারমশাই ছিলেন অমৃত মাইতি। রূপনারায়ণ নদের ওপারে হাওড়া জেলার শ্যামপুরে তাঁর বাড়ি ছিল। বিকেলে প্রতিদিন স্কুলে নানারকম খেলাধূলো, ব্যায়াম ও জিমনাষ্টিক্‌স্‌ শেখানো হোত। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন অমৃতবাবু। আমার নিজের শরীর চর্চায় নিষ্ঠা ও ধারাবাহিকতা কম ছিল বটে কিন্তু চর্চা ছিল। 'বয়েজ স্কাউট' বৃটিশ সরকারের একটা তাঁবেদার সংস্থা ছিল। কিন্তু এতে নানা বিষয়ে যে সব অনুশীলন করানো

হোত, সেগুলো নিঃসন্দেহে খুবই ভাল ছিল। আমাদের স্কুলে 'বয়েজ স্কাউট' ছিল—আমি নিজেও ছোটবেলায় স্কাউট করেছি। স্কাউট মাষ্টার ছিলেন ঐ অমৃতবাবুই—অমৃত মাইতি। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প বসত। একবার লালগড়ে আমাদের ক্যাম্প হয়েছিল। কাঁসাই নদীর ধারে আমরা হঠাৎ একটা ফসিল আবিষ্কার করি। অবশ্য তখন যা বয়স, তাতে ফসিলের গুরুত্ব বুঝিনি ঠিক, কিন্তু ঐ ফসিল আবিষ্কারের আনন্দ আমার আর কারো চেয়ে কোন অংশে কম হয় নি।

যতদূর মনে পড়ে ১৯২৮ সালে কলকাতার ময়দানে স্কাউট জাম্বোরি হয়েছিল। আমরা সবাই জাম্বোরিতে যোগ দিতে কলকাতায় এসেছিলাম। অন্যান্য সব জায়গা থেকে, বা ভারতের বাইরে থেকে কারা কারা এসেছিল তা কিছুই আজ মনে নেই। তবে বাংলা দেশের যিনি প্রধান ছিলেন তার নাম আজও মনে আছে—ব্যারিষ্টার মিস্টার ভোঁস।

এই প্রসঙ্গে বলি, কলকাতার হাজরা রোডে আমার পিসতুতো দাদা থাকতেন। ১৯২৮ সালে যখন কলকাতায় এসেছিলাম তখন আমি তাঁর কাছে কয়েকদিন ছিলাম। কলকাতার নানা দর্শনীয় জায়গার সঙ্গে সেই প্রথম আমার পরিচয় হয়েছিল। মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে তখন কলকাতা কংগ্রেস হচ্ছিল পার্কসার্কাস ময়দানে। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। সহ-সর্বাধিনায়ক ছিলেন হেমন্ত বসু। বাড়ি থেকে, দাদার সঙ্গে না কোন অন্য অভিভাবকের সঙ্গে, নাকি কয়েকজন বন্ধু মিলে—ঠিক কিভাবে গিয়েছিলাম তা আজ সঠিক মনে নেই, কিন্তু আমরা অধিবেশন মণ্ডপ, এই উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনী, ইত্যাদি দেখতে যে পার্কসার্কাস গিয়েছিলাম তা বেশ মনে আছে। বিখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা ও বক্তা বঙ্কিম মুখার্জি তখন সেই অধিবেশনে তাঁর শ্রমিকদের দল নিয়ে মিছিল করে ঢুকছেন। তাই নিয়ে তখন চারিদিকে বেশ চাপা উত্তেজনা।

আমাদের সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই খুব বদরাগী ছিলেন। তিনি আবার আমাদের ড্রিল ক্লাস নিতেন। তাঁর হাতের আঙুলের গাঁটগুলো ঠিক লোহার মত শক্ত ছিল। আর সেই হাতের গাঁট্টা খায়নি এমন ছাত্র খুব কম ছিল। ছেলেরা ড্রিল করতে গিয়ে সামান্য এদিক ওদিক করলেই তিনি খেপে উঠতেন। তিনি 'মর্কট মর্কট' বলতে বলতে প্রচণ্ড জোরে সেই ছেলেকে মাথায় গাঁট্টা

মারতেন। আমরা দিনের পর দিন সেই গাঁট্টা, তাঁর গালাগাল সব নির্বিবাদে মেনে নিয়েছিলাম।

অন্যান্য স্কুলের মত আমাদের স্কুলেও কিছু ডাকাবুকো ছেলে ছিল, পড়াশোনায় যাদের একদম মন ছিল না। মাস্টারমশাইদের কাছে ধমক বা মার খেয়ে যারা চিরদিনের জন্য স্কুল ছেড়ে পালাত। এই রকমের একজন সম্পর্কে বলি, যদিও তাঁর নাম বলছি না। তিনি আমার চেয়ে অনেক সিনিয়র ছিলেন। দারুণ ডানপিটে ছিলেন তিনি। দোতলার জানলার গরাদ ফাঁক করে লাফ মেরে পাশের খড়ের চালায় ঝাঁপ দিয়ে স্কুল থেকে পালাতেন। একদিন ড্রিল ক্লাসে তাঁর সামান্য ভুল হওয়ায় যথারীতি পণ্ডিতমশাই খেপে উঠলেন। এগিয়ে গিয়ে 'মর্কট মর্কট' বলে ছেলেটির মাথায় খটাখট্ গাঁট্টা লাগিয়ে দিলেন। আর তিনিও তৎক্ষণাৎ 'ছর্কট-ছর্কট' বলে পণ্ডিতমশাইয়ের হাত মুচড়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। বলাই বাহুল্য তাঁর কাছে হ্যামিলটনের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। হেড মাস্টারমশাই কখনোই সেই ছেলেকে কঠোর শাস্তি না দিয়ে ছাড়তেন না। অবশ্য তিনিও আর কোনদিন ফিরে আসেননি।

আমাদের ইংরাজির মাস্টারমশাই ছিলেন ননীবাবু। খুবই ভাল পড়াতেন। স্কুলের ফাঁকা জায়গায় তাঁত বসানো হয়েছিল। সেই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তারক মাস্টারমশাই। স্কুলের বাইরে কালীবাবুর দোকান ছিল। মনিহারী দোকান। সেটা যেন স্কুলের ছাত্রদেরই দোকান ছিল। খাতা, পেন্সিল, রবার থেকে বিস্কুট, লবেনচুস্, ঘুড়ি, লাটাই, মার্বেল, সব পাওয়া যেত কালীবাবুর দোকানে।

ইস্কুলের বাঁধাধরা পথে লেখাপড়ায় আমি কখনোই খুব আগ্রহী ছিলাম না। অবশ্য পরীক্ষার ফল আমার খুব একটা খারাপ হত না। সবকিছু ঠিকঠাক চললে ১৯৩১ সালে আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার কথা। কিন্তু তা হয়নি, কারণ আমি তখন ছিলাম জেলে, ১৯৩০ সাল থেকে বেশ ভাল ভাবেই জড়িয়ে পড়ে রাজনীতির সঙ্গে। সে কথায় পরে আসব। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসি। আমার ভাইপোরা ততদিনে আই. এসসি পাস করে গেছে। পরীক্ষা দেবার ইচ্ছে নিয়ে যখন হ্যামিলটন স্কুলে গেলাম, তখন স্কুল আমাকে বসতে দিতে রাজী নয়। হেড মাস্টারমশাই, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী ততদিনে হ্যামিলটন ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন খড়্গপুরে—বি. এন. আর হাই স্কুলে। সেখানেও তিনি হেড মাস্টার। তাঁকে বাবা বললেন যে আমি পরীক্ষা দিতে চাই। তিনি তাঁর স্কুল থেকে পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। টেস্ট

পরীক্ষায় ভাল নম্বর নিয়েই পাশ করলাম। কিন্তু তারপর হল বিপদ। এতদিন বাদে আবার নতুন করে পড়াশোনা, নিজেকে বুড়ো মনে হতে লাগল। বললাম, বাচ্চাদের সঙ্গে বসে পরীক্ষা দেব না। লজ্জা করছে। কিন্তু আমার ভাইপোরা কিছুতেই ছাড়বে না। তারা জোর-জবরদস্তি আমাকে ফাইনাল পরীক্ষার জন্য আশুতোষ বিল্ডিং-এ নিয়ে গেল। জোর করে বসালো। এমন সময় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রীতিমতন দাড়ি-গোঁফওয়ালা কয়েকজন প্রাইভেট পরীক্ষার্থীকে দেখে লজ্জাটা কেটে গেল। মনে হল ওরা যদি বসতে পারে তবে আমিও পারি। যাই হোক পরীক্ষার ফল ভালই হল। প্রথম বিভাগেই পাস করেছিলাম। বাংলায় লেটার পেয়েছিলাম। ইংরাজিতেও যতদূর মনে পড়ছে ৭৮% পেয়েছিলাম।

ইণ্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য ভর্তি হলাম বিদ্যাসাগর কলেজে। আমার রাজনীতিতে যোগ দেবার কথা পরে বলব। কিন্তু এটুকু এখানে নিতান্ত বলা প্রয়োজন যে আমি ১৯৩৪ সালে পাকাপোক্ত ভাবে কলকাতায় আসি। ঐ বছরই এপ্রিল মাসে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করি। আমি এর আগেই অবশ্য মনে মনে একজন কমিউনিস্ট হয়ে গেছি।

কলকাতায় এসে উঠেছিলাম মেজদাদা শম্ভুনাথের কাছে। তিনি অত্যন্ত কড়া গার্জেন ছিলেন। কিন্তু তাতে আমাকে ক্ষান্ত করা যায়নি। প্রতিদিন বিকালে আমি এক পয়সা দিয়ে নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে হেঁটে হেঁটে পৌঁছে যেতাম ঘুস্থড়ি। সেখানে ইউনিয়ন অফিসে বসতাম এবং চটকল ও সুতাকল শ্রমিকদের ক্লাস নিতাম। আর রাতে কোন কোনোদিন কলকাতায় গ্র্যাজুয়েট ছেলেদের নিয়ে মার্কসবাদের ক্লাস নিতাম শোভাবাজারের দেবেদের বাড়ির বাড়ির বাইরের দিকে একটা ঘরে। মজার ব্যাপার ছিল যে, আমি নিজে কিন্তু তখনও ম্যাট্রিক পাসও নই, আর আমার ছাত্ররা ছিল গ্র্যাজুয়েট। তবে আমি যা পড়াতাম অর্থাৎ মার্কসবাদ, সেটার মধ্যে কিন্তু কোন ফাঁকি ছিল না। যে ঘরটার কথা বলছিলাম, সেটায় বেশ কিছু ছেলে থাকত। আমি প্রায়ই ভাবতাম এটুকু ঘরে এতজন থাকে কি করে? একদিন ওদের জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। ওরা হেসে বলল ওরা সবাই কাত হয়ে শোয়, অতএব কোন সমস্যা হয় না। আমি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না! তা না হয় হোল! কিন্তু একবারও কি পাশ ফিরতে ইচ্ছে করে না? ওরা বলল যে হয়। যখন একজনের পাশ ফিরতে ইচ্ছে করে তখন সে চেঁচিয়ে তা বলে, আর একসঙ্গে সবাই এপাশ

থেকে ওপাশ ফিরে শোয়। ওদের সেদিনের দেওয়া সেই মজার উত্তর আজও বেশ মনে আছে।

আবার ফিরে আসি কলেজের প্রসঙ্গে। ইণ্টারমিডিয়েটে তো ভর্তি হলাম। কিন্তু নিয়মিত পার্টির নানা কাজে জড়িয়ে পড়ায় কলেজ যাওয়া হয়ে গেল রীতিমত অনিয়মিত। আমার হয়ে প্রক্সি দিয়ে গিয়ে ধরা পড়ে গেল আমার বন্ধু। যাই হোক নানা তালেগোলের মধ্যে ১৯৩৭ সালে প্রথম বিভাগে আই. এ পাস করলাম। ভর্তি হলাম বি. এ ক্লাসে। ততদিনে আমার ওপর ছাত্র আন্দোলনের দায়িত্ব অনেক বেশি বর্তেছে। ওদিকে আমি বেশ পরিচিত চেহারা। অতএব কারো পক্ষে আমার হয়ে প্রক্সি দেওয়াও বিপদের। শেষে পরীক্ষার আগে দেখা গেল আমার ১৩% হাজিরা অতএব পরীক্ষায় বসা যাবে না। গেলাম প্রিন্সিপ্যাল ঘোষ সাহেবের কাছে। তিনি কোন কথাই শুনতে চান না। শেষে অনেক অনুনয় বিনয় করে তাঁকে রাজী করালাম। তিনি একটা ব্যতিক্রম করলেন আমার ক্ষেত্রে। আমায় পরীক্ষায় বসতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তারপর তো আরও বিপদ। গত দুবছরে পড়ার বইয়ের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। অতএব পরীক্ষায় কি লিখব? কি পরীক্ষা দেব? এদিকে ইকনমিক্সে অনার্স ছিল আর ছিল স্পেশাল বাংলা। তখন ঠিক করলাম যে কটা দিন বাকি আছে পড়াশোনা করব। কিন্তু কলকাতায় থাকলে তা হবে না।

বিশিষ্ট উকিল শশধর গাঙ্গুলীর ছেলে নিতাই ছিল আমার সহপাঠী। তার সঙ্গে চলে গেলাম পুরুলিয়ায় তাদের বাড়িতে। সেখানে নিরিবিলিতে পড়াশোনা করা যাবে। সেখানে নিতাই-এর মা আমাদের দেখাশোনা করতেন, খাওয়াতেন। আমরা দুজনে মোটা মোটা সব বই দেদার পড়ে ফেললাম। অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছিলাম। পরীক্ষা এসে গেছে। আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। এই সময় হঠাৎ একদিন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে রমেন ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে তো আমাদের কথায় হেসেই আকুল। বললে পরীক্ষার আগে ঐভাবে পড়ে কোন লাভ হয় না। সে আমাদের মেড্ ই'জি-র, সন্ধান দিল। মনটা আবার হতাশায় ভরে উঠল। কি হবে তাহলে?

যা হোক—পরীক্ষার সিট পড়ল সেনেটে, গেলাম। প্রশ্নপত্র আসতে লাগল, কিন্তু প্রতিটি পেপারে ছটা প্রশ্নের মধ্যে তিনটে, সাড়ে তিনটে বড় জোর চারটে প্রশ্নের উত্তরের বেশি কিছু লিখতে পারিনি। এত কথা বলার

ছিল, যে সময় কুলোয় না। একথা শুনে সবার স্থির বিশ্বাস হল, আমি এ যাত্রায় পাশ করতে পারব না। আমার নিজের মনেও সকলের কথায় সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যথাসময় পরীক্ষার ফল বেরোল। ব্র্যাকেটে সেকেণ্ড ক্লাস লাস্ট হলাম প্রশান্ত সান্যাল এবং আরও একজনের সঙ্গে যার নাম আমার আজ আর মনে নেই। প্রশান্ত ছিল আমার সহকর্মী ও স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্রনেতা। সে পরবর্তী জীবনে ক্যারিয়ন কোম্পানির কর্ণধার হয়েছিল।

১৯৩৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম এম এ. পড়ার জন্য। ১৯৩৯ সালেই সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধল। ১৯৪০ সালে আমার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরোল। আমি তখন গা ঢাকা দিলাম। ১৯৪২ সালে এই পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয়। কিন্তু আমার আর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা চালাবার সুযোগ হয়নি। কারণ ততদিনে আমি পুরোপুরি ভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িয়ে গেছি।

॥ ২ ॥

আমার বাবা এবং মা দুজনকেই আজও বেশ ভাল ভাবে মনে পড়ে। যদিও আমার মা-ই আমার সব কাজে কর্মে সেই ছোটবেলা থেকেই আমাকে উৎসাহ দিতেন। বাবা ছিলেন তমলুক মিডল স্কুল, হাই স্কুল, গার্লস স্কুল ও তমলুক ব্যাঙ্কের সেক্রেটারি এবং তমলুক মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। আমার মেজদাদা ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন সিভিলিয়ান অফিসার। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমাদের বাড়িতে আমার দাদারা অনেকেই কিশোর বয়স থেকে সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। আমার ঠিক ওপরের দাদা সোমনাথ মুখোপাধ্যায় একসময় অনুশীলন পার্টির সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন। ছোড়দা অজয় মুখোপাধ্যায় গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস সি. পড়ছেন। ছাত্র হিসেবেও তিনি খুব ভাল ছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর ডাক তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তাই পড়াশোনা বন্ধ রেখে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। বলাই বাহুল্য, আমাকে এসব কিছু উদ্দীপ্ত করত।

১৯২৯ সাল থেকে আমি রাজনীতিতে যোগ দিই। প্রথম দিকে আমার বাবা এ সম্বন্ধে কিছু জানতেন না। রাজনীতি বলতে যা বোঝায় তখনো

পর্যন্ত সে অর্থে কিছু করিনি। বয়সও তো কম ছিল। ময়নার রামেন্দু দাস, আমি এবং আরো কজনায় মিলে একটা লাইব্রেরি করেছিলাম। তাতে অনেক ভাল ভাল বই সংগ্রহ হয়েছিল। শরৎ বাবুর 'পথের দাবী' বই তখন নিষিদ্ধ ছিল। এইরকম কোন সময় ওই বইটি প্রথম পড়েছিলাম। খুব ভাল লেগেছিল। এছাড়া আমাদের লাঠিখেলা, ছুরিখেলা—এ সবে খুব রুচি ছিল। মনে পড়ে, যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের খবর এলো তখন আমাদের সে কি উত্তেজনা হয়েছিল!

১৯৩০ সালে কংগ্রেসের আন্দোলন জোরদার হল। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার দাবিতে সমস্ত দেশ তখন উত্তাল। মেদিনীপুরের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, এই জেলায় কৃষক ও মধ্যবিত্ত যুবকেরা পাশাপাশি এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। সমস্ত যুব সমাজ যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। একদিকে যেমন চৌকিদারী ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ হল, আইন অমান্য চলতে লাগল, অন্যদিকে প্যাডি, ডগলাস, বার্জ প্রভৃতি ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট খুন হতে লাগল পরপর। তার ফলে বাড়ি বাড়ি তল্লাসী ও অবর্ণনীয় অত্যাচার চলতে লাগল আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার নামে। আমাদের জেলার ময়না অঞ্চল একটু নিচু জায়গা। জল ছপছপিয়ে ভোর বেলার মধ্যে পুলিস গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলত। চলত বাড়ি বাড়ি তল্লাসি ও প্রহার। বিভিন্ন জায়গায় এমনকি ঘরে ঢুকে মশারি তুলে কোন কংগ্রেসীকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে কিনা তাও দেখত ওরা।

কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রতিটি জেলায় বা মহকুমা শহরে আনুষ্ঠানিক ভাবে সংগঠনের দায়িত্বে কেউ না কেউ ছিলেন। যেমন আমাদের ওখানে ছিলেন উকিল মন্মথ দাস। কিন্তু স্বাধীনতার স্পৃহা তখন এমন জ্বলন্ত হয়ে উঠেছে যে জনতাই বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের নেতা ঠিক করে নিচ্ছে। কাঁথিতে নিকুঞ্জ মাইতি, প্রমথ ব্যানার্জি; তমলুকে সতীশ সামন্ত ও ছোড়দা (অজয় মুখোঃ) ছিলেন অবিসম্বাদী নেতা। সমস্ত জেলাব্যাপী যেন একটা গণ আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল। ইতিমধ্যে ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতের 'ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস' চাই এই দাবি তোলা হয়েছে। এরপর জহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে শপথ গ্রহণ করা হল।

তমলুকে আজ যেখানে দেবব্রত ভৌমিকদের বাড়ি, সেখানে আগে ছিল নারকোল বাগান। সেই বাগানে আমরাও সবাই সমবেত হলাম শপথ গ্রহণ

করতে। ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে আমরা সমবেত কণ্ঠে শপথ বাক্য পাঠ করলাম সেই নারকোল বাগানে দাঁড়িয়ে। আমাদের সাব ডিভিশনে তখন আট-দশটা স্কুল ছিল। সেগুলোতে ধর্মঘট করা হবে ঠিক হল। কোন স্কুল খোলা থাকলে চলবে না। তখনতো যাতায়াতের সুবিধা আজকের মত ছিল না। মনে আছে পায়ে হেঁটে সূতাহাটা, নন্দীগ্রাম, কোলাঘাট, রঘুনাথবাড়ি—এই সব জায়গায় ঘুরেছিলাম। স্কুল কেন বন্ধ রাখতে চাইছি আমরা, তা সকলকে বোঝাতে হত। গ্রামাঞ্চলের থেকে শহরেই মুশকিলল বেশী ছিল। সেখানে পিকেটিং করতেই হত। কিন্তু এই ভাবেও আমরা লাগাতার ছমাস ধর্মঘট জারি রাখতে পেরেছিলাম। বাবা মাঝে মাঝে বিপন্ন বোধ করতেন, কিন্তু তিনি কোনদিন আমাকে স্বদেশী করতে নিষেধ করেননি।

মহাত্মাজীর ডান্তি অভিযানের ঢেউ লাগল আমাদের জেলায়। মনে আছে সেদিনের কথা। আমার ছোড়দা অজয় মুখোপাধ্যায় এবং সতীশ সামন্তের নেতৃত্বে সকলে গিয়েছিল নরঘাটে "নুন মারা" আন্দোলনে যোগ দিতে। সকলের সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম। সেখানে কুখ্যাত প্যাডি সাহেবের নেতৃত্বে পুলিস সত্যাগ্রহীদের ওপর সেদিন বেধড়ক লাঠি চালিয়ে ছিল। ছোড়দা, সতীশদা গ্রেপ্তার হলেন—গ্রেপ্তার হলেন আরো অনেকে। আমিও খুব বেশি নয়, কিন্তু দু-চার ঘা লাঠি খেয়েছিলাম। আমার তখন বয়স ছিল পনেরো বছর।

১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেস গোল টেবিল বৈঠক বয়কট করল। এই ঘটনায় গোটা দেশ জুড়ে বিক্ষোভ জানান হল কালো পতাকা প্রদর্শন করে। আমরাও বিক্ষোভ করব ঠিক হল। তমলুকে সত্যাগ্রহীদের শিবির ছিল সতীশ চক্রবর্তীদের বাড়ির উল্টো দিকে একটা মাটির ঘরে। সমস্ত জেলায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। গাড়োয়ালি এবং পাঠান সশস্ত্র পুলিস গোটা শহরে টহলদারি করছে। আমরা দুজন একজন করে ভীমা মায়ের মন্দিরের চাতালে জড়ো হলাম। তারপর হঠাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে, কালো পতাকা নিয়ে, শোভাযাত্রা করে বেরোলাম। এই প্রসঙ্গে বলা উচিৎ যে ওই একই সময় তরুণ কৃষকেরাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। ব্যবত্তার হাট ও আশপাশের বহু গ্রাম থেকে ওই দিন তারাও মিছিল করে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। কোর্টের কাছ দিয়ে যাবার ইচ্ছে ছিল আমাদের, কিন্তু ভঞ্জদের বাড়ির পাশ দিয়ে, রামসাগরের ধার দিয়ে পুলিস আমাদের ঘিরে ফেলল। তারপর প্রহার। পতাকা ছাড়তে হবে। আমরা পতাকা ছাড়ছি না।

তখন মাটির ওপর ফেলে, খোয়ার ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল। তবুও পতাকা ছাড়িনি। তখন কুড়ি পঁচিশজনকে ওরা গ্রেপ্তার করল। আমিও গ্রেপ্তার হলাম। থানায় যখন নিয়ে যাচ্ছে তখন পেছন ফিরে দেখি আমার তিনজন ভাইপো—সত্যব্রত, দেবব্রত ও সুব্রত।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, দারোগা তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার বাবা এসেছেন। দেখেই তো বুক শুকিয়ে গেল। বাবা কি আমায় ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন? না। বাবা এসেছেন তাঁর তিনটি বালক নাতিকে নিয়ে যেতে। দারোগা সঙ্গে সঙ্গে তাদের ছেড়ে দিতে রাজি। কিন্তু মুশকিল হল তাদের নিয়ে। তারা কিছুতেই বাড়ি যাবে না। শেষে আমিই অনেকটা জোর করে ওদের বাবার সঙ্গে বাড়ি পাঠালাম। আমাকে নিয়ে গেল ইরিগেশন বাংলোতে।

তখন সেকালে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করতেন সত্যাগ্রহীদের। যে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট সেদিন আমাদের বিচার করেছিলেন, তাঁর নাম আজ মনে পড়ছে না। অবশ্য বিচারের কোন ব্যাপারই ছিল না। চোখ বুজে ছ'মাসের জেল দিলেন। তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদী—কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড। চালান হয়ে গেলাম মেদিনীপুর সেনট্রাল জেলে।

সেই সময় সমস্ত বাংলাদেশে পাঁচটি সেনট্রাল জেল ছিল; আলিপুর, ঢাকা, রাজশাহী, মেদিনীপুর এবং প্রেসিডেন্সি সেনট্রাল। এছাড়া বেশ কিছু স্পেশাল জেল এবং অ্যাডিশনাল স্পেশাল জেল করা হয়েছিল। হিজলীতে এমন একটি স্পেশাল জেল ও একটি অ্যাডিশনাল স্পেশাল জেল ছিল। এই হিজলী স্পেশাল জেলেই পুলিসের গুলিতে বেশ কিছু রাজবন্দী মারা গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় মনুমেণ্ট ময়দানে বিশাল জন-সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সমস্ত দেশের ক্ষোভ যেন রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে সেদিন মূর্ত হয়েছিল। শহীদ স্মরণে তিনি লিখলেন তাঁর বিখ্যাত "প্রশ্ন" কবিতা।

মেদিনীপুর জেলার সুপারিন্টেন্‌ডেণ্ট ছিল অনুপ সিংহ নামে এক পাঞ্জাবি। এখন তো শহর বাড়তে বাড়তে জেলের কাছে চলে এসেছে। তখন কিন্তু শহর থেকে জেল প্রায় মাইল দুই তিনেক দূরে ছিল। আমরা যাবার কয়েকদিন আগে সেখানেও একদিন প্রচণ্ড মার দেওয়া হয়েছিল বন্দীদের। তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী। যার বেশীর ভাগই ছিলেন কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনে বন্দী। এঁদের মধ্যে আবার

বেশির ভাগ ছিলেন কৃষকদের বাড়ির ছেলে। হঠাৎ পাগলা ঘণ্টি বাজিয়ে দেওয়া হল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি ঢুকল তার দলবল নিয়ে। তারপর অমানুষিক মার দেওয়া হল বন্দীদের। সেদিন বন্দীদের কাতর আর্তনাদ অতদূরে শহরে গিয়ে পৌঁছেছিল।

আমাদের নিয়ে গেল, পোশাক ছাড়িয়ে ডোরা-কাটা কয়েদিদের পোশাক পরতে দিল। তখন কয়েদিরা যেসব জামাকাপড় কম্বল ইত্যাদি পেত তা সবই কয়েদিদেরই তৈরি। হয়তো ঢাকার তৈরি কম্বল এলো মেদিনীপুরে, মেদিনীপুরের তৈরি কাপড় গেল ঢাকায়—এই রকম। তবে কয়েদিরা কোন মজুরি পেত না এর জন্য। কয়েদিদের কাজের মধ্যে বাগান করা, পশুপালন করা থেকে রান্না করা, পরিবেশন করা, ধোপা-নাপিতের কাজ থেকে ঘর সাফ্, পায়খানা সাফ্, এমনকি সাহেবের বাড়ির চাকরের কাজ করা তক্ সব করতে হত বিনা মজুরিতে। কাজ করাতো মেট্। তারা নিজেরাও ছিল কয়েদি। তারা সকলকে শাসনে রাখতো। এবং তার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কিছু সুবিধা পেত ওরা।

জামাকাপড় ছাড়িয়ে আমাদের নিয়ে গেল গুমটিতে অর্থাৎ সেনট্রাল টাওয়ার-এ। গুমটির নিচের কম্পাউণ্ডে নতুন কয়েদিদের তালিম হত। সুপার জেলার, ডেপুটি জেলার এমনকি চিফ ওয়ার্ডেনকে দেখলে-'সরকার সেলাম' বলতে হবে—এটাই ছিল আমাদের প্রথম দিনের শিক্ষার বিষয়। আমরা আপত্তি করলাম। তখন আমাদের আচ্ছা করে মার দিয়ে নিয়ে গিয়ে ওয়ার্ডে ভরে দিল। পরে সেখান থেকে আমাকে দমদমে অ্যাডিশনাল স্পেশাল জেলে চালান করেছিল। ১৯৩১ সালের ৫ মার্চ গান্ধী-আরউইন চুক্তির ভিত্তিতে কংগ্রেসের আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল। আমরাও ছাড়া পেলাম। ওদিকে এই চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও শুকদেব, রাজগুরু ও ভগত্ সিংয়ের ফাঁসি হয়ে গেল ২৩ মার্চ তারিখে।

১৯৩১ সালে করাচি কংগ্রেসে প্রতিনিধি হয়ে যোগ দিয়েছিলাম। বয়স খুব কম ছিল বটে কিন্তু তাতে প্রতিনিধি হওয়া আটকায়নি। এটা ছিল আমার জীবনের মস্ত বড় একটা অভিজ্ঞতা। তমলুকের সব প্রতিনিধিরা দল বেঁধে ট্রেনে চেপে করাচি যাচ্ছি। কানপুর স্টেশনে শুনলাম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে। সেই দাঙ্গা থামাতে গিয়ে গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী মারা গেছেন। কানপুর থেকে দিল্লি হয়ে আমরা অমৃতসরে পৌঁছলাম। অমৃতসরে স্বর্ণ মন্দির দেখে আমরা জালিয়ানওয়ালাবাগে গিয়েছিলাম। জালিয়ানওয়ালাবাগ তখন

আমাদের কাছে ছিল তীর্থস্থান। সেখানে গিয়ে চারধার ঘুরে ঘুরে দেখছি। ইংরেজের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন চারধারের দেয়ালে বিদ্যমান। বুকের মধ্যে অদ্ভুত একটা অনুভূতি। সেই সময় সেখানে একটা ছোট ঘটনা ঘটল। একদল যুবক-যুবতী, সংখ্যায় বেশি নয়, মিছিল করে স্লোগান দিতে দিতে সেইখানে ঢুকল। তারা বলছিল "গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট মুর্দাবাদ", "নওজোয়ানোকো ক্যা মিলা—ভগৎ সিংকা ফাঁসি মিলা"। মনটা প্রচণ্ড দুলে উঠেছিল, কারণ আমরা করাচি যাচ্ছিলাম গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে সমর্থন করার জন্য। সেখান থেকে আমরা লাহোরে গিয়েছিলাম। দর্শনীয় যা কিছু সব দেখে আমরা ট্রেনে চেপে করাচি অভিমুখে রওনা হলাম।

কংগ্রেসের শেষে করাচি থেকে জাহাজে চেপে প্রথমে গেলাম বেড় দ্বারকায়। সেখান থেকে ট্রেনে চেপে দ্বারকা। তারপর বরোদা, আমেদাবাদ, সাবরমতি করে গুজরাটের অনেক জায়গা ঘুরে দেখলাম। কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে উত্তর ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করব এমন একটা ইচ্ছে অবশ্য আমাদের মনে গোড়া থেকেই ছিল। ছোড়দাকে আমাদের দলপতি ঠিক করা হয়েছিল। যাতায়াতের খরচ আমরা সবাই চাঁদা করে দিয়েছিলাম। আমি আমার পৈতে উপলক্ষে যে টাকা পেয়েছিলাম তার থেকে একশো টাকা চাঁদা দিয়েছিলাম। অনেকে আশি টাকা চাঁদাও দিয়েছিল।

পৈতে উপলক্ষে আরও যে টাকা পেয়েছিলাম তাই দিয়ে একটা সাইকেল কিনেছিলাম। এই সাইকেলটার জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার কষ্ট খুব লাঘব হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৪ সালে যখন কলকাতায় এলাম তখন সাইকেলটাকেও সঙ্গে এনেছিলাম। এখানেও ওটা আমার কম কাজে লাগেনি। ১৯৩৫ সালে ধর্মতলা স্ট্রিটে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা লোককে বাঁচাতে গিয়ে, গিয়ে পড়লাম একটা ট্রামের সামনে। ট্রামটা ঘাড়ের ওপর এসে গেছে। ড্রাইভার প্রাণপণে চেন ঘুরিয়ে ট্রাম থামাবার চেষ্টা করছে আর চিৎকার করে আমায় গাল দিচ্ছে। কোনরকমে একটা প্রচণ্ড লাফ মেরে গিয়ে পড়লাম রাস্তার ধারে। আর তক্ষুণি ট্রামটা হুড়মুড় করে এসে পড়ে সাইকেলটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল। সাইকেলটা তো গেলই—এর ওপর ঝামেলায় জড়াতে চাই না বলে ওখান থেকে একরকম দৌড়ে, অলিগলি দিয়ে দর্জিপাড়ার বাড়িতে হাজির হয়েছিলাম। তখন দর্জিপাড়ায় থাকতাম।

এত অল্প টাকা রসদ হিসাবে কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় ঘুরেছিলাম, অনেক কিছু দেখেছিলাম। একে সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, বাকি সব কৃতিত্বই

ছিল ছোড়দার। তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ, ধর্মশালায় থাকা, নিজেরা রেঁধে খাওয়া, মাল বওয়া—রীতিমত কৃচ্ছ্রসাধন, একটুও এদিক ওদিক হবার নয়। ছোড়দা প্রচণ্ড কৃপণের মত টাকা পয়সা মজুদ করত খরচের জন্য। গুজরাট সেরে আমরা গিয়েছিলাম রাজস্থানে। সেখানে জয়পুর, উদয়পুর, চিতোর, আজমির ইত্যাদি দেখে আমরা দিল্লি, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, সারনাথ, গয়া, বুদ্ধগয়া হয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। তখন ছোট ছিলাম। এত অল্প পয়সায় এত জায়গায় ঘোরা যে প্রায় অসম্ভব তা বুঝিনি। মনে হোত ছোড়দার কঠিন শাসনে বেড়ানোর অর্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে গেল। পরে বুঝেছিলাম যে ছোড়দা এত কঠোর ও কৃপণ ভাবে সবকিছু পরিচালনা করেছিল বলেই সেদিন এটা সম্ভব হয়েছিল।

আজকাল শরীরের জন্য সর্বদা সচেতন থাকতে হয়। খাওয়া দাওয়া ধরা-বাঁধা। ডাক্তারের পরামর্শে প্রচুর পেঁপে খাই। বেশির ভাগ সময় তা বাধ্য হয়েই খাই। কারণ বিশেষ প্রক্রিয়ায় বড় করা চেহারা এবং জাঁকিয়ে পাকানো স্বাদ—কোনটাই ভাল নয়। যথেষ্ট পাকা অথচ স্বাদহীন পেঁপে যখন খাই তখন প্রায়ই সৌরাষ্ট্রের কথা মনে পড়ে। গাড়িটা কোন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়েছে—বোধহয় জামনগর বা নওনগর। জানলা দিয়ে হঠাৎ দেখি একটা লোক স্টেশনে পেঁপে বিক্রি করছে। এক একটা পেঁপের বড় মাপের লাউয়ের মত সাইজ। এতবড় মাপের পেঁপে যে হতে পারে আমাদের তা জানা ছিল না। ছোড়দাকে বললাম 'পেঁপে খাব'। দাম এক পয়সা। ছোড়দা যথারীতি বাড়তি খাওয়ায় আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু একপয়সা দাম শুনে আর আপত্তি করল না। দুএকটা কেনা হল। টুকরো করে দেখা গেল প্রায় তিন ইঞ্চি মোটা শাঁস। তখন আমরা বুঝলাম যে অতি বাজে পেঁপে। নিশ্চয় এই পেঁপে আয়তন ও শাঁসের জন্য যতটা—স্বাদের জন্য ততটা নয়। একটু টুকরো করে মুখে দিয়ে চমকে উঠলাম সবাই। এত মিষ্টি যে পেঁপে হয় তা জানতাম না। অপূর্ব। কিন্তু হায়! ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। আর দু একটা যে কিনে নেব, তার কোন উপায় আর নেই।

তমলুকে ফিরে এসে স্থানীয় নেতা ও কর্মীদের নিয়ে একটা মিটিং হল। আলোচ্য বিষয় ছিল ভবিষ্যত কর্মপন্থা। আমরা এখন কি করব? আমরা কি স্কুলে ফিরে যাব? বাড়ি ফিরে যাব? দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক তো ব্যর্থ হবেই। তখন তো আবার আন্দোলন শুরু হবে। আমরা কি আন্দোলনের ডাক পেয়ে তখন আসব? না এখন থেকেই তার প্রস্তুতি নেব? সুশীল ধাড়া

আমার থেকে এক ক্লাস উঁচুতে পড়তেন। তিনি তখন আই-এ পড়ছেন। সুশীলদা বললেন, আমাদের এখন ফিরে যাওয়াই ঠিক হবে। সেখানে এখন পড়াশোনা করি। তারপর যখন ডাক আসবে আবার তখন সবাই এসে আন্দোলনে যোগ দেব। আমার কিন্তু ব্যাপারটা মনোমত হল না। আমি বললাম, তা না করে গ্রামে গ্রামে সংগঠনের কাজ জোরদার করাই ঠিক হবে। সুশীলদা ও অন্য সকলে অবশ্য আমার কথাই ঠিক বলে মেনে নিলেন। আমরা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে গেলাম ভবিষ্যতের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হল। ১৯৩২ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজী দেশে ফিরে এলেন। বম্বেতে পা দিয়েই গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। একই সঙ্গে সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রায় আশি হাজার লোক গ্রেপ্তার হল। অনেকেই অবশ্য গ্রেপ্তার এড়িয়ে গোপনে সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। গ্রামে থাকায় আমাদের অনেককেই পুলিশ ধরতে পারল না। আমরাও যতদূর সম্ভব পুলিশকে এড়িয়ে চলতাম। তা সত্ত্বেও একদিন কাঁকটার কাছে, বল্লুকের হাটে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। দফাদার আমায় ধরে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠাল বড়বাবুর কাছে—নিকটবর্তী পুলিশ ক্যাম্পে। দেখতে দেখতে কয়েক শো লোক জমে গেল সেখানে। পুলিশ তখনো আসেনি। হঠাৎ কয়েকজন লোক এগিয়ে এসে আমায় সজোরে ধাক্কা মারল। সেই ধাক্কায় আমি বেশ কয়েক হাত দূরে ছিটকে পড়লাম। তখন সবাই মিলে ঘিরে ধরল দফাদারকে। আমার আর দফাদারের মধ্যে তখন বেশ কিছু লোক। আমি দেখলাম এই সুযোগ, আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে দৌড় লাগালাম। হাট পেরিয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে, শরবন পার হয়ে ডোঙায় চেপে পালিয়ে গেলাম।

কংগ্রেস আন্দোলন এবং পাশাপাশি চলতে থাকা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, এই দুইয়ে কেমন একটা ভাঁটা পড়ে ১৯৩২ সাল থেকেই। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুই স্তিমিত ধারা আমাকে কিছুদিন ধরে আর তৃপ্ত করতে পারছিল না। অথচ খুব অল্প বয়েস থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলাম। আমাদের বাড়িতে এমনকি আমার জেলাতেও আন্দোলনের পক্ষে ছিল অনুকূল আবহাওয়া। কিন্তু তবুও ১৯৩২-এর মাঝামাঝি থেকে আমার মনে একটা জিজ্ঞাসা জাগে। তা হল, 'পথ কি ? এই দুই পথের কোনটাকেই আমার দেশের ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট ও উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছিল না। কংগ্রেসের আন্দোলনের পেছনে ছিল জনগণ। কিন্তু ঐ আন্দোলনের কোন

বিপ্লবী চরিত্র ছিল না। এদিকে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ছিল বিপ্লবী চরিত্র কিন্তু তার সঙ্গে ছিল না আপামর জনতার কোন আত্মীয়তা। তাই আমার মনে হল এই তুটোর মধ্যেই যেন কোথায় একটা ফাঁকি আছে। আন্দোলন করছি। সংগঠনের কাজে জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত প্রদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এবং যত দেখছি, প্রশ্নটা ততই প্রকট হচ্ছে। কিন্তু পথ কি ?

পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য যখন গা ঢাকা দিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালাচ্ছি, তখন বিশেষ একটি গ্রাম ছিল আমার প্রধান ঘাঁটি। যে সব কৃষকেরা দিনের পর দিন আমাকে বা আমার মত আরো অনেককে লুকিয়ে রেখেছে, খেতে দিয়েছে, দিয়েছে মাথার ওপর ছাদ, তাদের সঙ্গে জমিদারের বিরোধ বাধল। কিন্তু জমিদারের প্রচ্ছন্ন অন্যায় থাকা সত্ত্বেও নেতারা কৃষকদের পাশে এসে দাঁড়ালেন না। তাঁরা বললেন জমিদার বা কৃষক, এদের কারো সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই। এরা তুজনেই আমাদের দেশবাসী। আমাদের লড়াই ইংরেজের সঙ্গে। অতএব এই তুচ্ছ ব্যাপারে এখন কোন পক্ষ নেওয়া যাবে না। মেটিয়াবুরুজে সুতেকলে শ্রমিকরা ধর্মঘট করল, কিন্তু নেতারা মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। যুক্তি ঐ একই। শ্রমিকও আমাদের দেশবাসী, মালিকও আমাদের দেশবাসী। ওদের কারো পক্ষে বা বিপক্ষে আমরা নই। আমাদের শত্রু ইংরেজ। তাকে তাড়াতে হবে সেটাই প্রথম কাজ। আমার কাছে এই সব যুক্তি ধোঁয়াটে লাগল। একদিকে স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনের তাগিদ, অন্যদিকে আন্দোলনের সঠিক পথ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা আমাকে যেন পাগল করে দিতে লাগল। এমন সময় দীর্ঘকাল পরে মনে পড়ল রামকৃষ্ণ মিশনের কথা।

তমলুকে রামকৃষ্ণ মিশনের বড় আশ্রম ছিল। এখনো আছে। আমার বাবা ও মা তুজনেই ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তাই পারিবারিক প্রভাবে ছোট বেলায় এই আশ্রমে বহুবার গেছি। আশ্রমের মহারাজরা খুব স্নেহ করতেন আমায়। মনে আছে ছেলেবেলায় পুজোর জন্য ফুল তোলা, সন্ধ্যা আরতির সময় উপস্থিত হওয়া, মহারাজদের জন্য বা কোন উৎসব উপলক্ষে মুষ্টি ভিক্ষা করা—এসবই করেছি।

ঠাকুরের শিষ্য মহাপুরুষ মহারাজ তখন জীবিত। বেলুড় মঠে এসে তাঁকে বললাম দীক্ষা নিতে চাই। কারণ আমার মনে হল এতেই বুঝি শান্তি পাব। দীক্ষা নিলাম তাঁর কাছে। আজকের রামকৃষ্ণ মিশনের বহু বড় বড় সাধু মহারাজরা আমার গুরু ভাই। কিছুদিন জপ-তপও করলাম। কিন্তু শান্তি

পেলাম না। অনতিবিলম্বে রামকৃষ্ণ মিশনের বিশেষ লোকজনের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব মনটাকে জিজ্ঞাসু করে তুলল। মানুষের মুক্তির পথ কি—এই প্রশ্ন আমাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। এই সময় আবার যখন গ্রামে গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তখন নানা পত্র পত্রিকার মাধ্যমে কম্যুনিজম-এর সন্ধান পেলাম। মনে হল এতদিন ঠিক এরই প্রতীক্ষায় ছিলাম। শান্তি পেলাম। সেই তখন থেকে এটাই আমার ধর্ম হল। ১৯৩৩ সালে আবার গ্রেপ্তার হলাম তমলুক শহরে।

১৯৩৪ সালে তমলুক ছেড়ে চলে আসি কলকাতায়। তারপর আবার ৫১/৫২ সাল নাগাদ তমলুক যাই। একটানা এতগুলো বছর আমার তমলুকের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু রাজনীতি বা রাজনীতির বাইরে এমন বহুলোকের সংস্পর্শে এসেছি যাদের কথা আমার আজও মনে পড়ে। তাঁদের মধ্যে অনেকে আমার ভবিষ্যত জীবনে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে ছিলেন আবার অনেককে নিছকই মনে আছে।

দুর্গারামবাবু আমার শিশুকালেই বেশ বুড়ো মানুষ ছিলেন। তার মেয়ে সরোজিনীকে আমরা সজুমা বলতাম। তিনি ছিলেন উকিল বসন্ত সরকারের স্ত্রী। তাঁদের ছেলে ডঃ পুলিন সরকার খুব বিখ্যাত হয়েছিলেন। দুর্গারাম-বাবুকে সবাই দাদু বলতাম। ইনি আমাদের 'কানমলা' দিতেন। দুই কানের পাশ দিয়ে দুই হাত দিয়ে এমন একটা সুড়সুড়ি দেওয়ার মত করতেন যে ভারি মজা হত। আমরা ছোটরা দুর্গারাম দাদুর কাছে কানমলা খেতে প্রায়ই যেতাম।

গিরিজা অধিকারী ছিলেন ভীমারি মন্দিরের সবচেয়ে বড় অংশের অংশীদার। প্রফুল্ল চ্যাটার্জি, ভীম বসু, ডাঃ ভূতনাথ অধিকারী প্রভৃতির কথা মনে আছে। মনে পড়ে শ্রীনাথ দাস, বঙ্কিম ভৌমিককে। এঁরা দুজনেই জাতীয়তাবাদী ছিলেন এবং পেশায় ছিলেন উকিল। মহেন্দ্র মাইতিও ছিলেন উকিল। তিনি ছোড়দার মস্ত বড় সমার্থক ছিলেন। তিনি আমাদের সাব ডিভিসনে কংগ্রেস কমিটির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর স্মরণে কংগ্রেস অফিসের নামকরণ করা হয় মহেন্দ্রভবন।

মনে পড়ে চণ্ডীবাবুকে—চণ্ডীচরণ দত্ত। তিনিও বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় সেই যে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন, আর কখনও পরে তিনি ফিরে যাননি।

ক্ষীরোদ মাইতি খুব ধনী কৃষক পরিবারের ছেলে ছিলেন। কলকাতায়

গিয়ে এম. এ. ল পাস করে ফিরে এসে তিনি ব্যাবত্তা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। তিনি প্রচণ্ড স্বদেশী মনোভাবাপন্ন মানুষ ছিলেন। ১৯৩০ সালে নারকোলদার হাটে প্যাডি সাহেব একবার হাটের বহু ব্যবসায়ীর দোকান তছনছ করে দেয়। একথা কানে যেতে ক্ষীরোদদা প্রচণ্ড ক্ষেপে গেলেন। ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে সেইসব ব্যবসায়ীদের হয়ে লড়ে যেতে লাগলেন। বিরাট বিরাট ক্রিমিনাল 'ল-এর বই নিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন এই ঘটনাকে। তাঁর নানান ধরনের বই পড়ার দারুণ শখ ছিল। ইতিহাস, পুরাণ থেকে শুরু করে সব রকমের বইএর একটা ছোটখাট সংগ্রহশালা ছিল তাঁর বাড়িতে। 'Moscow has a plan' – এই বই আমি তার কাছে প্রথম পড়ি। স্তালিন-এর 'on Leninism' বইটিও ওঁর কাছে প্রথম পড়ি। উনি চিরদিনই অত্যন্ত উদারমনা ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে কখনও কংগ্রেস না করলেও ক্ষীরোদদা প্রচ্ছন্নভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। উনি পরে অবশ্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন।

কুমোর ভৌমিক ছিলেন ক্ষীরোদদার প্রচ্ছন্ন বন্ধু। অসাধারণ বক্তা ছিলেন এই কুমোর ভৌমিক। আরও একজন সম্বন্ধে আমার স্মৃতি খুবই অদ্ভুত—শৈলেন্দ্রনাথ মুখার্জি'। সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন দিকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল শৈলেনদার তিনি পেশায় ছিলেন শিক্ষক। তাঁর গান বা বাজনা শোনার সৌভাগ্য আমার অনেক বারই হয়েছে। তবে ছোটবেলার যে স্মৃতি আমার আজও মনে আছে তা হল তাঁর যন্ত্র বাজানো। চোখ বুজে ভাবে বিভোর হয়ে তিনি একটা যন্ত্র বাজাচ্ছেন। ঝমঝম করে একটা অপূর্ব আওয়াজ বার হচ্ছে, আর সমবেত সকলে মুগ্ধ-হয়ে তা শুনছে—আমিও। তাঁর কথা মনে হলে আমি সেই ঝমঝম করে বাজা সুর আজও কানে শুনি। পরে জেনেছিলাম, ওটা তিনি সেতার বাজাতেন।

এরপর বলতে হয় অনুদার কথা, চন্দননগরের আনন্দ পাল। তিনি কংগ্রেসী সাজা বিপ্লবী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর পুরোন বন্ধুদের যোগাযোগ ছিল—বিশেষ করে 'হুগলী-বর্ধমান গ্রুপ' নামে যাঁরা পরিচিত ছিলেন। অর্থাৎ পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, বিজয় মোদক, বিনয় চৌধুরী, শাহেদুল্লাহ্‌ সাহেব ইত্যাদি। এঁদের অনেকেই তখন আন্দামানে, কেউ কেউ জেলে, আবার কেউবা আত্মগোপন করে আছে। এহেন অনুদার সঙ্গে আমার খুব যোগাযোগ হয়ে গিয়েছিল এবং অনুদা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তিনিই উত্তরপাড়ার স্বতীশ ব্যানার্জি ওরফে মাণিকদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন।

অনুদার মুখে আমার নাম শুনে এবং আমি কমিউনিজম নিয়ে পড়াশোনা করছি জেনে মাণিকদা আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইলেন। তিনি আমায় ডেকে পাঠালেন। আমি গেলাম।

মাণিকদার সঙ্গে আমার সেই প্রথম সাক্ষাতের কথা আজও দিব্য মনে আছে। যতদুর মনে পড়ছে, জায়গাটা ছিল অনুদার এলাকার থারুই গ্রাম। আমার খালি পা, হাঁটু পর্যন্ত তুলে পরা খদ্দরের কাপড়, খদ্দরের ফতুয়া, হাতে তেলমাখানো মোটা বাঁশের একটা লাঠি কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ আর সেই ব্যাগে ইংরেজি থেকে বাংলা অভিধানসহ একটা 'ক্যাপিটাল'। ঐ বইটা পড়া তখন আমার একটা নেশার মত দাঁড়িয়ে গেছে। সদা-সর্বদা সেটি আমার সঙ্গী। ইংরেজি ভাষায় তখন এমন দখল ছিল না যে প্রতিটি কথার অর্থ বুঝে গড়গড়িয়ে 'ক্যাপিটাল' পড়ে ফেলতে পারি এবং বুঝি। তাই অভিধান। তাতে এই উপকারটা হল যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে 'ক্যাপিটাল' পড়া হয়ে গেল। আগেই জানিয়েছি ১৯৩৪ সালে কলকাতায় এসে মাঝে মধ্যে মার্কসবাদের ক্লাস নিতে হয়েছিল। এও জানিয়েছি যে আমার ছাত্ররা প্রায় সবাই গ্র্যাজুয়েট ছিল। অথচ আমি তখন ম্যাট্রিক পাশও ছিলাম না। আমার এই সময়কার পড়াশোনা পরবর্তীকালে আমাকে খুব সাহায্য করেছিল। প্রথম পরিচয়ের সময় মাণিকদা 'What is to be done' এবং 'One step forward two steps back'—এই বই দুটি আমাকে দিয়েছিলেন। মাণিকদার সঙ্গে যোগাযোগ হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে খুবই লাভজনক হয়েছিল। ওঁর কাছে আমি শুধু আলাপ আলোচনায় লাভবান হয়েছিলাম তা নয়, অজস্র বই পড়ার সুযোগও পেয়েছিলাম। তার মধ্যে 'Imprecor'—আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পত্রিকা। এই পত্রিকা তখন ভারতে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু চোরাপথে কিছু আসতই। এই পত্রিকা প্রায় নিয়মিতভাবে আমি মাণিকদার কাছে গিয়ে পড়তাম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আন্দোলনের অগ্রগতি, জার্মানিতে হিটলারের উত্থান ও কমিউনিষ্টদের নিধন, ইতালিতে মুসোলিনি ইতিমধ্যেই ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে—জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উন্মেষ, অন্যদিকে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নির্লজ্জ নীরবতা ও গোপন আঁতাত—এসব কিছুর বিষয়ে নিয়মিতভাবে খবর পাওয়া যেত Imprecor-এর মাধ্যমে। মাণিকদা ওরফে স্মৃতীশ ব্যানার্জী ১৯৪৬ সালে কলকাতার পার্কসার্কাসে দাঙ্গার সময় শান্তিরক্ষা করতে গিয়ে ছুরিকাহত হয়ে মারা যান। তাঁর মর্মর মূর্তি বালী আর উত্তরপাড়ার মাঝে বালী খালের পুলের সামনে আজও বিরাজমান।

১৯৩৩ সালে মাকে দেখতে এসে গ্রেপ্তার হলাম তমলুকে। প্রথম মাস-খানেক ছিলাম তমলুক সাব জেলে। আগে কয়েদীদের লোহার বাসনপত্র দেওয়ার নিয়ম ছিল। যতীন দাসের অনশনে ও মৃত্যুর পর কয়েদিদের এ্যালুমিনিয়ামের বাসন দেওয়া হত। কিন্তু তমলুক সাব জেলে তখনও লোহার বাসনই ছিল। এখানে চোর, ডাকাত, গাঁটকাটাদের সঙ্গে আমি বিচারাধীন আসামী। সেও ছিল এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা, এরা সবাই আমাকে বেশ সম্মান করত এবং এদের নানা সমস্যা আমার সামনে তুলে ধরত। তার কারণ আমি চুরি বা ডাকাতি করে জেলে যাইনি। আমি ছিলাম রাজনৈতিক বন্দী। আমিও বন্ধুভাবে এদের সকলের সাথে মিশতাম এবং সমস্যাগুলোকে বুদ্ধি দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করতাম।

একদিন একটা ছিঁচকে চোর এল। সে ছিল গুলিখোর। সে জেলে এসেই বায়না ধরল যে আফিং খাবে। জেল কর্তৃপক্ষ তাকে আফিং খেতে দেবে না, সেও না খেয়ে থাকতে পারবে না। শেষে সে অনশন শুরু করল। সব শুনে আমিও তাকে বুঝিয়ে বাঝিয়ে খাওয়াবার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বৃথা। তার এক কথা—তাকে গুলি খাবার অনুমতি দিতে হবে নাহলে সে অনশন করে প্রাণত্যাগ করবে। ঐ সময় একজন দাগী পকেটমারও ঐ জেলে ছিল। লোকটি প্রায়ই আমার কাছে ঘুরঘুর করত। দুদিন পরে সে হঠাৎ আমার কাছে এসে বলল, 'আমি ওকে আফিং এনে দিতে পারি, আপনি যদি ওকে দেন।' এই জেলের মধ্যে লোকটা কোথা থেকে আফিং যোগাড় করবে! ওদিকে সেই চোরটা দুদিন ধরে সত্যি কিছু খাচ্ছে না—অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যদি তাকে আফিং খাওয়ানো যায় তার প্রাণ বাঁচে। আবার জেনে শুনে গোপনে তার হাতে নেশার জিনিস তুলে দেব? আর তাছাড়া এই লোকটি বা কিভাবে কোথা থেকে পাবে! যাইহোক ব্যাপার কতদূর গড়ায় জানার জন্য রাজি হলাম। কিছুক্ষণ পর সেই পকেটমার মাস কড়াই এর মত দেখতে কালো একটা চিটচিটে গুলি এনে দিল আমার হাতে। আমি অনেকক্ষণ নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে সেইটি নিয়ে গিয়ে ওই চোরকে দিলাম। তখন ওই গুলিটা আমার হাতে দেখে চোরটার মুখের যা অবস্থা হল তা বর্ণনা করা আমার অসাধ্য। যুগপৎ আনন্দ, অবিশ্বাস, কৃতজ্ঞতা মিশিয়ে সে এক অপূর্ব চিত্র। লোভীর মত সে ওটা আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ মুখে পুরে দিল। তারপর সে অনশন ভঙ্গ করে খাবার দাবার স্বাভাবিক ভাবে খেল।

জেলময় উত্তেজনা। জেলার পর্যন্ত আমায় জিজ্ঞেস করল কি কায়দায় আমি তাকে বশ করলাম। সবকিছু শান্ত হলে আমি পকেটমারের কাছে গিয়ে জানতে চাইলাম যে সে কোথায় আফিং পেল। সে আমায় যা বলল তা শুনে আমি তাজ্জব। গুলি-টুলি কিছু নয়। আমাদের জানলার গরাদে কদিন আগে যে আলকাতরা লেপে দিয়ে গেছে ও নাকি তারই খানিকটা খুঁটে গুলি বানিয়েছে। চোরটা সরল বিশ্বাসে ওই গুলি খেয়েছে আর নেশা করেছে ভেবেছে। একটা দাগী পকেটমার মস্ত বড় একজন মনোবিজ্ঞানীর মত এক লহমায় একটা সমস্যার সমাধান করে দিল। এই ঘটনা আমাকে অত্যন্ত আশ্চর্য করে দিয়েছিল। পরে ওই চোরের কি হয়েছিল জানি না। কারণ এরপর আমায় তিন মাসের জন্য চালান করে দিয়েছিল হিজলী জেলে। মাঝে হিজলী যাবার পথে একদিনের জন্য আমায় মেদিনীপুর জেলে রেখেছিল। আগেই জানিয়েছি স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের আটক রাখার জন্য স্পেশাল জেল এবং অ্যাডিশনাল স্পেশাল জেল তৈরি করা হয়েছিল দেশের বিভিন্ন অংশে। হিজলী জেল ছিল এরকমই একটি অ্যাডিশনাল স্পেশাল জেল। চাঁচের দেয়াল, খড়ের চাল, সিমেন্টের মেঝে এবং মোটা মোটা শাল বল্লার খুঁটি।

এদিকে আমি যে কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকেছি একথা চারিদিকে বেশ চাউর হয়ে গেছে। তমলুক সাব জেল থেকে হিজলী জেলে যাবার পথে মাত্র একটি রাত আমায় রেখেছিল মেদিনীপুর জেলে। সেখানে বিপ্লববাদী বন্দীরা ছিলেন। তারা তো আমায় রীতিমত এড়িয়ে গেলেন। শুধুমাত্র কথাবার্তা বলল পাখি নামে আমার এক বন্ধু। অনেক আগে ছেলেবেলায় মেদিনীপুরে মেজদাদার বাড়িতে থাকাকালীন তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। সে গ্রেপ্তার হয়েছিল বার্জ হত্যার সন্দেহে।

হিজলী জেলে তখন কংগ্রেসী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই ছিলেন। আবার অনেক বিপ্লববাদী বন্দীও ছিলেন। কংগ্রেসী আন্দোলনের অনেক কর্মীরই তখন আস্তে আস্তে মোহভঙ্গ হচ্ছে। সুরেশ ব্যানার্জি, দেবেন সেন প্রভৃতি অনেকেই তখন সমাজবাদের ক্লাস নিতেন জেলে। দেবেন সেন ট্রটস্কি পড়াতেন। অন্যদিকে জেলে যেসব কংগ্রেসী নেতারা ছিলেন তাঁরাও নিয়মিত সত্যাগ্রহীদের পড়াশোনা করাতে লাগলেন। রামায়ণ-মহাভারত থেকে দেশের অতীত ইতিহাস, গান্ধীবাদ ইত্যাদি সবই আলোচনা হত। এই সময়ে জেলে ২১ বছরের থেকে কম বয়সী ছেলেদের নিয়ে একদিন মিল বনাম চরকা শীর্ষক একটি বিতর্কের আয়োজন করা হল। মিলের স্বপক্ষে বলার জন্য একমাত্র

আমি বক্তা ছিলাম। বাকি সব বক্তাই ছিল চরকার স্বপক্ষে। দুই-একজনের বলার পর আমার বলার পালা এল। সেদিন কি কি বলেছিলাম তা তো আজ মনে রাখা সম্ভব নয়। প্রাণপণে মিলের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে যন্ত্রের কোন দোষ নেই। মানুষই তাকে অপব্যবহার করে। এদিকে মালিকের ভূমিকা তুলে ধরে সাধারণ শ্রমিক কিভাবে শোষিত হচ্ছে, সে কথাও বলেছিলাম। শুধু মনে আছে যে আমার বলা শেষ হবার পর সবাই আমার পক্ষে এসে গেল এবং চরকার সপক্ষে তখন আর কোনো বক্তা দাঁড়াল না। কিছুক্ষণ পরে বাইরে গেছি জল খেতে। তখন একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার দিকে এগিয়ে এসে পরিচিত হলেন এবং আমাকে ভাল বলার জন্য অভিনন্দিত করলেন। তাঁর নাম নৃপেন চক্রবর্তী। তিনি ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। নৃপেনবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ওই হিজলী জেলে ১৯৩৩ সালে।

হিজলী জেলে থাকবার সময় আমার মনে হতে লাগল এ অর্থহীন। বাইরে যেতে হবে। কত কাজ সামনে। তার মধ্যে প্রধান হল জোট বাঁধা, ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে কতজনা—তাদের এক করা, নতুন ভাবনায় ভাবিয়ে তোলা—কিন্তু জেলে থাকলে তা হবে না। বাবাকে ডেকে বললাম আমার হয়ে জামিন নিতে। তিনি তো শুনে তাজ্জব। কারণ তখন কংগ্রেসীরা জামিন নিত না। বাবাকে জানালাম আমি লেখাপড়া করতে চাই। তিনি আপিল করলেন। আমার জামিন মঞ্জুর হল না। হিজলী জেলে তিনমাস থাকার পর ছাড়া পেলাম। ছাড়া পেয়ে হেঁটে বাড়ি এসেছিলাম মনে আছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার মধ্যে একটা উন্মাদনা ছিল। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে বুঝতে পারলাম যে দেশের অবস্থা কী সঙ্গীন। সমস্ত স্তরের নেতারা জেলে বন্দী। বৃটিশ সরকারের অত্যাচারে সারা দেশ আতঙ্কিত। কারো সঙ্গে কারো যোগাযোগ নেই। মানুষের মানসিক স্থৈর্য হারিয়েছে। আমি তমলুক পৌছবার পরই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বাবাকে ডেকে বললেন আমায় অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে। ঐ সময় কাউকে বিশেষ আমার বয়সী ছেলেদের কোন বিশ্বাস নেই। সামান্য ছুতোয় গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক করা হবে। ১৯৩৪ সালের ১ জানুয়ারি মেজদাদার সঙ্গে কলকাতায় চলে এলাম।

কলকাতায় এসে মাণিকদার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হল। কমরেড লাহিড়ী ও হালিম সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ হল। ওঁরা তখন জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের ৪১ নং বাড়িতে থাকতেন। ওয়াই. এম. সি. এ.-র পাশ দিয়ে শর্টকাট

করে জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে যেতাম। ঐটাই ছিল আমার নিয়মিত 'রুট'। একদিন ঐভাবে যাচ্ছি, তখন একজন গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহী সুদর্শন ভদ্রলোক চোখে পড়লেন। পায়ে পায়ে চলে দেখি, তিনিও জ্যাকেরিয়া স্ট্রিটের বাড়িতেই এসেছেন। তিনি ছিলেন সৌম্যেন ঠাকুর। তার 'Hitlarism in Europe' বইটি ছাপা হবে। মনে আছে প্রথম পরিচয়ের সময় কমরেড লাহিড়ী আমার কাছে সেই কারণে পাঁচ টাকা চাঁদা চেয়েছিলেন।

ঐ বছর অর্থাৎ ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে আমি কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করি।

সমাজতন্ত্রের সংকট

রঞ্জন ধর

'পরিচয়'-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান পরিস্থিতির পটভূমিকায় প্রকাশিত তিনটি প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ। এই প্রবন্ধগুলির লেখকদের মতামতের মধ্যে মিল যেমন আছে, তেমনি অমিলও অনেক। এটাই স্বাভাবিক, কারণ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ঘটনাবলী, বিশেষ করে পূর্বতন সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিপর্যয় এমনই জটিল ও দুর্বোধ্য যে, এত দূরে থেকে যথেষ্ট প্রামাণিক তথ্যাদির অভাবে সকলের পক্ষে একমত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। তথাপি যতটা সম্ভব প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এই বিপর্যয়ের কারণ অনুধাবনের জন্য বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা ও বিতর্কের প্রয়োজন রয়েছে। সমাজ-তন্ত্রের বর্তমান সংকটের কারণ নির্ধারণের ওপর শুধু সেইসব দেশের নয়, সারা বিশ্বে সমাজতন্ত্রের ও ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধশক্তির পক্ষ থেকে জোর প্রচার চলছে—এটি একটি অবাস্তব ও কল্পনাভিত্তিক মতবাদ। সত্যিই কি তাই? নভেম্বর বিপ্লবের পর রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দেশের মানুষের জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য ও অগ্রগতি তো অবাস্তব ঘটনা নয়, তেমনি চুয়াত্তর বছরের মাথায় তার বিপর্যয় ও বিলুপ্তির ঘটনাও এক নির্মম বাস্তব সত্য।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত বলেছেন, 'বিপ্লব, প্রতিবিপ্লব—এ সব কিছুরই গর্ভাধান হল ইতিহাস আর সে ইতিহাসকে সৃষ্টি করে মানুষ।' তাঁর মতে বিপ্লবের প্রতি রুশ দেশের মানুষের প্রবল আসক্তিই চুয়াত্তর বছর আগে বিপ্লবকে সফল করেছিল। আবার—'এ কথাটাও একই সঙ্গে সত্য যে সমাজতন্ত্রের নামে সেখানে পরবর্তীকালে যে ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তার প্রতি গভীর অনাসক্তিই বর্তমান প্রতিবিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।' যদি ধরে নেওয়া যায়, যা ঘটেছে সেটা প্রতিবিপ্লব, তবে এ-ও না মেনে উপায় নেই যে তাকে প্রতিরোধ করতে সোভিয়েতের মানুষ বিপুল সংখ্যায় এগিয়ে আসে নি, বরং প্রতিবিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি তাদের নীরব সমর্থনই প্রকট হয়ে উঠেছিল। এমন কি, কমিউনিস্ট পার্টির প্রায় দুই কোটি সদস্যের বিপুল অংশও ছিল ঘটনাবলীর

নীরব সাক্ষী, লাল ফৌজ ছিল নিরপেক্ষ দর্শক। এই নির্লিপ্ততা বা বিপ্লব-বিমুখতা কেমন করে সম্ভব হলো? এ সম্পর্কে যথেষ্ট বিশ্লেষণ শোভনবাবুর প্রবন্ধে নেই। সৌরীন ভট্টাচার্যও তত্ত্বগত আলোচনায় বিষয়টাকে ধোঁয়াটে করে রেখেছেন। তবুও তাঁদের আলোচনায় একটা বিষয় মোটামুটি বোঝা যায় যে, সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের যে মডেল চলে আসছিল তা প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক আদর্শ অনুসরণ করেনি। শোভনলালবাবু এ-ও বলেছেন, সমাজতন্ত্রের গণভিত্তিকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য লেনিনের দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে রূপায়িত হয়নি এবং রুশ জনগণের কাছে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি ছিল প্রায় অজ্ঞাত ও অপরিচিত। বিপ্লব-পরবর্তী সময়ে বা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে এই অবস্থা মেনে নিলেও স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষ একে মেনে নিতে পারে না। এবং এর ফলেই প্রচলিত মডেল বা তাঁর ভাষায় 'স্তালিনবাদী মডেলের সংকট দেখা দেয়, অর্থাৎ স্তালিনবাদী কেন্দ্রিকতা তথা সোভিয়েত কমিউনিস্ট প্রশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক বিপ্লবের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রশ্নটি নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়,' এবং এই 'পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাই প্রতিবিপ্লবী শক্তি যখন মাথা তোলে তখন সমাজতন্ত্রের সপক্ষে সংগঠিত হয় না কোন গণপ্রতিরোধ।'

প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে পার্টি, লালফৌজ বা জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ যে গড়ে ওঠেনি, এটা বাস্তব ও নির্মম সত্য। কিন্তু কেন প্রতিরোধ গড়ে ওঠেনি? আমরা কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকে যা করা উচিত ছিল বলে ভাবছি, ওরা তা ভাবেনি কেন? ওরাই তো নিজেদের শ্রম ও ত্যাগ দ্বারা সেই সমাজতন্ত্র গড়ে তুলেছিল। অতএব মেনে নিতে হবে, সাময়িকভাবে হলেও সোভিয়েতে প্রচলিত সমাজতন্ত্রের মডেলটির প্রতি ওরা আনুগত্য হারিয়েছিল। এই আনুগত্যহীনতার কারণ খুঁজতে গিয়ে অবশ্যই তত্ত্ব ও কর্ম উভয় দিকের বিচার-বিশ্লেষণ দরকার। সৌরীনবাবু এ প্রসঙ্গে বিপর্যয়ের একটি মূল কারণ হিসেবে 'কর্মতত্ত্বৈক্যের' অভাবের উল্লেখ করেছেন—'বস্তুত সে সমাজতন্ত্রে সমাজতন্ত্রের মৌল শর্তই সব রক্ষা পাচ্ছিল কিনা এ নিয়ে প্রশ্ন তো বিভিন্ন মহলে অনেক দিন থেকেই ধ্বনিত হচ্ছিল। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পার্থক্য, সমাজতন্ত্রের সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক, স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের প্রশ্ন এ-সব তো আজ কিছু নতুন নয়।' আজ এই প্রশ্নগুলিকে কোনভাবে কোনো যুক্তিতেই ছোট করে দেখা ঠিক হবে না। সমাজতন্ত্রের

মৌল শর্তের সঙ্গে কি গণতন্ত্র, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা মৌল মানবাধিকারের সংঘাত অনিবার্য? সমাজতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের দমনমূলক চরিত্রের পরিবর্তন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের যে-কথা লেনিনীয় তত্ত্বে রয়েছে, তা চুয়াত্তর বছরের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ও সমাজে কেন প্রতিফলিত হলো না? যে হারে জাতি-দাঙ্গা ও ধর্মীয় দাঙ্গা সেখানে ঘটে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে তাতে এ-ও বিশ্বাস করতে হয় যে জাতি-সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান সেখানে হয়নি। গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা ঘোষিত হবার আগে পর্যন্ত একটা কঠোর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যে, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌল মানবাধিকার হারিয়ে কে জি. বি-র সদা জাগ্রত নজরের মধ্যে, যে সন্ত্রস্ত জীবন সোভিয়েতের মানুষকে যাপন করতে হতো, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রের মৌল আদর্শের কোনো সামঞ্জস্য আছে কি? এরকম ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সমাজতন্ত্রের নামে সোভিয়েতে যে-মডেল প্রচলিত ছিল, তার বিরুদ্ধে সেখানকার সর্বস্তরের মানুষের মনে ক্রমান্বয়ে যে-ক্ষোভ ও ঘৃণা সঞ্চিত হচ্ছিল এবং প্রতিবাদ ও প্রতিকারের স্বাভাবিক পথ বা অধিকার না থাকার দরুন তা শেষের দিকে কিছু পরিমাণে গ্লাসনস্তের মুক্ত পরিবেশে যেভাবে বিস্ফোরিত হয়েছে অন্ধভাবে, তার ফল দাঁড়াল আত্মঘাতী পরিণতিতে।

স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, সোভিয়েতের মানুষের পক্ষে এই আত্মঘাতী পথ বেছে নেওয়া ছাড়া 'পরিবর্তন' আনার আর কি কোনো পথ খোলা ছিল না? সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতার পাশাপাশি সাফল্যের পরিমাণ তো কম ছিল না! এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, সামগ্রিকভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের বিরুদ্ধে কিন্তু সেখানকার মানুষ বিদ্রোহ করেনি. যদিও ভাসাভাসা ভাবে 'বাজার অর্থনীতি', 'ভোগ্যপণ্যের অভাব' ইত্যাদি উল্লিখিত হয়েছে বারবার। কিন্তু 'বাজার অর্থনীতি'র চেহারাটা কেমন হবে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমান্তরালে তা কেমন করে চলবে তার সংজ্ঞা কেউ দেয়নি। তবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির গভীর সংকট কাটিয়ে ওঠার একটা উপায় হিসেবেই 'বাজার অর্থনীতি'র কথা আলোচিত হচ্ছিল মাত্র। এ-ও মনে রাখা দরকার, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট হঠাৎ দেখা দেয়নি! স্বয়ং স্টালিনের আমল থেকেই এর সূত্রপাত, ধীরে ধীরে তা আয়তনে ও জটিলতায় বর্তমানের কলেবর প্রাপ্ত হয়েছে। সমাধানের পথ হিসেবে রাশিয়াতে যেমন কিছু কিছু অর্থনীতিবিদ আংশিক 'বাজার অর্থনীতি' প্রবর্তনের কথা ভাবছিলেন, চীনেও তাই ভাবা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যেও এই নিয়ে বিতর্ক চলছে বলে সাম্প্রতিক

খবরে প্রকাশ। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। কোনো বাঁধা তত্ত্বের সঙ্গে কোনো কর্ম না মিললে চেঁচিয়ে ওঠার আর এক নাম অন্ধতা। মনে রাখা দরকার, উৎপাদন ব্যবস্থা, আর্থসামাজিক অবস্থা, চাহিদার ধরন, টেকনোলজির প্রয়োগ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় লেনদেন ইত্যাদি স্থাণু নয়, বরং আজকের দিনে দ্রুত পরিবর্তনশীল। অতএব, পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে কর্মপ্রকল্পের পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয় তত্ত্বকে কর্মপ্রকল্পের উপযোগী করে তোলার। সৌরীনবাবু ঠিকই বলেছেন, 'কর্মপ্রকল্পের প্রতিটি পদক্ষেপে তত্ত্বচিন্তারও বিকাশ ঘটছে। তত্ত্বচিন্তার একটা মুখ থাকছে সেটা কর্মলগ্ন, আর কর্মসূচীও ক্রমাগত হয়ে উঠছে খোলা আকাশে বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে নিতে। এই নিত্যবিকাশমান প্রক্রিয়াটা চলছে।' মার্কসবাদের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য বলেই একে সৃজনশীল বিজ্ঞান বলে মানা হয়। এমন হওয়া খুব অস্বাভাবিক নয় যে, কোনো ক্ষেত্রে কোনো কর্মপ্রকল্প তথা তত্ত্ব ব্যর্থ প্রমাণিত হয়ে অনেক মূল্য আদায় করে নিল। অর্থনীতি বা সমাজনীতি কেন, বিজ্ঞানের যে কোনো শাখার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সত্য বা প্রমাণ আবিষ্কারের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাফল্য বা ব্যর্থতা আসতেই পারে। স্টালিনের ভুলভ্রান্তি নিয়ে তো কম আলোচনা হয়নি দেশে বিদেশে। তেমনি গর্বাচভের ভুলভ্রান্তি নিয়েও আলোচনা-সমালোচনা হওয়াইস্বাভাবিক। তবে সব আলোচনাই হওয়াদরকার বস্তু-নিষ্ঠতার সঙ্গে, সঠিক পরিপ্রেক্ষিতটি বিবেচনার মধ্যে এনে। এ বিষয়ে কিন্তু শুধু রাশিয়া নয়, কোনো দেশের কমিউনিস্টরাই (যেহেতু তারা রুশপদ্ধতির অনুগামী) ইতিহাসের প্রতি সুবিচার করতে অভ্যস্ত নয়। তা যদি হতো তবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস তিনবার তিন ধরনে লিখিত হবে কেন? এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। রাশিয়াতে দেশদ্রোহী, পার্টি-দ্রোহী, প্রতিবিপ্লবী, শত্রুরাষ্ট্রের গুপ্তচর ইত্যাদি অভিযোগে অভিযুক্ত লক্ষ লক্ষ কমিউনিস্টকে বিনাবিচারে বা বিচারের প্রহসনে দণ্ডিত হয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে প্রাণ দিতে হয়েছে, বহু বছর বাদে যাদের অনেকে আবার পূর্ব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অবনী মুখার্জি ও বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টান্ত তো আমাদের সামনেই রয়েছে। সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে লেখক-শিল্পীদের স্বাধীনতা কতখানি ছিল তা-ও আজ আর তর্কের বিষয় নয়। পাস্তেরনাক বা সোলঝেনিৎসিনের লেখায় সোভিয়েত-জীবনের বাস্তবতার সামান্য চিত্রায়ণ ও সরকার বা পার্টি মেনেনিতে পারেননি, অথচ আজ স্পষ্ট হয়ে গেছে, তাঁদের চিত্রায়ণে অতিরঞ্জন বা বিকৃতি কিছুই ছিল না। সেদিন তাদের

কলমকে যেভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছিল, তেমনি দমন করা হয়েছিল অগণিত মানুষের ক্ষোভ-অভিযোগ-বেদনামথিত কণ্ঠস্বরকে। শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের সাত দশক পরেও রাষ্ট্র ও পার্টি শ্রেণীশত্রুর ভয়ে জরুরী অবস্থার কঠিন নিগড়ে বেঁধে রেখেছিল মানুষকে। মানুষের প্রতি এই অনাস্থা ও অবিশ্বাস সমাজতন্ত্রের আদর্শকে শুধু ক্ষুণ্ণ করেনি, তাদের বৈরী করে তুলেছে রাষ্ট্র ও পার্টির প্রতি। অপ্রাসঙ্গিক হলেও উল্লেখ করতে চাই, এ-দেশে স্বল্পস্থায়ী ইমার্জেন্সী চালাবার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মানুষ তাদের সেই ক্রোধপ্রকাশ করেছিল ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর পার্টিকে নির্বাচনে পরাজিত করে। আর, সোভিয়েতের মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার কাকে বলে জানে না, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তারা জরুরী অবস্থার অবমাননাকর অবস্থায় বাস করেছে, একটু খোলা হাওয়া পেয়ে তারা তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশ করবে অথবা পার্টি ও সরকার সম্পর্কে নির্লিপ্ত মনোভাব পোষণ করবে, সেটা কি অস্বাভাবিক? এখানেই পার্টি ও সরকার সোভিয়েতের মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পার্টি মানুষের চোখে মর্যাদা হারিয়েছিল আরো অনেক কারণে। পার্টি ও সরকারের নেতা, আমলাও কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতির প্রসার, আমলা-তান্ত্রিকতা, বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হওয়া, ক্ষমতার অপব্যবহার, আত্মকেন্দ্রিকতা ইত্যাদি দোষগুলো মানুষের কাছে গোপন ছিল না। আজ আমরাও বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে জানতে পারছি সে সব। এ-সবের পরি-প্রেক্ষিতেই কি শোভনলালবাবুর প্রশ্ন—'রুশ বিপ্লবের যুগান্তকারী সম্ভাবনাকে সত্যিই কি বাস্তবে সঠিকভাবে রূপায়িত করা হয়েছিল?' আজকের ঘটনা-বলীর পটভূমিকায় এটাই মুখ্য প্রশ্ন। খোলা মন নিয়ে এ প্রশ্নের জবাব খোঁজা দরকার। এবং এও সত্যি, এ প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘকাল আলোচনা ও বিতর্ক চলতে থাকবে, যেহেতু প্রশ্নটির সঙ্গে তত্ত্ব ও কর্মপ্রকল্পের অনেক বিষয় মিশে জটিল করে তুলেছে। তাছাড়া সঠিক তথ্য সংগ্রহের সমস্যাও রয়েছে। আজ তো আমরা বুঝতে পারছি, সোভিয়েতের মাধ্যমে যে-সব তথ্য আমরা এতকাল পেয়ে এসেছি এবং আমাদের নেতারা বারবার সে-দেশ ঘুরে এসে যে-সব তথ্য পরিবেশন করেছেন, বাস্তবের ঘটনাবলীর সঙ্গে সে-সবের সামান্যই মিল। আসলে নিজেদের বস্তুবাদী বা সত্যনিষ্ঠ বলে দাবি করলেও সত্য এবং বস্তু দু'টোই আমাদের নেতাদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে, অথবা ওখানকার পার্টি ও নেতারা তাঁদের যেভাবে বুঝিয়েছেন, তাই তাঁরা অন্ধভাবে মেনে নিয়েছেন, কখনো চোখ খুলে দেখতে চাননি। দেখলেও চেপে গেছেন।

বাসব সরকার তাঁর প্রবন্ধে খুব সহজেই সোভিয়েতের এই বিপর্যয়ের কারণ আবিষ্কার করে ফেলেছেন বলে মনে হলো। তাঁর মতে গর্বাচেভ ও ইয়েলৎসিন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিবিপ্লব ঘটিয়েছেন—'চলতি ব্যবস্থা উৎখাত করার কাজটি বোঝাপড়া করে তাঁরা ভাগ করে নিয়েছিলেন।' তিনি মনে করেন—'গর্বাচেভ সোভিয়েতে বিশুদ্ধ পশ্চিমী ধাঁচের বাজারি অর্থনীতি ও একান্তভাবে পশ্চিমী ধাঁচের ভোগবাদী মানসিকতা গড়ে তোলার ব্যাপক সুযোগ দিয়ে সমাজতন্ত্রের শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বনিয়াদ ভিতর থেকে ধ্বংস করার সুযোগ দিয়ে নিজেকে পশ্চিম দুনিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছিলেন।'

খুব গুরুতর অভিযোগ সন্দেহ নেই। স্পষ্টতই গর্বাচেভের ভূমিকাটা পঞ্চমবাহিনীর। এ প্রসঙ্গে মনে করা দরকার, গর্বাচেভ আজীবন কমিউনিস্ট এবং প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে পার্টির আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের মাধ্যমেই জেনারেল সেক্রেটারির পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তাঁর ধনতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার প্রতি বিশ্বাস আজীবন গোপন করে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন, এটা মেনে নেওয়া একটু কঠিন বৈকি! এখন জানা যায়, সোভিয়েতে অর্থনীতির সংকট শুরু হয়েছিল ষাটের দশক থেকেই, ক্রমে তা বাড়তে বাড়তে আশির দশকে চরম রূপ নেয়, যা এতকাল গোপন রাখা হয়েছিল বহির্বিশ্বের কাছে। আর এই গোপনীয়তা তো সোভিয়েত রাষ্ট্রব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য। গর্বাচভই প্রথম গোপনীয়তা ত্যাগ করে সোভিয়েত মানুষের সামনে এই সংকটের কথা ঘোষণা করেছিলেন। সংকটের যে চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন তার বিস্তৃত আলোচনায় যেতে চাই না। বাসববাবু বলেছেন—'স্তালিনীয় মডেল, হুকুমী ব্যবস্থা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলন সংগঠিত করে গর্বাচেভ-নেতৃত্ব সাধারণ মানুষদের থেকে কমিউনিস্টদের বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছে।' কমিউনিস্টরা গর্বাচেভের শাসন-ক্ষমতায় আসার অনেক আগে থেকেই যে সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছিল, এ বিষয়ে কি বাসববাবুর কোন সন্দেহ আছে? পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তো গর্বাচেভ ছিলেন না, সে-সব দেশে কেমন করে কমিউনিস্টরা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল? আসলে সোভিয়েতে এবং পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে জনসাধারণের চোখে কমিউনিস্টদের মর্যাদাহানির মূল কারণ মোটামুটিভাবে একই, যেহেতু সোভিয়েতের রাষ্ট্র-পরিচালনা ও পার্টি-পরিচালনার যে মডেল (তাকে যে নামই দেওয়া হোক না কেন), সেইসব

দেশেও অন্ধভাবে সেই মডেলই অনুসরণ করা হয়েছিল এবং তার প্রতিক্রিয়াও ঘটেছিল একই রকম। গর্বাচেভ প্রকাশ্যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনের সম্পূর্ণ অনুমোদনক্রমে সেই প্রচলিত মডেলের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। বাসববাবু বলেছেন, 'গর্বাচেভ তাঁর পেরেস্ত্রৈকা-প্রাসনস্তের কর্মসূচীর প্রচারপর্বে তাঁর পূর্বসূরী সোভিয়েত নেতৃত্বের কাজ সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা ছাড়া কোনো সদর্থক বিষয়ের উপর কোথাও তেমন জোর দেননি।' গর্বাচেভের মতাদর্শ ঠিক কিনা এই বিতর্কে না গিয়েও কিন্তু বলা চলে, বাসববাবুর কাছ থেকে আরো বেশি বস্তুনিষ্ঠা আশা করা যায়। গর্বাচেভ তাঁর 'পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন ভাবনা' শীর্ষক বই-এর প্রায় শুরুতেই লিখেছেন, 'মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যা সামান্য নয়, সেই গত সাত দশকে আমাদের দেশ যেপথ অতিক্রম করেছে তা বহু শতাব্দীর সমান। বিশ্বের অন্যতম শক্তি তৈরি হয়েছে পশ্চাৎপদ আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক রুশী সাম্রাজ্যের পরিবর্তে। বিপুল উৎপাদিকা শক্তি, প্রগাঢ় মনন সম্ভাবনা, অতি উন্নত সংস্কৃতি, শতাধিক জাতি ও জাতি-বৈশিষ্ট্য সমন্বিত অদ্বিতীয় এক জাতিগোষ্ঠী, এবং বিশ্বের এক ষষ্ঠাংশ এলাকা জুড়ে আঠাশ কোটি লোকের সুদৃঢ় সামাজিক নিরাপত্তা—এই হলো আমাদের মহান এবং তর্কাতীত সাফল্য। সোভিয়েত জনগণ এর জন্য যথার্থই গর্বিত।'

দেশের অর্থনৈতিক সংকট যা জাতীয় আয়ের হারকে অর্ধেকেরও নিচে নামিয়ে এনেছিল দুই দশকে, আশির দশকের গোড়ায় তা নেমে এসেছিল আরো নিচে, সৃষ্টি করেছিল প্রায় অচল অবস্থা। তাই বড় রকমের সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। জনসাধারণের ও পার্টির পূর্ণ সহযোগিতা ও কর্মোদ্যম ছাড়া কি সংস্কার বা উন্নয়ন সম্ভব? কিন্তু সংস্কারের পথে ততদিনে বাধার পাহাড় জমে উঠেছে। 'জনগণের মতাদর্শগত নৈতিক মূল্যবোধ' যেমন একদিকে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, অন্যদিকে প্রশাসনিক স্তরে দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা বাসা বাঁধছিল এবং পার্টির মধ্যেও অসৎ, স্বার্থান্বেষীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। গর্বাচেভের বক্তব্য, 'অক্টোবর বিপ্লবজাত মহৎ মূল্যবোধ আর সমাজতন্ত্রের জন্য সাহসী সংগ্রাম—এই দুই-ই যে পদদলিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে বিহ্বলতা আর বিরক্তি উৎসারিত হচ্ছিল। সমস্ত সৎ লোকই তিক্ততার সঙ্গে লক্ষ্য করছিলেন যে জনগণ সামাজিক ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে, শ্রমের আর সেই মর্যাদা নেই, লোকেরা, বিশেষত তরুণ যাঁরা যেন-তেন-প্রকারেন লাভের দিকে ছুটছেন।' এই বিবরণ আংশিক সত্য হলেও এর গুরুত্ব উপেক্ষার নয়। ব্যাধির

আক্রমণ সংক্রমিত হয়েছিল জীবনের সর্বস্তরে। এই পচন হলো দীর্ঘদিনের কুশাসনের ফল।

অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বাসববাবু তাঁর আলোচনায় এই পটভূমি উপেক্ষা করে গেছেন। সোভিয়েতে সংঘটিত প্রতিবিপ্লবের জন্য তিনি দায়ী করেছেন গর্বাচেভকে। বিপ্লব বা প্রতিবিপ্লব কি একজন ব্যক্তির দ্বারা কখনো সংঘটিত হতে পারে যদি পরিস্থিতি অনুকূল না থাকে? পরিস্থিতি বিপ্লবের অনুকূল না হলে লেনিনের মতো একজন নেতাও বিপ্লব ঘটাতে পারতেন না। গর্বাচেভ যে মতাদর্শগত সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সে তো সংকটের পরিস্থিতির মধ্যে পরিত্রাণের একটা নতুন পরীক্ষা; তাঁর পরীক্ষা সফল হয় নি, অতএব ব্যর্থতার দায় তাঁকেই বর্তায় অনেক পরিমাণে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে দায় পার্টির। এমন কি সোভিয়েতে যে-সব সমস্যা দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে তারও দায় পার্টির, যেহেতু সেখানকার সমাজতন্ত্র নির্মাণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও ন্যস্ত ছিল পার্টির ওপর। পার্টি যদি তার ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই নতুন করে ভেবে দেখার প্রয়োজন আছে তত্ত্ব ও কর্মপ্রকল্পের মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল কিনা।

একটা কথা মানতে হবে, গর্বাচভের অর্থনৈতিক কর্মসূচী ব্যর্থ হলেও সোভিয়েতবাসী গণতন্ত্রের স্বাদ পেয়েছেন তাঁরই প্রচেষ্টায়। তাদের জীবনে রয়েছে সমাজতন্ত্রের সুফলগুলির অভিজ্ঞতা, এখন তাঁরা লাভ করছেন খোলা-বাজার অর্থনীতির অভিজ্ঞতা—এই উভয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাদের পক্ষে আবার সমাজতন্ত্র বা তার কাছাকাছি কোনো 'তন্ত্র' গ্রহণ করা সম্ভব হবে, যদি গণতন্ত্র বজায় থাকে। নতুন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টরাও সুযোগ পাবেন তাঁদের অতীত ভূমিকা বা পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি সংশোধন করার। তাঁদের আবার মানুষের কাছাকাছি আসতে হবে, কেননা এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্টরা জনগণ থেকে একেবারেবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়েছে অন্য পক্ষ। জনগণকে ভুল বুঝবার অবকাশ নেই, তারা পার্টি ও সরকারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে। কী ধরনের গণতন্ত্র বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তারা চায়, সে ব্যাপারে কিন্তু তারা শেষ রায় এখনো দেয় নি। এখানে লেনিনের সেই বিখ্যাত উক্তি স্মরণীয়—'জনগণ তাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই শিক্ষা লাভ করে।' অতএব সোভিয়েতে সংঘটিত ঘটনাবলীর প্রধান বিচারক সেখানকার জনগণ, আমরা

-নই। সোভিয়েত সম্পর্কে আমাদের অনেক প্রত্যাশা ঘা খেয়েছে, এই জন্য আমরা খেদ প্রকাশ করতে পারি মাত্র।

বাসববাবু অভিযোগ করেছেন, গর্বাচেভ-ইয়েলৎসিন জোট 'সোভিয়েত-ব্যবস্থাকে নিজেদের প্রয়োজন মতো সংস্কার করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় সোভিয়েতের ভাঙ্গন সংক্রান্ত পরিকল্পনা সযত্নে চেপে রেখেছিলেন।' অর্থাৎ, জাতিগোষ্ঠী সমন্বিত সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের জন্য গর্বাচেভও দায়ী। কোনো জাতিগোষ্ঠী যদি ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় তবে তাকে জোর করে ইউনিয়নের মধ্যে রাখতে চাওয়া কি লেনিনীয় আদর্শ-সম্মত? তবু কে-না জানে, জাতিগোষ্ঠীগুলির বিপুল পরিমাণ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার মেনে নিয়েও 'ইউনিয়ন' রক্ষা করার শেষ চেষ্টা করেছিলেন গর্বাচেভ, যতক্ষণ তিনি ক্ষমতার প্রকৃত নিয়ন্ত্রক ছিলেন। কিন্তু আগস্ট-অভ্যুত্থানের পর সবই তো চলে গেল তাঁর আয়ত্তের বাইরে। তাছাড়া গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে কর্মসূচীগত মিল থাকলেও আদর্শগতভাবে ইয়েলৎসিন-গর্বাচেভ জোটবদ্ধ ছিলেন মনে করা ভুল ও ঘটনাবলীর অতি সরলীকরণ। ইতিহাসের বিকৃতিও। গর্বাচেভ কিন্তু এখনও বলেন, 'সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মৃত্যু নেই' এবং তিনি সোভিয়েত মানুষের জীবন থেকে স্বৈরতন্ত্রের বোঝা সরিয়ে দেবার কৃতিত্ব দাবী করেন। কিন্তু সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগঠক কমিউনিস্ট পার্টিকে তিনি কেন ভেঙ্গে দিলেন বা দিতে বাধ্য হলেন, তা অবশ্যই সবাইকে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। এই সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে কিনা জানি না। তবে এটুকু অনুমান করা যায়, আগস্ট-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন পার্টির ভিতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খলা আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল, অন্য দিকে সোভিয়েতের গণতন্ত্রকামী মানুষের সঙ্গে পার্টির বিচ্ছিন্নতা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছিল। হয়ত গর্বাচেভ পার্টির উপর সম্পূর্ণ আস্থা হারিয়ে ফেলে বেপরোয়া হয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। এমনও হতে পারে, পার্টির ভিতরে কায়েমী স্বার্থের যে-চক্র এতদিন নিজেদের আড়াল করে রেখেছিল, তারা এই মুহূর্তে গর্বাচেভকে হটাবার একটা ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিল তাঁর অর্থনৈতিক কর্মসূচী বানচাল হতে দেখে। ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ভিতর ষড়যন্ত্র-পাল্টাষড়যন্ত্র তো নতুন নয়। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের সুযোগ নিয়ে অতীতে বহুবার এমন ঘটেছে, ফলে গোষ্ঠীর একাধিপত্য কখনো-বা ব্যক্তির আধিপত্য। গণতন্ত্র পার্টির ভিতরে একটা প্রহসনে পরিণত হয়। আজ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সমস্যা ও বিপর্যয় সম্পর্কে আলোচনা

করতে গিয়ে পার্টির পরিচালনা-পদ্ধতির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কেও খোলা মনে আলোচনা করা দরকার, সে অভ্যাস আমাদের মধ্যে নেই। অতীতের ভুল-ত্রুটির জন্য যেমন একপেশে সমালোচনায় স্টালিনের একার ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দায় মুক্ত হওয়া গেছে, গর্বাচেভ বা রাশিয়ার ঘটনাবলী সম্পর্কেও সেই ধরনের ঝোঁক বাসববাবুর আলোচনায় লক্ষ্য করেছি। তা ছাড়া এতদূরে থেকে আমরা তো শুধু তত্ত্বের কথাই জানি, কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের জটিল রাজনীতি, অর্থনীতি, উৎপাদন ক্ষেত্রে নিত্য-নতুন টেকনোলজির আমদানী ও বাজারের ওপর তার প্রতিক্রিয়া, বিভিন্ন দেশের পারস্পরিক বাণিজ্য-সম্পর্ক ও অর্থের বিনিময়-হার, ভোগ্যপণ্যের চাহিদা ও উৎপাদন ইত্যাদি হাজার রকম পরিস্থিতির পটভূমিকায় সমাজতন্ত্রের নির্মাতাদের তত্ত্বের সঙ্গে প্রয়োগের সামঞ্জস্য বিধানের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্ষেত্র-বিশেষে তত্ত্বেরও বিকাশ ঘটছে এবং ঘটবেও। সমাজতন্ত্রের নির্মাণ ক্ষেত্র থেকে দূরে বসে তত্ত্বের শুদ্ধতা বা অপরিবর্তনীয়তা নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, কিন্তু বিচারক হওয়া মানায় না। দুঃখের বিষয়, বাসববাবু কিন্তু তা-ই করেছেন।

রাধারমণ মিত্র : অবিস্মরণীয় এক ব্যক্তিত্ব

ধনঞ্জয় দাশ

'আই অ্যাম এ কমিউনিস্ট বাই কনভিকশন'—১৯২৯ সালের ঐতিহাসিক মীরাট-ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীরূপে কমিউনিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক সদস্য না হয়েও ব্রিটিশ সরকারের আদালতে দাঁড়িয়ে ঐ কথাগুলো দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন এই শতাব্দীর অবিস্মরণীয় এক ব্যক্তিত্ব, রাধারমণ মিত্র। আমরা জানি, পরবর্তীকালে অবিভক্ত বাঙলায় ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে, সম্ভবত ১৯৪৪ সালে, তিনি গ্রহণ করেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ। আর, কী এক অজ্ঞাত কারণে এক দশক পার না হতেই ১৯৫২ সালে তিনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করেছিলেন ঐ কালে বহুবাঞ্ছিত সেই সদস্যপদটি। এরপর রাধারমণ মিত্র কি কোনোদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন? 'কমিউনিজম'-এর প্রতি যে-দৃঢ় বিশ্বাস একদা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নানা ভাঙা-গড়া এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অসংখ্য দ্বন্দ্ব-বিবাদ ও উত্থান-পতন সত্ত্বেও সেই ঘোষিত বিশ্বাস ও মৌল মার্কসীয় মতাদর্শ থেকে ব্যক্তি রাধারমণ কি কোনোদিন বিচ্যুত হয়েছেন? তাঁর অতিবড় শত্রুও সম্ভবত কোনোকালে তাঁকে নীতিভ্রষ্টতা এবং আদর্শচ্যুতির অপবাদে কলঙ্কিত করতে সাহসী হবেন না। এই কারণেই পার্টি-সদস্যপদ পরিত্যাগ করার অনেক কাল পরে, ১৯৭৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে অধ্যাপিকা মঞ্জু গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) যখন রাধারমণ মিত্র-র এক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তখন তিনি নির্দ্বিধায় পুনর্বার ঘোষণা করেন: 'আমি কমিউনিস্ট হব না তো কে কমিউনিস্ট হবে? যারা নিঃস্ব, যারা সর্বহারা তারাই তো কমিউনিস্ট হয়। আমার চেয়ে সর্বহারা কে আছে?' [দ্র. কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি স্মারকপত্র 'কমিউনিস্ট', ১৯৭৫]

প্রকৃতপক্ষে, শ্যামবাজারের এক নিঃস্ব, অতি দরিদ্র নিম্নবিত্ত পরিবারে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাধারমণ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) কর্তৃক গৃহীত পূর্বোক্ত সাক্ষাৎকারের সময় তিনি নিজেই

বলেছেন, অতি শৈশবে মাতৃহারা হয়ে চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে তাঁকে বড় হতে হয়েছে। কোনো কোনো দিন খাবারও জোটেনি তাঁর। আর, দারিদ্র্যের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই করতে করতে ক্লান্ত ও পরাজিত হয়ে অবশেষে তাঁর বাবাও বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। এই অবস্থায় মৃত্যু অথবা শিক্ষা-দীক্ষাহীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে জীবনই তো ছিল রাধারমণ-এর একমাত্র ভবিতব্য। কিন্তু না, তাঁর অদম্য প্রাণশক্তি, অপরাজেয় পৌরুষ এবং অতুলনীয় সুপ্ত প্রতিভা তাঁকে অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেয় নি। একটু বেশি বয়সে হলেও শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুলে তাঁর বাল্যশিক্ষার শুরু এবং পরবর্তীকালে হিন্দু স্কুলের ছাত্র রূপে তিনি সসম্মানে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর সম্ভবত ১৯১৮ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন সেণ্ট পলস কলেজ থেকে। তিনি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে এম. এ. পড়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছিলেন কি-না সে-সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য আমি অন্তত দিতে পারছি না। কারণ, তাঁর মৃত্যুর পরে ৮ ফেব্রুয়ারি 'গণশক্তি' পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি লিখেছেন, 'দর্শনে এম. এ. পড়া শেষ করেছিলেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন এসে পড়ায় পরীক্ষা দেননি।' ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল' পত্রিকার সহ-সম্পাদক কল্যাণ বিশ্বাস এই কথারই প্রতিধ্বনি করে তাঁর স্বাক্ষরিত নিবন্ধে লিখেছেন, He, then, graduated from the St, Paul's College and thereafter joined the M. A. in Philosophy at the Calcutta University but could not appear in the final examination because of his active participation in the non-cooperation movement launched by Gandhiji'. আর, 'কালান্তর' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর প্রতিবেদনে স্পষ্ট করেই লিখেছেন, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে [তিনি] দর্শনে এম. এ. পাস করেন।' ১৯৯২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি 'দেশ' পত্রিকায় 'শতাব্দীর পদাতিক— রাধারমণ মিত্র' শীর্ষক এক নিবন্ধেও দেখলাম লেখা হয়েছে, 'সেণ্টপলস কলেজ থেকে ইংরেজি অনার্স নিয়ে পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন নিয়ে এম.এ.।' অর্থাৎ, রাধারমণ এম. এ পরীক্ষাও পাস করেছিলেন।

দুই কমিউনিস্ট পার্টির দুটি মুখপত্রে এবং 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত পরস্পরবিরোধী এই সব উক্তি থেকে সত্য উদ্ধার করা সত্যিই সম্ভব নয়। তবে রাধারমণ-এর শিক্ষা-জীবন প্রসঙ্গে অন্য দুটি তথ্য পাঠকদের জানানো কর্তব্য

বলে মনে করছি। শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত র (চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় রাধারমণ মিত্র হিন্দু স্কুলের অধরবাবু নামে একজন শিক্ষকের নাম পরম শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ করে বলেছিলেন, তাঁরই স্নেহ ও সাহচর্যে তিনি বড় হতে পেরেছেন। আর, ১৯৮৬ সালে পাঠককে স্তম্ভিত করার মতো এক স্মৃতিচারণ-মূলক প্রবন্ধে রাধারমণ নিজেই লিখেছেন, তিনি যখন হাইস্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র তখন শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' নামে মাসিক পত্রিকার কোনো এক সংখ্যায় সর্বপ্রথম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নাম এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ সরকার কর্তৃক ভারতীয় ও কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের উপর অনুষ্ঠিত নানা ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মর্যাদা এবং মানব-অধিকারের সপক্ষে গান্ধীজীর নিরস্ত্র সংগ্রামের কথা জানতে পারেন। তিনি আরও লিখেছেন, ব্যারিস্টারি, অর্থোপার্জন সব ত্যাগ করে, ফকির হয়ে গান্ধীজী অসহায়, দরিদ্র, নিষ্পেষিত জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেভাবে তাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, 'মুকুল' পত্রিকায় সেইসব বিবরণ পড়ে গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই কিশোরকালেই রাধারমণ এর মনে হয়, 'পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম দৃষ্টান্ত বিরল' এবং 'আমার যদি কেউ গুরু থাকেন এই লোকই আমার গুরু'। নানা ঘটনা পরম্পরায় গান্ধীজীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। গান্ধীজী সম্বন্ধে পাদ্রী জন হেন্‌স্ হোম্‌স্ এবং রোমাঁ. রোলাঁ-র উক্তি পাঠ করে তাঁর ধারণা হলো, 'গান্ধীজী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব—খ্রীস্ট কিংবা বুদ্ধের চেয়েও তিনি বড়'। রাধারমণ মনে মনে ঠিক করলেন, 'তাঁর চরণে আমি আমার জীবন সমর্পণ করব।' [দ্র. মহাত্মা গান্ধী, সাবরমতী আশ্রম ও আমি, শারদীয় পরিচয়, ১৯৮৬, পৃ. ১-২]

মীরাট-ষড়যন্ত্র-মামলায় বন্দী হওয়ার আগে পর্যন্ত, আরও নির্দিষ্ট করে বলা যায়, তাঁর সাবরমতী আশ্রমবাসের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৯২৫ সালের জুন মাসে কলকাতায় ফিরে আসার প্রাক-মুহূর্ত পর্যন্ত, রাধারমণ ছিলেন গান্ধীজীর ব্যক্তিগত প্রভাবের দ্বারা সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও রাধারমণ সাবরমতী আশ্রম ছেড়ে কেন চলে এলেন মানুষকে বিস্মিত করার মতো সেই দ্বন্দ্বের ইতিহাস জানা থাকলে আমরা অনুধাবন করতে পারব তিনি কোন ধাতুতে গড়া মানুষ ছিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণা অনুসরণ করে এই ঘটনায় অনুপ্রবেশের আগে আমি রাধারমণ-এর জীবনে সংঘটিত আরও কয়েকটি জরুরি ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

১৯১৭ সালে অ্যানি বেশান্ত-এর নেতৃত্বে যখন হোমরুল আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে তখন মাদ্রাজ সরকার শ্রীমতী বেশান্ত এবং তাঁর দুই সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করতে দ্বিধা করে না। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে কংগ্রেস বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে ১৯১৭ সালের কলকাতা অধিবেশনে শ্রীমতী বেশান্তকেই সভানেত্রীর পদে নির্বাচিত করে। এই অধিবেশনে যোগ দিতে আসেন গান্ধীজী। তিনি কলকাতার এজরা স্ট্রীটে তাঁর বড় ছেলে হীরালালের বাড়িতে ওঠেন। এই সংবাদ শুনে রাধারমণ কলেজ কামাই করে ঐ বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেন গান্ধীজীকে দর্শন করার জন্য। কিন্তু অসংখ্য সাক্ষাৎকারীর মধ্যে তিনি চুপটি করে বসে থাকতেন ঘরের এক কোণে। গান্ধীজীর এটা নজর এড়ায় না। একদিন তিনি রাধারমণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি···রোজ রোজ আসো কেন? কী চাও?' যে-গুরুর চরণে 'জীবন সমর্পণ' করার বাসনা রাধারমণ এতকাল পোষণ করে এসেছেন তাঁর জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বলেন, 'আমি আপনার কাছে থাকতে চাই।' কিন্তু গান্ধীজী যখন জানতে পারলেন, রাধারমণ বি. এ. পরীক্ষার্থী এক ছাত্র তখন তিনি তাঁকে বললেন, 'আমি সাবরমতীতে একটা আশ্রম করেছি বটে, কিন্তু সেটা এখনও গুছিয়ে উঠতে পারিনি। গুছিয়ে উঠলে আমি তোমাকে ডেকে নেব। এখন যা করছ তাই করো, পরীক্ষা দাও, তবে আমার সঙ্গে যোগ রাখবে।···কোনো সমস্যা মনে উদয় হলেই আমার সঙ্গে পত্রালাপ করবে।' [দ্র. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, শারদীয় পরিচয়, ১৯৭৬. পৃ. ২]

এরপর রাধারমণ বি. এ. পাস করলেন। বেশ কিছুকাল কেটেও গেল। কিন্তু গান্ধীজীর কাছ থেকে তাঁর কাছে কোনো ডাক এলো না। গান্ধীজী মেতে উঠলেন অসহযোগ আন্দোলনে। ফলে, রাধারমণ-এর আর আশ্রমে যাওয়া হলো না।

১৯১৮ থেকে ১৯২০ সাল, অন্তর্বর্তী এই সময়কালে রাধারমণ সম্ভবত দর্শন নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিয়ে এম. এ. পাস করেছিলেন কি-না সে-সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুর পরে বিভিন্ন সংবাদপত্রে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। আমিও জানতে পারিনি এতদসংক্রান্ত সঠিক তথ্যটি। যাহোক, এই সময় মহাত্মাজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ঠিক করেন, কলকাতায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু সেটা আর হয়ে ওঠেনি। কারণ, তাঁর শরীর তখন খুবই খারাপ। ফলে, মূলত

অসুস্থ শরীর সারাবার জন্য মাত্র তিন-চার মাস থাকার ইচ্ছা নিয়ে এক হাইস্কুলের শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করে তিনি চলে যান উত্তর প্রদেশের এটওয়া শহরে। এই এটওয়াতেই তিনি জড়িয়ে পড়েন অসহযোগ আন্দোলনে।

শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) ১৯৭৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি উপলক্ষে রাধারমণ মিত্র-র যে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন তাতে তিনি লিখেছেন : 'তারপর মিত্রজী গ্রেপ্তার হলেন ১৯২০ সালে।...১৯২১-এ ছাড়া পেয়ে প্রথমে তিনি এটোয়ায়, পরে কলকাতায় চলে আসেন।' [দ্র. কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি স্মারকপত্র, পৃ. ১৫৮]। এই কথাই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে 'কালান্তর' পত্রিকার ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ সালে প্রকাশিত সংখ্যায়।

শ্রীমতী গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত সন-তারিখ দুটি সত্য হতে পারে না বলেই আমার ধারণা। এক্ষেত্রে সম্ভবত কিছুটা অসতর্কতা এবং বিভ্রান্তিই ঘটেছে। কারণ, ইতিহাসের তথ্য-প্রমাণ থেকে জানতে পারছি—অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯২১ সালে। এই আন্দোলনে গান্ধীজী ঘোষিত কর্মসূচির প্রথম ধাপ ছিল—১৯২১ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে ছাত্রদের সরকার-নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কলেজ এবং আইনজীবীদের আদালত বর্জন। রাধারমণ মিত্র-ও ১৯৮৬ সালে শারদীয় 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর স্মৃতিচারণ-মূলক 'মহাত্মা গান্ধী, সাবরমতী আশ্রম ও আমি' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন : "আমি যে স্কুলে পড়াতাম সেই স্কুলের প্রায় সমস্ত ছাত্র—সংখ্যায় পাঁচশ'র মতো—ধর্মঘট করে স্কুল থেকে বেরিয়ে গেল। আমি কলকাতায় চলে আসব মতলব করছি—ছাত্রদের অভিভাবকরা আমাকে কিছুতেই আসতে দিলেন না। স্কুলত্যাগী ছাত্রদের জন্য একটা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলো আমাকে। আমি হলাম তার প্রধান শিক্ষক। তিন মাস পরে স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হলো আমি সেই সময়ে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।'

'এই সময় রাধারমণ তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু'এবং পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রধান নেতা রূপে পরিচিত বঙ্কিম মুখার্জিকেও কলকাতা থেকে এটওয়া-য় নিয়ে যান। অতঃপর পশ্চাৎপদ যে-এটওয়া জেলায় অসহযোগের সপক্ষে প্রচার করতে এসে উত্তরপ্রদেশের সর্বাগ্রগণ্য রাজনৈতিক নেতা মতিলাল নেহরু ও মদনমোহন মালব্য তাঁদের সভায় লোক জড়ো করতে পারেননি, সেই এটওয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে হাজার হাজার মানুষের সমাবেশে তিনি এবং বঙ্কিম মুখার্জি উর্দু ভাষায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে অসহযোগের পক্ষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় এটওয়ার মতো অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ

জেলার সদরে, মহকুমায়, তহশীলে, এমনকি গ্রাম স্তরেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কংগ্রেস কমিটি। তিনি এমন প্রবলভাবে অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনা করেন যে, আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁকে ১৯২১ সালের ২ অক্টোবর, গান্ধীজীর জন্মদিনে গ্রেপ্তার করে এবং এক বছরের সাজা দিয়ে সেই রাত্রেই পাঠিয়ে দেয় নৈনি সেণ্ট্রাল জেলে। এটওয়াবাসীরা প্রায় কেউ-ই এই সংগ্রামী নেতার প্রকৃত নাম জানত না। তাঁদের কাছে রাধারমণ পরিচিত ছিলেন 'মিত্রাজী' কিংবা 'এটওয়ার গান্ধী' রূপে। এক বছর পরে, অর্থাৎ ১৯২২ সালের অক্টোবরে তিনি নৈনি সেণ্ট্রাল জেল থেকে মুক্তি পান এবং এটওয়ায় আসেন এটওয়াবাসীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কলকাতায় ফিরে যাওয়ার জন্য। অনুমান করা যায়, ১৯২২ সালের শেষ দিকে অথবা ১৯২৩ সালের প্রারম্ভেই রাধারমণ ফিরে আসেন কলকাতায়।

ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং রাধারমণ মিত্র-র নিজের লেখা তথ্য-বিবরণকে ভিত্তি করে আমি তাঁর এটওয়া থাকাকালীন রাজনৈতিক কার্যকলাপ, অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দান, গ্রেপ্তারবরণ, কারামুক্তি এবং কলকাতা-প্রত্যাবর্তনকে যেসব সন-তারিখ দিয়ে চিহ্নিত করেছি এবং শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) এ-সম্পর্কে যে-দুটি সন-তারিখ প্রদান করেছেন তার মধ্যে কোনটা যুক্তিগ্রাহ্য এবং সঠিক, আশা করি সচেতন পাঠকেরা তা সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন।

এটওয়া-প্রসঙ্গে আর দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন- রাধারমণ-এর নির্লোভ ও নিরাসক্ত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবনের জন্য। এটওয়ার অধিবাসীদের কাছে তিনি এতই জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন যে, কলকাতা ফিরে যাওয়ার কথা শুনে তাঁরা বিচলিত হয়ে তাঁকে এটওয়ায় থেকে যেতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন রাজা-মহারাজাও ছিলেন এবং সেই সময়ে আসন্ন তিনটি নির্বাচনে, অর্থাৎ বিধান পরিষদের সদস্য, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও এটওয়ার চেয়ারম্যান পদের নির্বাচনের তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁকে প্রার্থী হতে বারংবার অনুরোধ জানান। কিন্তু তাঁর মন তখন গান্ধীজীর সাবরমতী আশ্রমে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। ফলে, নির্বাচনে নিশ্চিত জয়ের প্রলোভন ত্যাগ করে এবং সকলের আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করেই রাধারমণ সাবরমতী আশ্রমে যাওয়ার আগে কিছুদিনের জন্য ফিরে এলেন কলকাতায়।

কলকাতায় এসে রাধারমণ এক দুঃসহ অবস্থার সম্মুখীন হলেন। তাঁর হাতে সম্বল মাত্র আড়াই বা তিন টাকা। কোথাও থাকবার জায়গা নেই,

খাওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। দারুণ খিদেয় পেট জ্বলতে থাকলেও ঐ সামান্য পুঁজি নিঃশেষিত হওয়ার ভয়ে কোনো কিছু কিনে খাওয়ারও উপায় নেই। রাধারমণ এই সময় সারা দিন কলের জল খেয়ে খিদে মিটিয়েছেন। রাত্রে এক ওড়িয়ার দোকান থেকে ওজনদরে কিনে খেয়েছেন দু-তিন খানা কাঁচা রুটি এবং রাত্রে শুয়ে থাকার জন্য আশ্রয় হিসেবে খুঁজে নিয়েছেন যে-কোনো লোকের বাড়ির রোয়াক।

এমনি অবস্থায় একদিন কলকাতার পথে ঘুরতে ঘুরতে রাধারমণ দেখতে পেলেন তাঁর হিন্দু স্কুলের সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু নীরেন রায়কে। নীরেন রায়ও ছিলেন মনেপ্রাণে অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক এবং জীবনযাপনে গান্ধীজীর আদর্শের দ্বারা চালিত স্বদেশপ্রেমিক এক তরুণ। আমি জানিনে নতুন প্রজন্মের পাঠকেরা নীরেন রায়কে কতটুকু জানেন। তাঁদের জ্ঞাতার্থেই শুধু বলে রাখি, রাধারমণ-এর মতো ইনিও একজন স্বনামধন্য পুরুষ। তিনি ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের শ্রুতকীর্তি অধ্যাপক। বিশের দশকে কবি বিষ্ণু দে-র গৃহশিক্ষক। ১৯৩১ সালে 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু সুভাষচন্দ্র বসু ও দিলীপকুমার রায়-এর একান্ত অনুরাগী এবং দীর্ঘকাল তাঁদের চিন্তা-ভাবনারও সহগামী ছিলেন। পরবর্তীকালে, তিরিশের দশকের শেষার্ধে, রাধারমণ মিত্র-ই নীরেন রায়কে মার্কসীয় মতাদর্শ বুঝতে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ফলে, সব পিছুটান থেকে মুক্ত হয়ে চল্লিশের দশকের গোড়ায় নীরেন রায় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং আমৃত্যু প্রগতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং মননচর্চার ক্ষেত্রে পালন করেন পুরোধা নায়কের ভূমিকা। যাহোক, নীরেন রায় বন্ধুর দুর্ভোগের কথা শুনে তাঁকে নিয়ে গেলেন নিজের বাড়িতে। সেদিন থেকে দিনের বেলা নীরেন রায়-এর বাড়িতেই রাধারমণ-এর খাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

একদিন বন্ধু নীরেন রায় কথাপ্রসঙ্গে রাধারমণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি এখন কী করতে চান? রাধারমণ তাঁর এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গান্ধীজীর সাবরমতী আশ্রমে যাওয়ার ইচ্ছাই ব্যক্ত করেন। নীরেনবাবু চেয়েছিলেন তাঁদের উভয়েরই বন্ধু সুভাষচন্দ্র বসুকে দিয়ে আশ্রমে রাধারমণকে গ্রহণ করার সুপারিশ জানিয়ে চিঠি লেখাতে। কিন্তু রাধারমণ বলেন, সুভাষ চিঠি লিখতে চায় লিখুক, তিনি তার জন্য অপেক্ষা না করে নিজেই একটা ব্যবস্থা করে নেবেন। প্রকৃতপক্ষে, রাধারমণ সাবরমতী আশ্রমের পরিচালক ও গান্ধীজীর ভাইপো মগনলাল গান্ধীকে আশ্রমে যাওয়ার প্রার্থনা জানিয়ে এমন এক আবেগপূর্ণ

চিঠি লিখলেন যে, মগনলালজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়ে তাঁকে আশ্রমে যাওয়ার আহ্বান জানালেন।

অতঃপর ১৯২৩ সালের কোনো একদিন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত সাবরমতী আশ্রমে চলে গেলেন রাধারমণ। সেখানে গিয়ে মগনলালজীর কাছে শুনলেন, সুভাষচন্দ্রও তাঁর জন্য চিঠি দিয়েছিলেন কিন্তু সেই চিঠিকে তিনি কোনো আমল দেননি। আশ্রমে নতুন লোক নেওয়া বন্ধ করা সত্ত্বেও রাধারমণ-এর চিঠি পড়ে তিনি এতই বিচলিত বোধ করেন যে, তাঁকে আশ্রমে আসার আহ্বান না জানিয়ে পারেননি।

রাধারমণ যখন আশ্রমবাসী হলেন গান্ধীজী তখন ইয়েরবাড়া জেলে বন্দী। কারণ, অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে ১৯২২ সালের ০ মার্চ গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে এবং তাঁকে দেওয়া হয় ছয় বছরের কারাদণ্ড। সুতরাং গান্ধীজীর অবর্তমানেও তিনি আশ্রমের নিয়ম-রীতি মেনে আন্তরিকতার সঙ্গে সব কাজে যোগ দিতে শুরু করলেন। আশ্রমের কাজ মানে দিনে দু'বার প্রার্থনা সভায় যোগদান এবং চার ঘণ্টা করে দু-দফায় আটঘণ্টা চরকায় সুতো কাটা ও তাঁতে কাপড় বোনার জন্য শ্রম দান করা। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করলেন, আশ্রমের চারভাগের তিনভাগ লোক গান্ধী-পরিবারভুক্ত। বাকি একভাগ বাইরের লোক। তাঁদের প্রত্যেককেই নিজের রান্না নিজেকেই করে খেতে হতো। কিন্তু যে-উপকরণ দিয়ে আহার্য তৈরি করা হতো তা খেয়ে কোনো মানুষ সুস্থভাবে বাঁচতে পারে না। অনেক সময় নুনও জুটতো না। এখানে যেন চলতো কে কত কম খেয়ে চালাতে পারে তারই এক প্রতিযোগিতা। রাধারমণ এই পরিবেশের সঙ্গে প্রাণপণে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেছেন। চরকায় সুতো কাটা, তাঁতে কাপড় বোনা, খাদিতে রঙ লাগানো—সব কাজ তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে করতে চেয়েও তাঁর আনাড়িপনা ঘুচাতে পারেন নি। ফলে, আত্মগ্লানিতে ভুগতে শুরু করেন রাধারমণ। এর উপর তিনি কিছুতেই বুঝতে পারতেন না—'চরকায় একপাক দিলে যতখানি সুতো হয় ততখানি স্বরাজ আমাদের কাছে আসে'—আশ্রমবাসীদের মুখে মন্ত্রের মতো উচ্চারিত এই কথাটার অর্থ। এছাড়া একটা রুদ্ধদ্বার লাইব্রেরির সন্ধান পেয়ে সন্ধান-দাতা সেই আশ্রমবাসীর সাহায্যে ঘরের তালা খুলে রাধারমণ দেখলেন, প্রকাণ্ড ঘরের চারিদিকে বই-এ ঠাসা বড় বড় আলমারি। বিবিধ ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ভাষায় রচিত অসংখ্য বই। পৃথিবীর স্বনামধন্য মনীষীরা দান

করেছেন তাঁদের রচিত বইগুলো। সেইসব বই-এর মধ্যে আছে রোমঁ্যা রোলাঁ আর টলস্টয়-এর নিজের হাতে লেখা মহাত্মাজীকে উপহার-প্রদত্ত দু-তিন সেট করে বই। তার মধ্যে একটা বই ছিল টলস্টয়-রচিত 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ'। এই বইটি ছাড়া ইতিপূর্বে রাধারমণ টলস্টয়-এর অন্য সব বই পড়েছিলেন। সুতরাং তিনি না-পড়া এই বইখানা পড়ার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। লাইব্রেরিয়ান যুবকটিকে বইখানা পড়ার ইচ্ছা জানালে সে খাতায় রাধারমণ-এর নাম লিখে বইটি তাঁকে পড়তেও দিল।

বইখানা পড়া নিয়ে শেষপর্যন্ত যে-কাণ্ড ঘটলো রাধারমণ-এর মতো জ্ঞানপিপাসু মানুষের কাছে তা ছিল সত্যিই অকল্পনীয়। একদিন সকালে প্রার্থনা শেষ হয়েছে। ভোরের আলো তখনো ফোটেনি। আশ্রমের কাজকর্ম শুরু হতেও দেরি আছে। এই অবকাশে হ্যারিকেনের আলোয় রাধারমণ পড়ছিলেন টলস্টয়-এর বইখানা। হঠাৎ একটা ছায়া এসে পড়ল বই-এর ওপর। রাধারমণ মুখ তুলে দেখলেন, মগনলালজী চুপিসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর পিছনে। 'কী বই পড়ছেন' জিজ্ঞাসা করায় রাধারমণ উত্তর দিলেন— "টলস্টয়-এর লেখা 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ'।" বইখানা হাতে নিয়ে মগনলালজী যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে জানিয়ে দিলেন, "আশ্রমে থেকে বই পড়া বারণ।' রাধারমণ তাঁকে বুঝাতে চাইলেন, বইখানা কোনো প্রেমের উপন্যাস নয়, এটি লিখেছেন গান্ধীজীরই গুরু টলস্টয়। এই যুক্তিতে কোনো ফল হলো না। মগনলালজী স্পষ্ট করেই বললেন, 'যারই লেখা হোক, যে-বিষয়ে লেখা হোক, কোনো বই আশ্রমবাসীদের পড়া অপরাধ।'

আশ্রমের এই কূপমণ্ডুকতা, যুক্তিহীন আচরণ, নির্জীব যান্ত্রিক পরিবেশ এবং তাঁর উপর ন্যস্ত কাজকর্মগুলি সুষ্ঠুভাবে করার কারিগরী অক্ষমতা রাধারমণ-এর মনে ক্রমশ নানা প্রশ্ন ও সংশয়ের জন্ম দিচ্ছিল। আশ্রমবাসীদের মধ্যে মাত্র একজনই ছিলেন রাধারমণ-এর চিন্তা-ভাবনার অনুসারী। এঁর নাম : বালকোবা ভাবে। মারাঠাবাসী এই যুবকটি ছিলেন আশ্রমে চরকা ও তাঁতের শিক্ষক এবং স্বনামধন্য বিনোবা ভাবের ছোট ভাই। রাধারমণ লিখেছেন, "এঁর মতো সর্বগুণান্বিত দক্ষ কর্মী খুবই কম দেখা যায়। তিনি, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ যাকে বলে, করতে পারতেন।' 'বালকোবা আশ্রমের একটি স্তম্ভ। এই স্তম্ভ যদি ভাঙে তবে আশ্রমও ভেঙে পড়বে।' [দ্র. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, শারদীয় পরিচয়, ১৯৮৬, পৃ. ৬ ও পৃ. ৮]। এ হেন বালকোবাও আশ্রম-সম্পর্কে নানা প্রশ্ন ও সংশয়ে দুলতে দুলতে শেষপর্যন্ত রাধারমণকে বলতে বাধ্য

হলেন, আশ্রমে থেকে তাঁর বুদ্ধির বিকাশ হওয়া দূরের কথা, তিনি একজন বুদ্ধিহীন জড়পশুতে পরিণত হয়েছেন। সুতরাং তিনি আশ্রমের বাইরে গিয়ে আবার মানুষ হতে চান। এই মনোভাব থেকে একদিন বালকোবা যখন সতি সত্যি আশ্রম ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন তখন রাধারমণই তাঁকে নিরস্ত করেন। তিনি বালকোবাকে বলেন, যা কিছু অন্যায় ও অযৌক্তিক মনে হচ্ছে আশ্রমে থেকেই তা শোধরাবার চেষ্টা করা উচিত। এরপর বালকোবা আশ্রমে ফিরে এসে মগনলালজীকে জানিয়ে দেন, তিনি আশ্রমেই থাকবেন এবং তাঁদের সঙ্গে লড়াই করে আশ্রমকে শোধরাবার চেষ্টা করবেন।

সাত মাস আশ্রমবাসের পর রাধারমণ-এর মন এখানে আর স্বস্তি পাচ্ছিল না। তাঁর মনে হতো—তিনি ঠিক আশ্রমের উপযুক্ত নন। তাছাড়া যে-গান্ধীজীর সংস্পর্শে থাকার বাসনা নিয়ে তিনি আশ্রমে এসেছিলেন সেই গান্ধীজী তখন আশ্রমের বাইরে কারাগারে বন্দী। এইসব কারণেই তিনি আশ্রম ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মগনলালজীকে জানিয়ে দিলেন, তিনি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছেন। গান্ধীজী আশ্রমে এলে তিনি আবার চলে যাবেন আশ্রমে। মগনলালজী তাঁকে আশ্রমে থেকে যাওয়ার জন্য অনেক করে বোঝালেও তিনি তাতে রাজী হলেন না। আশ্রম ছেড়ে আসার সময় রাধারমণ তাঁকে শুধু বলে এলেন ঃ কলকাতায় গিয়ে তাঁর পাকাপাকি থাকার ব্যবস্থা হলেই তিনি মগনলালজীকে সেই ঠিকানা জানিয়ে দেবেন দরকার মতো পত্রালাপের জন্য।

এরপর ১৯২৩ সালের শেষ দিকে রাধারমণ কলকাতায় ফিরে শ্যামপুকুর তেলিপাড়ালেনে এক ভদ্রলোকের বাড়িতেতাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাকরে সেই আস্তানার ঠিকানা জানিয়ে দিলেন মগনলাল গান্ধীকে। রাধারমণ এই সময়ে সম্ভবত প্রথম লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। না, নিজের কোনো লেখা নয়। যে-ভদ্রলোকের বাড়িতে তাঁর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ভদ্রলোক ইংরেজি ও বাংলায় বই লিখতেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর লেখাপড়ার গণ্ডি ছিল খুব সীমিত, সেইহেতু ঐ ভদ্রলোকের লেখা বই-এর ভাষা সংশোধন, পাণ্ডুলিপি পরিমার্জন এবং প্রুফ দেখার কাজটি রাধারমণকেই করে দিতে হতো। এর জন্য থাকা-খাওয়া ছাড়া তিনি কিছু হাত-খরচও পেতেন।

কলকাতায় এসে রাধারমণ যখন এইভাবে জীবনযাপন করছেন তখন ১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গান্ধীজীকে অসুস্থতার কারণে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পুণার এক হাসপাতালে অ্যাপেনডিক্সে অস্ত্রোপচারের পর

গান্ধীজী স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য চলে যান বোম্বাই-এর সমুদ্রোপকূলে জুহু-র স্বাস্থ্যনিবাসে। সেখান থেকে গান্ধীজী তেলিপাড়ার ঠিকানায় রাধারমণকে টেলিগ্রাম করে বললেন, 'আমার অবর্তমানে তুমি আশ্রমে এসেছিলে। মগনলাল-এর কাছ থেকে তোমার সব কথা শুনেছি। তোমাকে আমার বিশেষ দরকার।[১] তুমি টেলিগ্রাম পেয়েই আমার কাছে চলে আসবে।' কিন্তু রাধারমণ গান্ধীজীকে কী জানালেন? তিনি লিখলেন, 'আমি তো সাত মাস আশ্রমে কাটিয়েছি। তাতে বুঝেছি আমি আশ্রমের উপযুক্ত নই। সুতরাং আমি যেতে পারব না। আমায় মাপ করবেন।'

এইভাবে দু-জনের চিঠিপত্র আদান-প্রদানে তিন মাস কেটে গেল। অবশেষে মহাত্মাজী লিখলেন, 'তোমাকে আশ্রমে চরকা কাটতে বা তাঁত চালাতে হবে না। কাঠিয়াবাড়ের রাজকোটে আমার নামে এক রাষ্ট্রীয় শালা (জাতীয় বিদ্যালয়) স্থাপন করা হয়েছে। তোমাকে সেখানে সর্বোচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজি পড়াতে হবে। ছুটিছাটা হলে আশ্রমে এসে আমার কাছে থাকবে। আশা করি, একাজ তোমার মনঃপূত হবে। তুমি ওজর-আপত্তি করবে না।'

গান্ধীজীর এই ডাকেও রাধারমণ সাড়া দিতে পারেন নি। তিনি নানা ছুতোনাতায় কালহরণ করতে থাকেন। এমন সময় একদিন দেখেন, তাঁর তেলিপাড়া লেনের আস্তানায় সাবরমতী আশ্রম থেকে হাজির হয়েছেন মহাত্মাজীর এক ভাইপো নারায়ণদাস গান্ধী। রাধারমণ টালবাহানা করছেন দেখে মহাত্মাজী নারায়ণদাসকে পাঠিয়েছেন তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী সুস্থ হয়ে আশ্রমে ফিরে এসে এই কাজটি করেছেন। নারায়ণদাস রাধারমণকে বললেন, বাপুজীই তাঁকে পাঠিয়েছেন। তিনি যদি না যান তাহলে এখানেই নারায়ণদাস অনশন করবেন। রাধারমণ তাঁকে অনেক বোঝালেন, ফিরে যাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করলেন। তবু নারায়ণদাস তিন দিন না খেয়ে পড়ে রইলেন সেখানে। অন্যের বাড়িতে এইসব ঘটতে থাকায় রাধারমণ সহ বাড়ির লোকজনও খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। শেষে নিরুপায় হয়ে রাধারমণ নারায়ণদাসকে হাতে-পায়ে ধরে ফিরে যেতে রাজী করালেন। সম্ভবত এই সময় রাধারমণ তাঁকে কিছু প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। সেই কারণেই বোধহয় রাধারমণ লিখেছেন,

---

১. সম্ভবত অসতর্কতা বশত 'পরিচয়' পত্রিকায় (শারদীয়, ১৯৮৩) মুদ্রিত হয়েছে 'আমাকে তোমার বিশেষ দরকার'। গান্ধীজীর মূল বক্তব্যের সঙ্গে এই বাক্যটি সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলেই আমার ধারণা।—ধ. দাশ

'তিনি ফিরে যাওয়ার পর আমারও অগত্যা গান্ধীজীর কাছে না-যাওয়ার কোনো উপায় রইল না।'

এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের কিছু আগে-পরে রাধারমণ একদিন সকালে সাবরমতী আশ্রমে মহাত্মাজীর সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে রাজকোটে গিয়ে স্কুলে যোগ দিতে বললেন। রাধারমণও চলে গেলেন রাজকোটে। প্রতি শনিবার স্কুলশেষে তিনি সাবরমতীতে এসে মহাত্মাজীর কাছে থাকেন, আবার সোমবার চলে যান রাজকোটে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি আশ্রমে এসে গান্ধীজীর কাছেই থেকে যান।

এমনিভাবেই কাটছিল রাধারমণের দিনগুলো। গান্ধীজী প্রার্থনার পর আশ্রমবাসীদের উদ্দেশে কিছু-না-কিছু বলতেন। এই সময়ে তিনি সকালে প্রার্থনার পর আশ্রমবাসীদের কাউকে-না-কাউকে ডেকে আশ্রম আগে যেমন ছিল তেমনটি আছে কিনা কিংবা আশ্রমের ভালো-মন্দ সম্বন্ধে তাঁদের মতামত জিজ্ঞাসা করতেন। একদিন ভোরের প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর গান্ধীজী রাধারমণ-এর নাম ধরে ডেকে বললেন, 'ভাই রাধারমণ, আমি শুনলাম তুমি আশ্রমে থেকে চরকা কাটো না। এটা কি ঠিক কথা?'' গান্ধীজী তো তাঁকে চরকা কাটতে হবে না এবং তাঁত বুনতে হবে না—একথা জানিয়েই আশ্রমে আসতে বলেছিলেন। কিন্তু রাধারমণ গান্ধীজীকে এসব কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন না, সোজাসুজি জানালেন, তিনি চরকা কাটেন না। 'কেন কাটো না?' গান্ধীজীর এই জিজ্ঞাসার জবাবে রাধারমণ বললেন, 'আমি অসহযোগ করেছি, রাজনীতি করেছি দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না চরকা কাটার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কী সম্পর্ক?'

এবার গান্ধীজী রাধারমণ-এর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, যতদিন লাগে তিনি সময় দেবেন এবং ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়েই ছাড়বেন। তারপর তিনি রাধারমণকে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলেন তক্তাপাতা তাঁর রাত্রিকালীন শয্যায়। এই সময় গান্ধীজী রাধারমণ-এর পিঠে ও মাথায় হাত বোলাতেবোলাতে মানুষ সবচেয়ে কাকে ভালোবাসে তা জানতে চাইলেন তাঁর কাছে। রাধারমণ চুপ করে থাকায় গান্ধীজী নিজেই উত্তর দিলেন, মানুষ সবচেয়ে ভালোবাসে তার স্ত্রীকে, যেমন তিনি ভালোবাসেন তাঁর স্ত্রী কস্তুরবাকে। তারপর ভালোবাসে ছেলেমেয়েদের। তবে সব ছেলে-মেয়েকে বাবা-মা সমানভাবে ভালোবাসে, সেটা মিথ্যে কথা। যেমন তিনি তাঁর চার ছেলের মধ্যে সবচেয়ে ভালোবাসেন

ছোট ছেলে দেবদাসকে। এই কথাগুলো বলে গান্ধীজী রাধারমণকে সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলো তো, দেবদাস-এর পর আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি কাকে ভালোবাসি ?' এরও উত্তর দিতে পারেন নি রাধারমণ। তখন গান্ধীজী বলেন, দেবদাস-এর পর তিনি রাধারমণকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

[দ্র. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, শারদীয় পরিচয়, ১৯৮৬, পৃ. ১৩-১৪]

রাধারমণ লিখেছেন, গান্ধীজী যখন এই কথাগুলো তাঁকে বলছিলেন তখন সর্বক্ষণ তিনি রাধারমণ-এর মাথায় ও পিঠে হাত বোলাচ্ছিলেন। ফলে, তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছিল, শিরা-উপশিরায় বয়ে যাচ্ছিল যেন হাজার ভোল্টের এক তড়িৎপ্রবাহ। রাধারমণ ভাবলেন, বাপুজী তো মিথ্যে কথা বলেন না। তাঁর মতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও নগণ্য এক ব্যক্তিকে মিথ্যে কথা বলে তিনি খোশামোদই-বা করতে যাবেন কেন ? সুতরাং তিনি অভিভূত হয়ে বাপুজীকে জানালেন, 'আমার সম্বন্ধে আপনি যা বললেন তা শুনে আমি নিজেকে কতদূর কৃতার্থ ও ধন্য মনে করছি তা ভাষায় প্রকাশ করবার শক্তি আমার নেই। আমার শরীরের বৈকল্য থেকেই আপনি তা টের পেয়েছেন। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইলাম।'

এরপর গান্ধীজী রাধারমণকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে তিনটি কাজের জন্য তিনি বেঁচে আছেন এবং যা করার দরকার হলে তিনি মরতেও পারেন, রাধারমণ তা জানেন কি-না। এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন রাধারমণ। তিনি জানালেন, 'অস্পৃশ্যতা বর্জন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপন ও চরকা প্রচার' হলো সেই তিনটি কাজ। এবার গান্ধাজী বললেন, যার জন্য তিনি বেঁচে আছেন এবং দরকার হলে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারেন সেই চরকা কাটার কাজ যদি তাঁর মতো নিকটতম ও প্রিয়তম [গান্ধীজী ইংরেজিতে বলেন, 'নিয়ারেস্ট অ্যাণ্ড ডিয়ারেস্ট] লোককে দিয়ে না করতে পারেন তাহলে তো তাঁর জীবন নিষ্ফল, বেঁচে থাকাই বৃথা। গান্ধীজীর এইকথা শুনে রাধারমণ-এর যুক্তিবাদী মন ও প্রত্যয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না। তিনি তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে, দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে চরকা কাটার সম্বন্ধটা কী — সেই কথা যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বোঝাবার জন্যই গান্ধীজী রাধারমণকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন ; কিন্তু সেটা না করে বাপুজী তাঁর হৃদয়বৃত্তি ও ভাবাবেগকে উত্তেজিত করার মাধ্যমে কাজ হাসিল করতে চাইছেন। রাধারমণ ইংরেজিতে বলেছিলেন, 'ইনস্টেড অব অ্যাপিলিং টু মাই ইনটেলেক্ট, ইউ আর অ্যাপিলিং টু মাই সেন্টিমেন্টস,

টু মাই ইমোশন্স্।' এই অকাট্য যুক্তির মুখে বাপুজী একগাল হেসে তাঁর অপরাধ স্বীকার করে নেন। ফলে, এখানেই ঘটে এই পর্বের ইতি।

রাধারমণ আশ্রমে যেমন ছিলেন তেমন ভাবেই কাটাতে লাগলেন দিন। কিন্তু বেশ কয়েক মাস পরে ঘটলো আর এক ঘটনা। আশ্রমে কৃষ্ণদাস সিংহ নামে সে সময় একজন বাঙালী যুবক ছিলেন। তিনি গান্ধীজীর অনেকগুলো সেক্রেটারির মধ্যে অন্যতম এক সেক্রেটারি। অনেক দিন আশ্রমে থাকা সত্ত্বেও তিনি রাধারমণ-এর সঙ্গে কোনো দিন কথা বলেন নি। একদিন বিকেলের প্রার্থনার পর তিনি রাধারমণ-এর কাছে এসে বাইরে একটু বেড়িয়ে আসার প্রস্তাব দিলেন। আশ্রমের এলাকা ছাড়িয়ে স্টেশনের রাস্তা ধরে হাঁটার সময় কৃষ্ণদাস 'আশ্রমটা কেমন লাগছে'—তা রাধারমণকে জিজ্ঞাসা করেন। রাধারমণ তাঁর সত্য মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, 'এই আশ্রমের মানুষগুলোকে আমি কী না ভেবেই এসেছিলাম! এখানে এসে দেখছি সংসারের সাধারণ লোকেরা, এমনকি রাস্তার মুটেমজুরেরাও এদের অনেকের চেয়েও ভালো।' আর কৃষ্ণদাস মন্তব্য করেন, 'শিবের চারদিকেই তো থাকে ভূত-প্রেতেরা।'

যাহোক, পরদিন প্রায় এগারোটার সময় কৃষ্ণদাস রাধারমণ-এর ঘরে এসে জানান, সেদিনই বেলা দেড়টার সময় বাপুজী রাধামরণ-এর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। রাধারমণ তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, গতকাল তিনি যা বলেছিলেন তা কৃষ্ণদাস গান্ধীজীকে বলেছেন কি-না। কৃষ্ণদাস বললেন, তিনি সেই কথা বাপুজীকে বলেছেন এবং আজকের আলোচনা সেই প্রসঙ্গেই। রাধারমণ সেদিন ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হলেন গান্ধীজীর কাছে। গান্ধীজী তখন চরকা কাটছিলেন। চরকা নামিয়ে তিনি হেসে বললেন, 'আমি আশ্রম সম্বন্ধে তোমার মত জানতে চাই। সব সত্যি কথা বলবে। কিছু গোপন করবে না।' রাধারমণও জানিয়ে দিলেন, তাঁর কাছে তিনি সত্যি কথাই বলবেন।

রাধারমণ লিখেছেন, প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে বাপুজীকে তিনি মোট কুড়ি-বাইশটি বিষয় নিয়ে বলেছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন সেই বিষয়গুলির কয়েকটি হলো : ১) আশ্রমে যে-বিপুল পরিমাণ নিষ্ফলা জমি পড়ে রয়েছে তাতে মাত্র দুজন ভাড়াটে মালী দিয়ে সামান্য ফসল উৎপন্ন না করে আশ্রমের বহু লোককে কাজে লাগিয়ে অনেক বেশি ফসল ফলাতে। এর ফলে বাজার থেকে খাদ্যশস্য না কিনলেও চলবে। ২) মগনলাল গান্ধী খাদি-কর্মীদের আমেদাবাদের কলের সুতো দিয়ে কাপড় বোনার নির্দেশ দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সেই নির্দেশ মান্য করেনি। এই সুতো আশ্রমকে পয়সা দিয়ে কিনতে

হয়নি। সুতো তো ছিল মিল-মালিকদেরই স্বেচ্ছাদান। ৩) টলস্টয়-এর 'দি কিংডম অব গড ইজ উইদিন ইউ' বইখানা পড়ার সময় মগনলালজীর 'আশ্রমে বইপড়া বারণ' করার কথা। এই ধরনের আরও সতেরো আঠারোটা বিষয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছিলেন তিনি গান্ধীজীর কাছে।

আড়াই ঘণ্টা ধরে গান্ধীজী রাধারমণ-এর কথা নীরবে শুনলেন। তিনিও প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে রাধারমণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রতিটি বক্তব্যের জবাব দিলেন। যেমন তিনি বলেছিলেন : ১) মালী রেখে ছাড়া আশ্রমবাসীদের দিয়ে জমিতে কাজ করানো সম্ভব নয়। কারণ, তাদের অন্য নানা ধরনের কাজ করতে হয়। ২) মিলের সুতো দিয়ে মগনলাল কাজ করাতে চেয়ে ঠিকই করেছিল। লাখ লাখ টাকার সুতো নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। সেই সুতো নিয়ে খাদিকর্মীরা কাজ করতে অস্বীকার করে খুব অন্যায় করেছে। ৩) টলস্টয়-এর লেখা বইপড়া নিয়ে মদনলাল যা বলেছে তা ঠিক। কারণ, আশ্রমে বই পড়া নিষেধ—তা যাঁরই লেখা বা যে-ধরনেরই বই হোক। আশ্রম মানসিক অনুশীলন বা বৌদ্ধিক চর্চার ['ইনটেলেক্চুয়াল কালচার' শব্দ দুটি উচ্চারণ করেছিলেন গান্ধীজী] জায়গা নয়, এটা নিরক্ষর গরীবগুর্বো খেটে-খাওয়া লোকদের জায়গা। ইনটেলেক্চুয়াল কালচার করবে ভেবে যদি কেউ এখানে এসে থাকে তাহলে সে ভুল জায়গায় এসেছে। ইনটেলেক্চুয়াল কালচার করতে হলে তার যাওয়া উচিত পুণায় গোখলের সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে, লাহোরে লাজপত রায়ের সার্ভেন্টস অব পিপলস সোসাইটিতে অথবা শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীতে। [দ্র. পূর্বোক্ত প্রবন্ধ শারদীয় পরিচয়, ১৯৮৬, পৃ. ১৭]

এই কথা শোনার পর রাধারমণ স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, গান্ধীজীর চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি তক্ষুণি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার মুখ থেকে এ-কথা শোনবার পর আমি এখানে এক মুহূর্তও আর থাকতে পারি না। এই মুহূর্তেই চললাম। যাওয়ার আগে আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমি যখন কলকাতায়, আপনি আমাকে আশ্রমে আসবার জন্য অনবরত লিখতেন, তখন আমি আপনাকে লিখেছিলাম —আমি দেখেছি আমি আশ্রমের উপযুক্ত নই (আই অ্যাম আনফিট ফর দি আশ্রম)। এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আশ্রম আমার উপযুক্ত স্থান নয় (দি আশ্রম ইজ আনফিট ফর মি)। [আমি] চললাম।' [দ্র. ঐ]

গান্ধীজী সেই মুহূর্তে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং রাধারমণ-এর কাঁধ দুটো চেপে ধরে তাঁকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই মুহূর্তে তর্কাতর্কির মাথায় তুমি যদি আশ্রম ছেড়ে যাও আমার প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগবে। তুমি এক মাস এখানে থাকো। তোমাকে কোনো কাজ করতে হবে না·· যদি এক মাস ঠাণ্ডা মাথায় বিচার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাও যে, তোমার এখানে থাকা উচিত হবে না বা তুমি থাকতে পারবে না, তখন আমার কাছে এসে সে কথা বলে চলে গেলে আমার কোনো দুঃখ থাকবে না।'

রাধারমণ বাপুজীর এই কথা মেনে নিয়ে এক মাস আশ্রমে ছিলেন। তাঁর কী করা উচিত তা নিয়ে তিনি দিনরাত ভেবেছেন। তিন সপ্তাহ ধরে ভাবতে ভাবতে শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত করলেন—আশ্রমে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এমনি সময়ে একদিন বিকেলে গান্ধীজী তাঁকে ডেকে একটা টেলিগ্রাম দেখালেন। রাধারমণ দেখলেন, সেই টেলিগ্রাম বহন করে এনেছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর দুঃখজনক মৃত্যুসংবাদ। গান্ধীজী তাঁকে জানালেন, কালই তিনি কলকাতায় রওনা হবেন এবং চিত্তরঞ্জন দাশ-এর বাড়িতেই থাকবেন। রাধারমণ যদি ক'দিন পরে ভেবে ঠিক করেন যে, তাঁর আশ্রমে থাকা আর উচিত নয় তাহলে কলকাতায় ফিরে তিনি যেন চিত্তরঞ্জন-এর বাড়িতে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। এর প্রায় এক সপ্তাহ পরেই রাধারমণ সত্যি সত্যি আশ্রম ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর মৃত্যু হয় ১৯২৫ সালের ১৬ জুন। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, রাধারমণ সাবরমতী আশ্রম ত্যাগ করে কলকাতা ফিরে আসেন ১৯২৫ সালের ২৩-২৪ জুন কিংবা দু-একদিন আগে-পরে।

কলকাতায় ফিরে এসে রাধারমণ সি. আর. দাশ-এর বাড়িতেই গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। °গান্ধীজী তাঁকে দেখে নাকি চমক উঠে বলেছিলেন, 'তাহলে তুমি আশ্রম ছেড়ে চলে এলে?' রাধারমণ 'হ্যাঁ' বলায় গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কখনও সেখানে যাবে না? . রাধারমণ বললেন, 'না।' তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন গান্ধীজী—'আর কোনোদিনও যাবে না?' এবারও রাধারমণ এর উত্তর ছিল—'না।'

এইভাবেই সাবরমতী আশ্রমের সঙ্গে রাধারমণ-এর সব সম্পর্ক শেষ হলো। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না, তা অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল। কিছুদিন পরে গান্ধীজী সাবরমতী আশ্রম থেকে রাধারমণকে অযাচিত-ভাবে ইংরেজি ভাষায় যে-শংসাপত্র (সার্টিফিকেট) লিখে পাঠান তা মানব-

জীবনের এক অমূল্য সম্পদ রূপে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। গান্ধীজী লিখেছিলেন, 'ভাই রাধারমণ দুবার আমার আশ্রমে এসেছিল। সে এসেছিল আমার কাছে কিছু শিখতে। কিন্তু সে আমার কাছে কী শিখেছে জানি না, তবে সে আমার কাছে যা শিখেছে আমি তার কাছে তার চেয়েও অনেক বেশি শিখেছি' [ইংরেজি বয়ান ছিল : 'হি কেন টু লার্ন সামথিং ফ্রম মি। আই ডু নট নো হোয়াট হি হ্যাজ লার্নট ফ্রম মি। বাট আই হ্যাভ লার্নট মাচ মোর ফ্রম হিম দ্যান হি হ্যাজ ফ্রম মি']।

গান্ধীজী কি কোনো দিন তাঁর অন্য কোনো শিষ্য-শিষ্যা কিংবা স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁর একান্ত বিশ্বাসভাজন কোনো সহযোদ্ধার উদ্দেশে এই ধরনের প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করেছেন ? আমার অন্তত তা জানা নেই। কিন্তু তাঁর এই শংসাপত্র থেকে যে-কোনো ব্যক্তি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, রাধারমণ গান্ধীজীর অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কী অসামান্য সস্নেহ সম্মান বা সম্ভ্রম আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠতম মহান ব্যক্তিটির কাছ থেকে।

এটা আরও উপলব্ধি করা যায় রাধারমণকে লেখা গান্ধীজীর অন্য একখানা চিঠি থেকে। ১৯২৬ সালে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দিল্লীতে নিহত হলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী। ফলে বেদনাহত মহাত্মা গান্ধী এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এবং হিন্দু-মুসলিমের একতা ফিরিয়ে আনতে শুরু করলেন একুশ দিনের অনশন। অনশনের আঠারোতম দিনে গান্ধীজীর মনে হলো তিনি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন এবং এ-যাত্রা তিনি না-ও বাঁচতে পারেন। গান্ধীজী একটা পোস্টকার্ডে কাঁপা কাঁপা অক্ষরে রাধারমণকে লিখলেন : 'প্রিয় রাধারমণ,...এই চিঠি লেখার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নেই। যে সমস্ত লোক এক সময়ে আমার জীবনে এসেছিল এবং আমার জীবনের উপর গভীর ছাপ রেখে গেছে তাদের কথা আজ ক'দিন থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মনে হচ্ছে। আজ সকাল থেকে উঠেই ক্রমাগত তোমার কথাই মনে হচ্ছে। যদি আমি মরি, মাঝে মাঝে আমার কথা স্মরণ কোরো।' [ইংরেজি বয়ান : 'আই হ্যাভ বিন থিংকিং ফর দি পাস্ট ফিউ ডেজ অব দোজ পিপল হু কেম ইন্‌টু মাই লাইফ অ্যাণ্ড লেফট এ ডীপ ইম্‌প্রেশন আপন মি। দিস মর্নিং আই হ্যাভ বিন থিংকিং কন্‌স্টান্ট্‌লি অব ইউ। রিমেম্বার মি সামটাইমস্‌ ইফ আই ডাই।']

রাধারমণ লিখেছেন, এই চিঠিপড়ে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। আমাকেও আজ আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে

১৯২৬ সালে মহাত্মাজীর মতো ভারতের শ্রেষ্ঠতম নেতা যাঁকে স্মরণ করছেন, যিনি ছিলেন সততা নিষ্ঠা ও একাগ্রতার প্রতিমূর্তি, যাঁর স্মৃতিশক্তি আর বাগ্মিতা ছিল বিস্ময়কর, মানববিদ্যার প্রায় প্রতিটি শাখায় যিনি ছিলেন নিত্য বিচরণশীল, মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে যিনি আয়ত্ত করেছিলেন প্রকৃত পাণ্ডিত্য, যিনি ছিলেন আকৈশোর নিপীড়িত মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু আর সংগ্রামী সহযাত্রী, সেই অবিস্মরণীয় মানুষটিকে এত দীর্ঘকাল কাছে পেয়েও বাঙলার হতভাগ্য বুদ্ধিজীবীরা, বিশেষ করে তাঁর কমিউনিস্ট বন্ধুরা তাঁকে তেমনভাবে কাজে লাগাতে পারলেন না কেন, তাঁর সম্পর্কে কেন অবলম্বন করলেন এত নিঃস্পৃহ মনোভাব?

আমার এই মর্মযন্ত্রণা ব্যক্ত করে এবং প্রয়াত রাধারমণ মিত্র-র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ব্রাত্য নিবন্ধকার হয়তো এখানেই এ-লেখার ইতি টেনে দিতে পারতো। কিন্তু তা করা হলে নতুন প্রজন্মের পাঠকদের প্রতি সম্ভবত অবিচারই করা হতো। কারণ, ১৯২৬ সালের পরেও রাধারমণ আরও ছেষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন। এই সুদীর্ঘ সময়কালে বিংশ শতাব্দীর অতুলনীয় এক বাঙালী পদাতিক রূপে রাধারমণ কতভাবে কত পথ যে পরিক্রমা করেছেন তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। তাঁর পথ-পরিক্রমার প্রতিটি বাঁকেই তিনি রেখে গিয়েছেন স্মরণীয় অনেক পদচিহ্ন। সেইসব পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমি তাঁর জীবনের গৌরবোজ্জ্বল কিছু কথা অতি সংক্ষেপে এবার তুলে ধরার চেষ্টা করছি নতুন প্রজন্মের পাঠকদের কাছে।

কিন্তু তার আগে রাধারমণ-এর জীবন-ভিত্তিক সঠিক তথ্য পরিবেশনের স্বার্থে কয়েকটি কথা বলা একান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি, রাধারমণ নিজে কোনো আত্মজীবনী কিংবা স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ রচনা করে যাননি। একমাত্র 'মহাত্মা গান্ধী, সাবরমতী আশ্রম ও আমি' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক রচনাটি ছাড়া তাঁর জীবনভিত্তিক অন্য কোনো রচনা তিনি লিখেছেন কি-না তা আমি জানিনে। তবে তাঁর দেওয়া দুটি সাক্ষাৎকার আমি পড়েছি। ১৯৭৫ সালে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) এবং ১৯৮৬ সালে 'দেশহিতৈষী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অন্য একটি সাক্ষাৎকার। এই দুটি সাক্ষাৎকারের মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে তাঁর জীবনের বেশ কিছু স্মরণীয় ঘটনা। আর, ৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) তাঁর জীবনাবসানের পর প্রায় সব সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে রাধারমণ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী। এইসব সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদনে লক্ষ্য করেছি, রাধারমণ-এর জীবনকেন্দ্রিক

যেসব ঘটনাবলি প্রতিবেদকরা প্রকাশ করেছেন তা হয়তো যথাযথ কিন্তু সেইসব ঘটনার সময়কালের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি ও গরমিল বিদ্যমান।

যেমন, শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) লিখেছেন, রাধারমণ '১৯২৬-এ কলকাতায় এলেন। পুরনো বন্ধু বঙ্কিম মুখার্জির সঙ্গে দেখা হল। তিনি ঠিক করলেন শ্রমিকদের সংগঠিত করতে হবে, তাদের আন্দোলনে নামাতে হবে। এই সময় তিনি তাঁর বন্ধু ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে কর্পোরেশনের প্রাথমিক স্কুল পরিদর্শকের কাজ পান। সেখানে তিনি কর্পোরেশনের কেরানী-দের নিয়ে এক সংগঠন তৈরি করেন, সম্ভবত এটাই প্রথম মধ্যবিত্ত কেরানীদের সংগঠন।' [দ্র. কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি স্মারকপত্র, ১৯৭৫, পৃ. ১৫৯]। আবার, ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) 'গণশক্তি' পত্রিকায় 'অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রাধারমণ মিত্র' শিরোনামে এক প্রতিবেদনমূলক নিবন্ধে নিজস্ব প্রতি-নিধি লিখেছেন: '১৯২৫ সালে কলকাতায় এসে রাধারমণ মিত্র দর্জিপাড়ায় এক স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন।...তিনি বুঝতে পারেন যে শ্রমিকদের মত শিক্ষক-দেরও নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করতে হবে। ১৯২৭ সালে তাঁর চেষ্টায় কলকাতা কর্পোরেশন টিচার্স এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ছিলেন সেই সংগঠনের সম্পাদক।' আর, ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) 'কালান্তর' পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার মূলত শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়) কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যই তাঁর প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন এবং সেই সঙ্গে যুক্ত করেছেন আরও দু-একটি আজগুবি কথা। দুই কমিউনিস্ট পার্টির দুটি মুখপত্রে প্রকাশিত এই সামান্য তথ্যের মধ্যেও কত গরমিল, পাঠকেরা তা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। রাধারমণ কোন সালে সাবরমতী আশ্রম ত্যাগ করে কলকাতায় এলেন, কলকাতা কর্পোরেশনে কোন পদে চাকরিতে বহাল হলেন এবং তিনি কোন সংগঠন গড়ে তুললেন—এই তিনটি ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি পত্রিকায় পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে কোনো মিল নেই। তাছাড়া, 'প্রায় পঞ্চান্ন বছর কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়ে' অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর মতো প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ও প্রখ্যাত ইতিহাসবেত্তা যখন ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) তারিখের 'গণশক্তি'-র পৃষ্ঠায় রাধারমণ মিত্র স্মরণে 'অসামান্য মানুষ চলে গেলেন' শীর্ষক নিবন্ধটি লেখেন তখন পাঠকেরা তো আশা করতেই পারেন. তার মধ্যে রাধারমণ-এর জীবনভিত্তিক কিছু নির্দিষ্ট তথ্য তিনি অন্তত তাঁদের উপহার দেবেন। দুঃখের কথা, ঐ নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় হীরেনবাবুও সঠিক সন-তারিখ না জানিয়ে রাধারমণ-এর জীবনকে জড়িয়ে প্রচলিত কিছু টুকরো কথাই

আমাদের শুনিয়েছেন। এর মধ্যে একটি তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলেই আমার ধারণা। হীরেনবাবু যা লিখেছেন তার থেকে মনে হয়, রাধারমণ প্রথমবার সাবরমতী আশ্রম ছেড়ে কলকাতায় এসে 'গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কর্পোরেশন স্কুলে কাজ নিয়েছিলেন' এবং গান্ধীজীর ডাকে দ্বিতীয়বার সাবরমতী আশ্রমে সেই কাজ ছেড়েই চলে যান। কিন্তু রাধারমণ মিত্র-র নিজের লেখা 'মহাত্মা গান্ধী, সাবরমতী আশ্রম ও গান্ধী' শীর্ষক নিবন্ধটি [১৯৮৬ সালের শারদীয় সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত] পাঠ করলেই বুঝা যায়—হীরেনবাবুর বক্তব্য কত ভিত্তিহীন। আর, ১৯৪১ সালে সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতির কাজের মধ্যে রাধারমণকে টেনে এনে তাঁকে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণে সম্মত করাতে পারায় হীরেনবাবু এখনও গর্ববোধ করলেও রাধারমণ প্রকৃতপক্ষে কোন সালে পার্টি সদস্যপদ গ্রহণ করেন তা কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট করে বলেন না। শুধু জানান, 'বোধহয় ১৯৪৩-৪৪ সাল নাগাদ সময়ে তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণে সম্মত হলেন।' আমার মতে, 'গণশক্তি'-র নিজস্ব প্রতিনিধিই কিছু ভুল-ত্রুটি সত্ত্বেও রাধারমণ-এর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য জীবনপঞ্জি রচনা করেছেন। তবু ঐ পত্রিকায় প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সুধাংশু দাশগুপ্ত-র 'কমরেড রাধারমণ মিত্র স্মরণে' নামক নিবন্ধের মধ্যে পার্টি-সদস্যপদ গ্রহণ সম্পর্কে রাধারমণ-এর যে-বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে তা বেমালুম বিস্মৃত হয়ে নিজস্ব প্রতিনিধি তাঁর পূর্বোক্ত প্রতিবেদনে লিখেছেন, '১৯৩৮ সালে তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ পান।' অন্যান্য সংবাদপত্রেও দেখেছি, এক্ষেত্রে ১৯৩৮ সালই লেখা হয়েছে। আর, 'কালান্তর' লিখেছে ১৯৩৯ সালে সদস্যপদ প্রাপ্তির কথা।

আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য — রাধারমণ-এর জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন করা সত্যিই এক দুঃসাধ্য কাজ। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো নিষ্ঠাবান গবেষক এই কাজে ব্রতী হবেন। আমি এইসব ছিন্নসূত্র যথাসাধ্য জোড়া লাগিয়ে কয়েকটি প্রধান প্রধান ঘটনার মধ্য দিয়ে রাধারমণ-এর অসামান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্বের দীপ্ত গরিমা আজ অনুধাবন করতে চাই।

১৯২৫ সালে রাধারমণ যখন কলকাতায় এলেন তখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আর নেই। কংগ্রেসের দুই তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র ও জে. এম. সেনগুপ্ত-র মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ শুরু হয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নেমে এসেছে হতাশার ছায়া। বিপ্লববাদে বিশ্বাসী যেসব নেতা ও কর্মী অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের একাংশ যেমন হতাশা নিয়েও কংগ্রেসে রয়ে গেলেন তেমনি আর এক অংশ প্রচণ্ড ক্ষোভ

নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ভাবতে শুরু করলেন। সমসাময়িককালে বাঙলার ছাত্র-যুবরাও একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হলেন। ১৯২৬-২৭ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলো অল বেঙ্গল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন (এ. বি. এস. এ)। ১৯২৪ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলার অবসানে ১৯২৫ সালের ২৬ ডিসেম্বর বিভিন্ন প্রদেশের কমিউনিস্ট নেতারা কানপুরে এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে স্বদেশের মাটিতে প্রথম গঠন করলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এই সম্মেলনে সদ্য-কারামুক্ত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্ফর আহ্মদও যোগ দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এর আগে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর তাশকন্দে এম. এন. রায়-এর উদ্যোগে বিদেশের মাটিতে গঠিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। কানপুরে কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হওয়ার প্রায় দু-মাস আগে ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর অবিভক্ত বাঙলায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'লেবার-স্বরাজ পার্টি', পরের বছর ১৯২৬ সালে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে 'লেবার-স্বরাজ পার্টি'র নাম পরিবর্তন করে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' নামটি গৃহীত হয়। ১৯২৭-২৮ সালের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশে গঠিত হয় 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি'। বিভিন্ন প্রদেশের 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি'-র প্রতিনিধিরা ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে কলকাতায় এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে গঠন করেন 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টস পার্টি অব ইণ্ডিয়া'।

এই সময় বাঙলায় মাত্র চারজন ব্যক্তিই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। এরাঁ হলেন—মুজফ্ফর আহ্মদ, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, আব্দুল হালিম ও সামসুল হুদা। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার, সাবরমতী আশ্রম ছেড়ে রাধারমণ যে-বছর কলকাতায় ফিরে আসেন, সেই ১৯২৫ সালেই মার্কস-বাদে পরিশীলিত ও সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় পরিপুষ্ট প্রবাসী বিপ্লবী নেতা ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর প্রবাস-জীবনে ছেদ টেনে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরেই তিনি তৎকালীন শ্রমিক আন্দোলনে যেমন সহযোগিতা করতে শুরু করলেন তেমনি সহজ-সরল পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে অসংখ্য জিজ্ঞাসু তরুণ মনে সমাজতান্ত্রিক চেতনা সঞ্চারিত করার কাজেও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হলেন।

সমসাময়িককালে আর একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। বিপ্লববাদী অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু নেতৃস্থানীয় তরুণ যুবক রুশদেশে সংঘটিত সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এদেশেও সেইপথ কীভাবে অনুসরণ

করা যায় তা অনুসন্ধান করতে থাকেন। ধরণী গোস্বামীর নেতৃত্বে এঁরা গঠন করেন 'ইয়ং কমরেডস লীগ'। এই দলেরই কয়েকজন, বিশেষ করে ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, মণি সিং প্রমুখ কিছু কালের মধ্যেই শ্রমিক-কৃষক-দলের সদস্য কিংবা সহযোগী বন্ধু রূপে শ্রমিক-আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বাঙলার এই রাজনৈতিক পটভূমিতে কলকাতায় এসে রাধারমণ-এর মতো সচেতন ও সংবেদনশীল মানুষ কি চুপচাপ বসে থাকতে পারেন? সত্যিই তিনি বসে ছিলেন না। কলকাতার কর্পোরেশন-স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে তিনি শিক্ষকদের সংগঠিত করার কাজ শুরু করলেন। বলা যায়, প্রধানত তাঁরই একক প্রচেষ্টায় ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা কর্পোরেশন টিচার্স এসোসিয়েশন। সম্ভবত এটাই ছিল সমগ্র বাঙলায় শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত প্রথম সংগঠন। ইতিমধ্যে সন্থ-গঠিত বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য এবং তাঁদের সহযাত্রীরা বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় ও পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের ন্যায়সংগত দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাঁদের সাংগঠনিক শক্তি প্রতিফলিত হলো ১৯২৭ সালের ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর মাসে খড়্গপুর রেলওয়ে কারখানায় সংঘটিত শ্রমিক-ধর্মঘটের মধ্যে। তারপর এই শ্রমিক-আন্দোলন দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়ল কলকাতার আশেপাশে শ্রমিক-অঞ্চলে। ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসে ছয়মাসব্যাপী এক দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট-সংগ্রামে শামিল হলেন লিলুয়ার রেল-কারখানার জঙ্গী শ্রমিকেরা। সমগ্র ১৯২৮ সাল জুড়ে এই ধরনের ধর্মঘট একে একে সংঘটিত হলো চেঙ্গাইল, বাউড়িয়া প্রভৃতি জুটমিলে, কলকাতা কর্পোরেশনের ধাঙড়রাও করলেন ধর্মঘট। এই ধর্মঘটগুলির প্রধান সংগঠক ছিলেন গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী, কিরণ মিত্র [জটাধারী বাবা নামেও পরিচিত], শিবনাথ ব্যানার্জি, মুজফ্ফর আহ্মদ, ফিলিপ স্প্রাট [ব্রিটিশ কমিউনিস্ট, ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক ভারতে প্রেরিত], আব্দুর রেজ্জাক খাঁ, বঙ্কিম মুখার্জি, রাধারমণ মিত্র, কালিদাস ভট্টাচার্য এবং শ্রমিকনেত্রী প্রভাবতী দাশগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে।

আমার ধারণা, রাধারমণ সাবরমতী আশ্রমে মুক্তবুদ্ধি এবং চিন্তার স্বাধীনতার অভাব দেখে এবং গান্ধীজীর অবৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণায় সায় দিতে না পেরে আশ্রম ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের মর্যাদা ও মানব-অধিকারের সপক্ষে এবং অসহায়, দরিদ্র,

নিপেষিত জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় গান্ধীজী যে-আদর্শ স্থাপন করেছিলেন সেই আদর্শটি তিনি কোনোদিন বিস্মৃত হন নি। তাই কলকাতায় এসে রাধারমণ নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের পাশে দাঁড়াতে দ্বিধা করেন নি। বিশেষ করে তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু এবং শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তৎকালে বামপন্থী কংগ্রেস নেতা রূপে পরিচিত বঙ্কিম মুখার্জির সহযোগিতায় তিনি ১৯২৭-২৮ সালের শ্রমিক-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। আর, যেহেতু সব কাজেই ছিল তাঁর তুলনাহীন নিষ্ঠা এবং যোগ্যতা, সেইহেতু অতি অল্প-কালের মধ্যেই রাধারমণ হয়ে ওঠেন শ্রমিক-আন্দোলনে অবিংসবাদী এক নেতা।

লিলুয়ার রেল-কারখানার শ্রমিকদের দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট যখন কর্তৃপক্ষের অনমনীয় মনোভাবের ফলে প্রায় ভেঙে যাওয়ার মুখে তখন আপসহীন কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ এই ধর্মঘটকে ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের অন্যান্য কেন্দ্রেও ছড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ধরণী গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র, গোপেন চক্রবর্তী ও ফিলিপ স্প্রাট রেলওয়ের বিভিন্ন কেন্দ্রে রওনা হয়ে যান। রাধারমণ মিত্র ও ফিলিপ স্প্রাট ছিলেন রেলওয়ের আসানসোল ইয়ার্ড এবং অণ্ডাল ওয়ার্কশপে শ্রমিক ধর্মঘটের প্রধান সংগঠক। চটকল শ্রমিকদেরও অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন রাধারমণ। তিনি চেঙ্গাইল জুট মিলে শ্রমিক ইউনিয়ন যেমন গড়ে তোলেন তেমনি বাউড়িয়া জুট মিলের শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। এই দুটি জুট মিলে যখন ধর্মঘট শুরু হয় তখন বঙ্কিম মুখার্জি, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, স্প্রাট ও রাধারমণ মিত্রই ছিলেন তার প্রধান নেতা। ১৯২৯ সালে মীরাট কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্র-মামলায় বন্দী হওয়ার আগে রাধারমণই হন বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। ১৯২৮ সালের জুন মাসে কলকাতায় প্রভাবতী দাশগুপ্ত, মুজফ্ফর আহ্মদ ও ধরণী গোস্বামীর নেতৃত্বে ধাঙড়-ধর্মঘট শুরু হলে এই ধর্মঘটের সমর্থনে রাধারমণ শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের এক মিছিল সংগঠিত করেন এবং ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে মনুমেণ্ট-ময়দানের জনসভায় হিন্দী-ভাষায় প্রদান করেন এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা। ১৯২৮ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি সাইমন-কমিশন কলকাতায় আসে ['গণশক্তি' পত্রিকায় লেখা হয়েছে ১৯২৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় এবং কোনো কোনো কমিউনিস্ট নেতার লেখায় এই তারিখটিই উল্লেখিত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্তির ফসল।] 'সাইমন ফিরে যাও'—এই দাবিতে সেদিন কলকাতা উত্তাল হয়ে

উঠেছিল। কলকাতার ৩২টি ওয়ার্ডে ঐদিন একযোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, বের হয় অসংখ্য মিছিল। রাধারমণ-এর নেতৃত্বে এক বিরাট শ্রমিক-মিছিল 'সাইমন ফিরে যাও'—এই স্লোগান তুলে দৃপ্ত পায়ে রাজপথ পরিক্রমা করে।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে ঘটে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ঐ বছর ৩০ ডিসেম্বর কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে তিরিশ হাজার শ্রমিকের এক বিশাল মিছিল [ডঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার মতে পঞ্চাশ হাজার] বঙ্কিম মুখার্জি, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, ধরণী গোস্বামী, রাধারমণ মিত্র, গোপেন চক্রবর্তী, শিবনাথ ব্যানার্জি, কিরণ মিত্র, আর. এস. নিম্বকর প্রমুখের নেতৃত্বে 'দুনিয়ার মজুর এক হও', 'শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই', 'স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক ভারত দীর্ঘজীবী হোক' প্রভৃতি স্লোগান দিতে দিতে কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর দাবি পেশ করার জন্য কংগ্রেস-মণ্ডপের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়। মণ্ডপে প্রবেশের মুখে কিছু বাধার সৃষ্টি হলেও শেষ পর্যন্ত জওহরলাল নেহরুর হস্তক্ষেপে এবং মতিলাল নেহরুর নির্দেশে শ্রমিক-মিছিলটি মণ্ডপে প্রবেশের অনুমতি পায়। তারপর জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ধরণী গোস্বামী পেশ করেন ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের সমর্থনে সেদিন বঙ্কিম মুখার্জি, নিম্বকর, কিরণ মিত্র, শিবনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে রাধারমণ মিত্র-ও ভাষণ দেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ১৯২৭-২৮ সাল জুড়ে শ্রমিক-আন্দোলনের বিস্তৃত কর্মকাণ্ডে শুধু যুক্ত থাকা নয়, নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করা সত্ত্বেও রাধারমণ মিত্র কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না। 'গণশক্তি' পত্রিকার নিজস্ব প্রতিনিধি লিখেছেন, 'তিনি ছিলেন শ্রমিক ও কৃষক দলের অন্যতম স্থপতি'। 'কালান্তর' পত্রিকায় শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত (চট্টোপাধ্যায়)-র পূর্বোক্ত যে-সাক্ষাৎকারটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, সেখানেও দেখছি লেখা আছে—'...তিনি ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজেণ্টস পার্টিতে যোগদান করেন।' কিন্তু ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পথিকৃৎ এবং ১৯২৮ সালে 'ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজাণ্টাস পার্টি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্পষ্ট করেই লিখেছেন, 'বঙ্কিম মুখার্জি ও রাধারমণ মিত্র ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজান্টস্ পার্টির সভ্য ছিলন না, কিন্তু আমাদের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করতেন।' [দ্র. আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পৃ. ৩৮১]। প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা রণেন সেনও তাঁর 'বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ' গ্রন্থে

লিখেছেন, 'চটকল শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ছিলেন কালিদাস ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মুখার্জি, রাধারমণ মিত্র ও আব্দুর রেজ্জাক খাঁ। খাঁ সাহেবই শুধু কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ছিলেন, অন্যেরা পার্টির বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।' [দ্র. উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ২৩]

রাধারমণ মিত্র-র বন্ধু শ্রমিকনেতা বঙ্কিম মুখার্জি ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টির সদস্য না হলেও জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। সেইহেতু তাঁকে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত মানুষরূপে নিশ্চয় চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু রাধারমণ না-কংগ্রেস, না-কমিউনিস্ট, না-ওয়ার্কার্স অ্যাণ্ড পেজান্টস পার্টি —কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়ে শুধুমাত্র শ্রমজীবী মানুষের পেশাভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য রূপেই পালন করেছিলেন অসাধারণ এক রাজনৈতিক ভূমিকা। আমি এই দিকটির প্রতি সাধারণভাবে পাঠকদের এবং বিশেষভাবে আজকের রাজনীতিবিদদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমার মনে হয়েছে, একজন মানুষ যদি প্রকৃত সৎ ও সত্যনিষ্ঠ হন, তিনি যদি অসহায়, নিপীড়িত ও নিষ্পেষিত মানুষকে অন্যায়-অবিচার আর নিষ্পেষণের হাত থেকে মুক্ত করার পবিত্র ব্রত মনে-প্রাণে গ্রহণ করেন, তাঁর পরিশীলিত মনে যদি প্রবহমান থাকে দেশপ্রেমের ফল্গুধারা এবং তিনি যদি হন সত্যিকার প্রতিভা-বান পুরুষ, তাহলে কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও মানবমুক্তির সংগ্রামে তিনি পালন করতে পারেন যথার্থ এক ইতিবাচক ভূমিকা। রাধারমণ-এর জীবন থেকে আমরা অন্তত এই শিক্ষাটুকু বিনীতভাবে গ্রহণ করতে পারি। ইতিহাসে ব্যক্তি-মানুষেরও যে থাকতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, রাধারমণ তারই এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

যাহোক, ১৯২৭-২৮ সালে শুধু বাঙলায় নয়, সমগ্র ভারতে শ্রমিকশ্রেণী একের পর এক ধর্মঘট সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন। ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান তিনটি কেন্দ্রে, অর্থাৎ কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের শিল্পাঞ্চলে যেন ঢেউ-এর মতো আছড়ে পড়েছিল ধর্মঘট। এই ধর্মঘট পরিচালনার পুরোভাগে ছিলেন শ্রমিক-কৃষক পার্টি তথা কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যেরা এবং ট্রেড ইউ-নিয়নের সঙ্গে যুক্ত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। এর মধ্য দিয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। ফলে, আতঙ্কিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কমিউ-নিস্টদের দমন করার জন্য ১৯২৯ সালের ২০ মার্চ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ৩১ জন কমিউনিস্ট ও শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করে। অতঃপর চালু হয় ঐতি-হাসিক মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র-মামলা।

মীরাট কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্র-মামলায় বাঙলা থেকে গ্রেপ্তার এবং অভিযুক্ত হয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, রাধারমণ মিত্র, ধরণী গোস্বামী, শিবনাথ ব্যানার্জি, শামসুল হুদা, গোপেন চক্রবর্তী, গোপাল বসাক, কিশোরীলাল ঘোষ ও ফিলিপ স্প্রাট।

[দ্র. বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ডঃ পঞ্চানন সাহা, পৃ. ৮৬-৮৭]

এই ষড়যন্ত্র-মামলা প্রায় চার বছর ধরে চলে। মীরাটের কারাগারে বন্দী অবস্থায় মার্কসীয় সাহিত্য গভীরভাবে অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে রাধারমণ মার্কস-বাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই বলেছেন, 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে জেল-জীবন যাপন করার আগে আমি কমিউনিস্ট ছিলাম না। মীরাটের জেলখানায় পড়াশুনা করে বুঝে-সুঝেই কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করি। তখন আমি ওয়ার্কার [স] অ্যাণ্ড পেজাণ্ট [স] পার্টিরও সভ্য ছিলাম না। আমার কোনো পার্টি আনুগত্য ছিল না।··· মীরাটের জেলখানায় আমরা একই ব্যারাকে থাকতাম। সেখানে ১৭ জন কমিউনিস্ট ঠিক করলেন যে, আদালতে তাঁরা এক যৌথ বিবৃতি দেবেন। আমিও সেই বিবৃতিতে স্বাক্ষর করলাম। এই বিবৃতিতে শ্রমিক, কৃষক, সকল অংশের শ্রমজীবী মানুষের অবস্থা ও তাঁদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম, কমিউনিস্ট-দের আদর্শ ও তার কৌশল—এসব কিছুই ছিল।' [দ্র রাধারমণ মিত্রের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার, দেশহিতৈষী, শারদসংখ্যা, ১৯৮৬]।

এই যৌথ বিবৃতি ছাড়াও প্রত্যেক অভিযুক্ত বন্দী আত্মপক্ষ সমর্থন করে দায়রা আদালতে ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতিতেই রাধারমণ নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'বিশ্বাসের দিক থেকে আমি একজন কমিউনিস্ট।' ব্রিটিশ সরকার এই ষড়যন্ত্র-মামলা দায়ের করে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে কলঙ্কিত করতে এবং এ-দেশে কমিউনিস্টদের প্রভাব খর্ব করতে চেয়েছিল। কিন্তু ফল হয়েছিল উল্টো। বন্দী কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের সহযাত্রী বন্ধুরা আদালত-কক্ষকে ব্যবহার করে সমগ্র ভারতে সেই মতাদর্শকেই ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যাহোক, মীরাটের দায়রা আদালতের রায়ে প্রায় প্রত্যেক বন্দীকে দীর্ঘ-মেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়। রাধারমণ-এর হয় চার বছরের কারাদণ্ড। কিন্তু হাইকোর্টে আপীল করায় এই দণ্ড এমনভাবে হ্রাস করা হয় যে অধিকাংশ আসামীকেই সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। আর,

রাধারমণ-এর ক্ষেত্রে প্রদত্ত হয় বেকসুর মুক্তির আদেশ। ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে কোনো একদিন রাধারমণ-এর বন্দীজীবনের অবসান ঘটে।

চার বছরের দীর্ঘ বন্দীজীবনে রাধারমণ যেভাবে মার্কসবাদের মৌলিক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেছিলেন, বিচরণ করেছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তা তাঁর মনন-জগৎকে সমৃদ্ধ করেছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল যে, তাঁর সহবন্দী-সুপণ্ডিত এবং কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা ডঃ গঙ্গাধর অধিকারী রাধারমণকে অভিহিত করেছিলেন 'চলমান বিশ্বকোষ' রূপে।

কারামুক্তির পর রাধারমণ কলকাতায় এসে কোন্ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছিলেন, সেই তথ্য আমি এখনো অনুসন্ধান করে উঠতে পারিনি। কারাগারে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করে মতবাদের দিক থেকে নিজেকে কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেও তিনি কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন নি। অবশ্য তা হওয়াও তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ, ষড়যন্ত্র মামলা এনেও কমিউনিস্টদের প্রতিহত করতে না পেরে ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৪ সালের ২৩ জুলাই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বাঙলার ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য বাঙলার প্রাদেশিক সরকার কমিউনিস্ট পার্টির 'কলকাতা কমিটি' সহ ১৩টি সংগঠনকে বেআইনী বলে ঘোষণা করে। এই অবস্থায় রাধারমণ-এর পক্ষে কমিউনিস্টদের সঙ্গে প্রকাশ্যে যোগাযোগ রাখা হয়তো সম্ভব ছিল না। তিনি গোপনে কোনো যোগাযোগ রাখতেন কিনা তা আমার অজ্ঞাত।

প্রবীণ নেতাদের আলাপ-আলোচনা ও স্মৃতিচারণা থেকে এটুকু বুঝা যায় যে, রাধারমণ চুপ করে বসে থাকার লোক ছিলেন না। মনে হয়, তিনি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কাজে কিংবা শ্রমিক-আন্দোলনে বেশ কিছুকাল হয়তো আগের মতো আর জড়িত ছিলেন না, কিন্তু তিনি যে ক্রমশ বৌদ্ধিক আলোচনা ও মননচর্চায় নিমগ্ন হতে থাকেন, এ-কথা অনেক অগ্রজের কাছেই শুনেছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ২৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) 'গণশক্তি' পত্রিকায় লিখেছেন, ১৯৩৬-৩৭ সালে রাধারমণ-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। এই সময় তিনি বিভিন্ন স্থানে বিশিষ্ট বিদ্বজ্জনের সঙ্গে রাধারমণকে 'বহু আলোচনায় জমে থাকতে' দেখেছেন। ১৯৩৬ সালে গঠিত বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর সঙ্গে রাধারমণ একই বাড়িতে কিছুকাল একত্রে বাস করেছেন, একথাও জানিয়েছেন শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়।

আমার ধারণা, রাধারমণ ১৯৩৭-৩৮ সালের মধ্যে এইসূত্রে প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এটাও শুনেছি, এই সময় তিনি নিজের উদ্যোগে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীকে মার্কসবাদে দীক্ষিত করেন। এমনি ধরনের একটি দৃষ্টান্ত গত ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) 'গণশক্তি'-র পৃষ্ঠায় পরিবেশন করেছেন সি. পি. আই (এম)-এর প্রবীণ নেতা সুধাংশু দাশগুপ্ত [দ্র. 'কমরেড রাধারমণ মিত্র স্মরণে']। তিনি লিখেছেন, 'রাধারমণবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় অধ্যাপক নীরেন রায়ের মাধ্যমে।...নীরেনবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৩৮-এর মধ্যভাগে। সে সময়ে নীরেনবাবুর ৪৬/৭-এ বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে রাধারমণবাবু ও নীরেনবাবু একসাথে মার্কসবাদী তত্ত্বের বই পড়তেন—পড়তেন রুটিন করে। রাধারমণবাবুই নীরেনবাবুকে মার্কসবাদী তত্ত্ব অধ্যয়নে উৎসাহিত করেন। সেই অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে রাধারমণবাবুই নীরেনবাবুকে মার্কসবাদী করে তোলেন।'

[দ্র. পূর্বোক্ত নিবন্ধ, গণশক্তি, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২]

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফ্যাসিস্ট-দানব হিটলার বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইয়োরোপের দেশগুলিতে। কিন্তু তার আসল লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নকে চূর্ণবিচূর্ণ করা। এই উদ্দেশ্যে ফ্যাসিস্ট-দস্যু হিটলার ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত দেশ আক্রমণ করে। এই সংবাদ ঘোষিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, স্নেহাংশুকান্ত আচার্য ও জ্যোতি বসু অতিক্রত নাকি রাধারমণ মিত্রকে এই দুঃসংবাদটি জানান। হীরেনবাবু লিখেছেন, রাধারমণকে সংবাদটি জানাবার পর তিনি চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলেন: 'কোথায় তলিয়ে যাবে আমাদের স্বাধীনতার লড়াই যদি সোভিয়েত দেশ ধ্বংস হয়ে যায়।'

[দ্র. হীরেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত নিবন্ধ, গণশক্তি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২]

যাহোক, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সপক্ষে জনমত গঠনের জন্য হীরেনবাবুরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন। হীরেনবাবুর বক্তব্য থেকে জানা যায়, রাধারমণ মিত্রও হন তাঁদের সহযাত্রী। একমাসের মধ্যে ১৯৪১ সালের ২১ জুলাই 'সোভিয়েত-দিবস' উপলক্ষে কলকাতার 'টাউন হল'-এ বাঙলার শ্রমিক-কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশাল জনসভা হয়। সাংবাদিকপ্রবর সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভা থেকেই গঠিত হয় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি।'

[দ্র. ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা', সুস্নাত দাশ, পৃ. ১২৮]

এই সভার যে-প্রতিবেদন ১৯৪১ সালের ৩১ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, সদ্য-গঠিত এই সমিতির সাংগঠনিক কমিটিতে স্থান পেয়েছেন বাঙলার সমাজজীবনের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হয়েছেন সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশুকান্ত আচার্য যুগ্ম-সম্পাদক, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কোষাধ্যক্ষ এবং মনোরঞ্জন রায়, ধীরেন ধর আর সুনীল সেন নির্বাচিত হয়েছেন সহ-সম্পাদক। কমিটির সদস্য-তালিকায় আছে বাঙলার বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাসহ ২২ জন শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর নাম। এই কমিটির সদস্য-তালিকায় কিন্তু রাধারমণ মিত্র-র নামটি নেই।

অথচ আমরা জানি, সোভিয়েত সুহৃদ সমিতিতে নিরলসভাবে কাজ করার মধ্য দিয়েই রাধারমণ মিত্র সম্ভবত ১৯৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অর্জন করেন। তাঁর প্রিয় বন্ধু অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়, যাঁকে তিনি মার্কসবাদে দীক্ষা দিয়েছিলেন—তিনি কিন্তু তাঁর আগেই, খুব সম্ভব ১৯৪২ সালে, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এ-সম্পর্কে রাধারমণ নিজেই এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'পার্টি তখন বে-আইনী। পার্টি সভ্য হিসাবে তখনো যোগ দিইনি। অনেককেই মার্কসবাদ পড়িয়েছি। আমার বাল্যবন্ধু অধ্যাপক নীরেন রায়ও অনেকদিন আমার কাছে মার্কসবাদ পড়েছেন। একদিন মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বললেন, নীরেন রায় পার্টিতে যোগ দিলেন অথচ তাঁর গুরু আসেন না কেন? হিটলার যখন সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করল তখন গড়ে উঠল 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'। এই সংগঠনে কাজ করতে থাকি। এ সময়ই আমি পার্টিতে আসি।' [দ্র. দেশহিতৈষী, শারদ-সংখ্যা, ১৯৮৬]

রাধারমণ কোনো পদের জন্য কোনোকালে লালায়িত ছিলেন না। এসব ঘটনা তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। তিনি যে-কাজ করা শুভ বলে মনে করেছেন, নিঃস্বার্থভাবে তা করতে কোনো দিন দ্বিধা করেন নি। আমার নিশ্চিত ধারণা, যতদিন তিনি মনের দিক থেকে সাড়া পাননি, ততদিন পর্যন্ত গ্রহণ করেননি পার্টির সদস্যপদ। আবার যেদিন তিনি মনে করেছেন পার্টি-সদস্যপদ আঁকড়ে থাকার আর কোনো প্রয়োজন নেই, সেইদিন—অর্থাৎ ১৯৫২ সালের কোনো এক মুহূর্তে তিনি নিঃশব্দে সরে এসেছেন পার্টি-সদস্যপদের মায়া কাটিয়ে। এ-প্রসঙ্গে পুনর্বার বলতে বাধ্য হচ্ছি—তাঁর মৃত্যুর পর 'গণশক্তি'

সহ বিভিন্ন সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে, তিনি নাকি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৩৮ সালে। 'কালান্তর' লিখেছে ১৯৩৯ সাল। এর কোনোটাই যে সত্য নয়, তা বোধ হয় না বললেও চলে।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ গ্রহণের আগে রাধারমণ কোনো পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন কিনা সে-সম্পর্কে আমি এখনো নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না। তাঁর বন্ধু নীরেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩১ সালে যখন 'পরিচয়' সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় তখন তো তিনি মীরাট কমিউনিস্ট-ষড়যন্ত্র-মামলায় বন্দী। ১৯৩৩ সালের শেষে রাধারমণ যখন বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে কলকাতায় এলেন তখন তাঁর ধ্যান-জ্ঞান হয় মার্কসীয় তত্ত্বের অনুশীলন। ১৯৩৮-৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রাক্কালে রাধারমণ প্রগতি লেখক সংঘের সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর সাহচর্যে প্রগতি লেখক সংঘের ঘনিষ্ঠ দরদী এবং সেই সূত্রে 'পরিচয়'-এর আড্ডাতেও যাতায়াত করছেন, এ সংবাদও আমরা জানতে পারছি। কিন্তু সেই সময় 'পরিচয়'-এর আর্থিক সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। সুধীন্দ্রনাথ ও নীরেন্দ্রনাথ—'পরিচয়' পত্রিকার এই দুই স্তম্ভ তখন নানা কারণে 'পরিচয়' পরিচালনা ও সম্পাদনায় আগের মতো আর সময় দিতে পারছিলেন না। এই সময় যুগ্ম-সম্পাদক রূপে হিরণকুমার সান্যাল ও প্রকাশক রূপে কুন্দভূষণ ভাদুড়ী পালন করছিলেন 'পরিচয়' পরিচালনার সমগ্র দায়-দায়িত্ব। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে রাধারমণকে দিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকায় কেউ কিছু লিখিয়েছিলেন বলে তো মনে হয় না। বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে 'অগ্রণী' নামে একটি মাসিক পত্রিকাও এই সময় প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৪০ সালের জুন—দেড় বছরই মাত্র ছিল এর আয়ুষ্কাল। আমি সত্তরের দশকের গোড়ায় 'অগ্রণী'র সব সংখ্যাই খুঁটিয়ে দেখে একটি আংশিক সূচিপত্র রচনা করেছিলাম। আমার সম্পাদিত এবং সদ্য-প্রকাশিত 'বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা' নামক গ্রন্থে সেই আংশিক সূচিপত্রটি সংযোজিত হয়েছে [দ্র. উক্ত গ্রন্থভুক্ত সুস্নাত দাশ রচিত প্রবন্ধ—'প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কয়েকটি সাময়িকপত্রের ভূমিকা', পৃ ৪৫২-৪৫৫]। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, এখানেও রাধারমণ মিত্র-র কোনো লেখা উল্লেখিত হয়নি। বিষয়টি অনুসন্ধানযোগ্য হলেও আমার ধারণা, পার্টি-সদস্যপদ গ্রহণের পরে এবং ১৯৪৩ সালের শেষদিকে 'পরিচয়' পত্রিকার স্বত্ব-স্বামীত্ব

কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক কর্মীদের হাতে হস্তান্তরিত হলে, গোপাল হালদার ও হিরণকুমার সান্যাল সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রগতি-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের অনুরোধেই সম্ভবত রাধারমণ প্রথম লিখতে শুরু করেন।

আমার কাছে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত 'পরিচয়' পত্রিকার সবগুলি সংখ্যা নেই। তবে ১৯৪৪ সাল থেকেই আমি 'পরিচয়' পত্রিকার একনিষ্ঠ নিয়মিত পাঠক। আমার কাছে পুরনো 'পরিচয়'-এর যেসব সংখ্যা এখনও সংরক্ষিত আছে তা উল্টাতে বসে দেখতে পাচ্ছি, ১৩৫২ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায়, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে রাধারমণ লিখেছেন এদেশে 'বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার প্রবর্তক', যে-মনীষীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ নিবেদন করেছিলেন অকুণ্ঠ সম্মান, সেই বিস্মৃতপ্রায় স্বনামধন্য পুরুষ 'রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র' শীর্ষক এক অসাধারণ গবেষণামূলক প্রবন্ধ। এরপর ঐবছর, অর্থাৎ ১৩৫২ সালের শারদীয় সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায়, রাধারমণ আবার খুবই যোগ্যতার সঙ্গে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-র 'Studies in Indian Social Polity' গ্রন্থকে ভিত্তি করে লিখেছিলেন "জাতি-সমস্যা বিচার" নামে ১০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এক পর্যালোচনা-মূলক নিবন্ধ। এই নিবন্ধটি পাঠ করলেও উপলব্ধি করা যায় তাঁর বহুব্যাপ্ত পাণ্ডিত্য এবং মনীষার দীপ্তি। এর প্রায় দেড় বছর পরে দেখছি রাধারমণ ১৩৫৩ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'পরিচয়'-তে 'অভিযাত্রী' চলচ্চিত্রটি নিয়ে এক নাতিদীর্ঘ মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। এটি ছিল 'উদয়ের পথে'-খ্যাত কাহিনীকার ও চিত্রপরিচালক জ্যোতির্ময় রায়-এর দ্বিতীয় ছবি। চলচ্চিত্রের আঙ্গিক সম্পর্কে তিনি 'আনাড়ি' একথা স্বীকার করে নিয়েই বলেন, 'বিষয়-বস্তুর গৌরবে যে-কোনো আর্ট বড় আর্ট হয়ে উঠতে পারে।' সেইদিক থেকে 'অভিযাত্রী' একখানি 'উঁচু দরের ছবি হয়েছে' শুধু নয়, হয়েছে 'অপূর্ব ছবি'। তিনি তুলনামূলক আলোচনা করে দেখিয়েছেন, পূর্ববর্তী ছবিগুলি থেকে 'উদয়ের পথে' যত অগ্রসর, 'উদয়ের পথে' থেকে 'অভিযাত্রী-ও ততখানি অগ্রসর। প্রথম জীবনে নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী এবং ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী কমিউনিস্ট-সদস্য রূপে পরিচিত রাধারমণ মিত্র চলচ্চিত্র নিয়ে আলোচনা করছেন, একথা আজ ক'জনই বা ভাবতে পারেন! আমার ধারণা, 'যা-কিছু মানবিক তাকে গ্রহণ করো'—মার্কসীয় এই প্রত্যয় একদা সাচ্চা কমিউনিস্টরা মান্য করতেন বলেই চলচ্চিত্রের পর্যালোচনা করতেও রাধারমণ দ্বিধা বোধ করেন নি। আবার, প্রায় চার মাস পরে দেখছি রাধারমণ

১৩৫৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'চিহ্ন' উপন্যাসের অনুপুঙ্খ এক সমালোচনা। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'আগেকার naturalism মরতে বসলেও, এখনও একেবারে মরে নি—তার রেশ তাঁর অন্তরে এখনও একটু-আধটু রয়েছে।' তিনি মনে করেন, মানিকবাবুর অন্তর্বিপ্লব শুরু হয়েছে এবং তার সমাপ্তিও বেশি দূরে নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বলেন, " 'চিহ্ন' একাধারে অতীতের স্মৃতিচিহ্ন ও ভবিষ্যতের সঙ্কেত-চিহ্ন'। 'চিহ্ন' কলকাতার রাজপথের ইতিহাসের রক্তাক্ত পদচিহ্ন'।"

আমি এখানে লেখক রূপে রাধারমণ-এর বিচিত্রমুখী মননচর্চার কয়েকটি দৃষ্টান্তই শুধু তুলে ধরলাম। 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর আরও দু-একটা প্রবন্ধ-নিবন্ধ এবং পুস্তক-সমালোচনা হয়তো প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর মতো প্রতিভাধরের পক্ষে এই অবদান সত্যিই খুব অকিঞ্চিৎকর।

এছাড়া রাধারমণ ছিলেন প্রকৃতই এক বাগ্মী পুরুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান না-হওয়া পর্যন্ত তিনি যেমন ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন, তেমনি পার্টির সদস্যভুক্ত হওয়ার পর কমিউনিস্ট কর্মীদের মার্কসবাদী তত্ত্বে প্রশিক্ষিত করার জন্যও তিনি পালন করেছিলেন এক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। এই সময় তিনি নানা আলোচনাচক্রে নানা বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন। এমনি ধরনের আলোচনা-সভায় তাঁর দু-একটি বক্তৃতা পুরনো দিনের নেতা ও কর্মীদের মনে আজও স্মরণীয় হয়ে আছে।

চল্লিশের দশকের বাঙলার প্রগতি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল ৪৬ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। চল্লিশের দশকে এই বাড়িতেই অবস্থিত ছিল সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি, ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, গণনাট্য সংঘ এবং 'পরিচয়' পত্রিকার অফিস। তখন একমাত্র বনফুল, সজনীকান্ত ও সুবোধ ঘোষ ছাড়া আর প্রায় সব খ্যাতিমান প্রবীণ ও নবীন শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি-নাট্যকার, গায়ক ও বুদ্ধিজীবী এই বাড়িটি থেকে উৎসারিত চল্লিশের দশকের সেই সমাজবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ নতুন সাংস্কৃতিক নবজাগরণে কম-বেশি শামিল হয়েছিলেন। রাধারমণ ছিলেন এই কর্মযজ্ঞে বৌদ্ধিক চেতনা প্রসারের অন্যতম এক প্রধান হোতা।

এই প্রচেষ্টারই অঙ্গীভূত কার্যক্রম রূপে ছেচল্লিশ নম্বর ধর্মতলা স্ট্রীটে আয়োজিত 'বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে' রাধারমণ মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত ভূতপূর্ব

এক বক্তৃতার কথা স্মরণ করেছেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। হীরেনবাবু লিখেছেন, রাধারমণ 'একবার সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতির অফিসে (৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীট) আট-দশদিন ধরে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা বক্তৃতা করে গেলেন। ঘর ভর্তি শুধু নয়, আনাচে কানাচে এবং বাইরে পর্যন্ত ভিড়। সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছেন সেই অভূতপূর্ব বক্তৃতা-মালা।...বক্তার কোনো 'নোটস' নেই, কেবল অনর্গল বলে গিয়েছেন।'

[দ্র. গণশক্তি, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২]

এই স্মরণীয় বক্তৃতার কথা আমিও বহুবার শুনেছি আমার অগ্রজপ্রতিম কোনো কোনো সহযোদ্ধার মুখে। হীরেনবাবু মোটের উপর ঠিকই বলেছেন, তবে তাঁর শিথিল স্মৃতিচারণায় ঘটনাটি একটু অতিরঞ্জিত হয়েছে মাত্র। এ-সম্পর্কে সঠিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন প্রগতি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশ। ১৯৫৮ সালের শারদীয় সংখ্যা 'আন্তর্জাতিক' পত্রিকায় ঐতিহাসিক ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটকে কেন্দ্র করে যেসব সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছিল তার এক তথ্যনিষ্ঠ মনোজ্ঞ বিবরণ চিনুদা তুলে ধরেছিলেন '৪৬নং' শীর্ষক তাঁর এক দীর্ঘ প্রবন্ধে। আমার ধারণা, সেই প্রবন্ধের মধ্যে তিনি রাধারমণ মিত্র কর্তৃক প্রদত্ত স্মরণীয় বক্তৃতাটির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন সেটাই প্রামাণিক। কারণ, ঘটনা ঘটার মাত্র ১২/১৩ বছর পরেই এটি লেখা হয়েছিল। তখন চিনুদার বয়স পঞ্চাশ পার হয়নি, তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল খুব সজীব। যাহোক, চিন্মোহন লিখেছিলেন, '...রাধারমণ মিত্র মহাশয় 'প্রাক্-মুসলিম বাঙলা' সম্পর্কে ছ'দিন ধরে যে তথ্য-সমৃদ্ধ ও চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা করেন তাতে যোগদানের জন্য দর্শনীর ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রতিদিনই ঘর ভরে যেত পুরোপুরি। আর তিন, সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে সবাই উদগ্রীব হয়ে শুনতেন রাধারমণবাবুর বক্তৃতা।' [দ্র. ৪৬নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, চিন্মোহন সেহানবীশ, পৃ. ১৩]

প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা সুধাংশু দাশগুপ্তও এই বক্তৃতা-প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'আটটি লেকচারে রাধারমণবাবু 'বাংলার ইতিহাস' পর্ব শেষ করেছিলেন। সে বক্তৃতা শোনার জন্য অসম্ভব ভিড় জমেছিল। পার্টির তৎকালীন প্রাদেশিক সম্পাদক ভবানী সেন ছাত্র হিসাবে মুগ্ধ হয়ে সে বক্তৃতা শুনেছিলেন। কোনো-রকম নোট ছাড়াই 'বাংলার ইতিহাস' তিনি বর্ণনা করেছিলেন অসাধারণ দক্ষতায়। তাঁর স্মৃতিশক্তি যে অত্যন্ত প্রখর ছিল তার সাক্ষ্য বহন করেছিল সেদিনকার লেকচার।' [দ্র. গণশক্তি, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২]

অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ ৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) 'গণশক্তি' পত্রিকার প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, '১৯৫০ সালে ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে প্রগতি লেখক সংঘেরএক সভায়'...রাধারমণ নাকি 'কলকাতা নিয়ে'... '৮-১০টি বক্তৃতা রেখেছিলেন'। ১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির অতিবামপন্থী হঠকারী নীতির ফলে চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় যখন আন্তঃপার্টি সংগ্রামের নামে আমরা উগ্র ব্যক্তি-বিদ্বেষে জর্জরিত তখন ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে 'কলকাতা নিয়ে' বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা কি সত্যিই সম্ভব ছিল? সেই রাজনৈতিক দুর্যোগের মধ্যেও ১৯৫০ সালে যে-কয়জন প্রায় প্রতিদিন ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে যেতেন আমি ছিলাম তাঁদেরই একজন। আশা করি নরহরিবাবুরও তা স্মরণে আছে। আমার স্মৃতিশক্তি এখনো যথেষ্ট সজাগ থাকা সত্ত্বেও নরহরিবাবু-বর্ণিত ঘটনাটির কথা আমি কিন্তু আদৌ স্মরণ করতে পারছি না। আমার বিশ্বাস, নরহরিবাবু হয়তো রাধারমণ-এর পূর্বোক্ত বক্তৃতার কথা স্মরণ করতে যেয়েই এই বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন, নয়তো ঘটনাটি ঘটেছে ১৯৫০ সালের পরে, যখন আমি আবার ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী।

মোটকথা, রাধারমণ যে এক অসামান্য মানুষ ছিলেন এইসব ঘটনা থেকে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। এই অসামান্য মানুষটিই ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে প্রগতি লেখক সংঘের মধ্যে যখন ফরাসী দেশের কমিউনিস্ট-লেখক রজের গারোদি, পিয়ের এরভে এবং লুই আরাগঁর শিল্প-সাহিত্য-সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে জোর বিতর্ক চলছিল তখন পালন করেছিলেন এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রজের গারোদির মত হলো: 'আর্টের ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টির লাইন বলে কোনো বস্তু নেই; শিল্পীর পক্ষে কোনো লাইন না মেনে নিজের মতো চলাই সঙ্গত।' এরভের বক্তব্য ছিল: 'কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব (aesthetics) বলে কোনো পদার্থ নেই; আর্টের ক্ষেত্রটি সমালোচক নিছক ব্যক্তি হিসেবেই নন্দনতাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিচার করতে পারেন।' আর, লুই আরাগঁ দৃঢ়ভাবে জানিয়েছিলেন: 'নন্দনতত্ত্বকেও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে নিতে হবে। এটা না-মানার অর্থ হলো—শ্রেণীসংগ্রামে শিল্পের দায়িত্বকেই প্রায় অস্বীকার করা।'

সেদিন প্রগতি লেখক সংঘের মধ্যে বিষ্ণু দে ছিলেন গারোদি ও এরভের বক্তব্যের প্রধান প্রবক্তা। কমিউনিস্ট সদস্যদের মধ্যে বিষ্ণুবাবুর মতকে মোটের উপর সমর্থন করেছিলেন—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সহযাত্রী লেখকদের মধ্যে তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায় ও জ্যোতির্ময় রায়-ও ছিলেন এই মতের পক্ষে। লুই আরাগঁর মতের প্রধান প্রবক্তা অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, অনিল কাঞ্জিলাল, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, অনিল সিংহ প্রমুখ লেখকেরা। এই বিতর্ক এমন প্রবল এবং উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছিল যে, শেষ পর্যন্ত পার্টি-নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে তা অসমাপ্তভাবেই শেষ হয়। [দ্র. মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত পৃ. পঁয়ষট্টি সাতষট্টি]

অত:পর ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেস থেকেই রাধারমণ মিত্র নির্বাচিত হন 'কণ্ট্রোল কমিশন'-এর সদস্য। এটি কমিউনিস্ট পার্টির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী একটি সর্বোচ্চ কমিটি। এর সদস্যপদটিও খুব সম্মানজনক। দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় অতি-বামপন্থী হঠকারী এক নীতি। সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন এবং এক লাফে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করার ফলে ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়। এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির উপর নেমে আসে দমন-নীতির স্টীমরোলার। সেই দুর্যোগময় ঝোড়ো দিনগুলিতেও রাধারমণ অবিচলভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কাজ ও তার উপর ন্যস্ত দায়-দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছেন। এই সময় প্রকাশিত হয় বেআইনী পার্টির তাত্ত্বিক মুখপত্র- মার্কসবাদী'। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'মার্কসবাদী'-র পঞ্চম সংকলনে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধে রবীন্দ্র গুপ্ত ছদ্মনামে পার্টির তৎকালীন পলিটব্যুরো-র সদস্য ভবানী সেন যে কালাপাহাড়ী মনোবৃত্তি থেকে আমাদের অতীত দিনের প্রায় সব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসহ রবীন্দ্রনাথকেও বর্জন করার আহ্বান জানান, রাধারমণ তা গ্রহণ করতে পারেন নি। এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে তাঁর বন্ধু অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় যখন একটি প্রবন্ধ রচনা করছিলেন, শুনেছি নীরেন্দ্রনাথ রায়-এর সেই কাজে রাধারমণ সহায়তা ও সমর্থন জানিয়েছিলেন। মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদী রাধারমণ-এর পক্ষে এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অতি-বামপন্থী হঠকারী বিচ্যুতির ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের পথে চলতে থাকে। কিন্তু রাধারমণ দীর্ঘকাল নানা বিপজ্জনক ও ক্লেশদায়ক পথ পাড়ি দিয়ে এসে যখন রাজনীতি করা কম বিপজ্জনক এবং কিঞ্চিৎ মসৃণ তখন স্বেচ্ছায় বর্জন করলেন কমিউনিস্ট পার্টির

সদস্যপদ। অথচ এই সময়ে তিনি ছিলেন পার্টির 'কন্ট্রোল কমিশন'-এর সম্মানিত সদস্য। ১৯৫২ সালে কী কারণে এই ঘটনা ঘটলো তা আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। পুরনো দিনের কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে কেউ যদি এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন তাহলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের গবেষকেরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। রাধারমণ কেন পার্টি-সভ্যপদ ছেড়ে দিলেন, ১৯৮৬ সালে 'দেশহিতৈষী' পত্রিকার রিপোর্টার তাঁকে এ প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেনঃ 'আমি এ-সম্বন্ধে কিছু বলব না। কেন পার্টি সভ্যপদ ছাড়লাম তা একটি মাত্র লোক জানতেন, তিনি প্রয়াত ভবানী সেন। তিনিই জানতেন এবং বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন। তিনি মারা গেছেন। আমি কিছু বলব না।' [দ্র. দেশহিতৈষী, শারদসংখ্যা, ১৯৮৬]

এই বক্তব্য জানার পর আমার মনে একটি সংশয় প্রবল হয়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ গবেষণার স্বার্থে আমার সেই অনুমান-ভিত্তিক সংশয় আজ শুধু ব্যক্ত করতে পারি মাত্র। কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেনকে নিয়ে সেই সময় পার্টির অভ্যন্তরে এমন কি কিছু ব্যাপার ঘটেছিল যা রাধারমণ-এর পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয়নি? আমরা জানি, ১৯৪৮-৫০ সালে ভবানী সেনই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশলের অন্যতম প্রধান নির্ধারক। সেই নীতি ভ্রান্ত প্রমাণিত হলে ভবানী সেনকে গুরুতর শাস্তি দেওয়া হয়। তাঁকে পার্টির ও গণসংগঠনের সব উচ্চপদ থেকে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ সদস্য রূপে কৃষক সমিতিতে কাজ করার নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছিল। সর্বক্ষণের কর্মী রূপে ভবানীবাবু যে-সামান্য ভাতা পেতেন তাও নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য হিসেবে রাধারমণ হয়তো এতখানি শাস্তির বোঝা ভবানী সেন-এর মতো আদর্শবাদী নেতার উপর চাপাতে চাননি। কিংবা, পরবর্তীকালে ভবানী সেনকে ভাতে-মারার মতো অমানবিক নিষ্ঠুর আচরণ বরদাস্ত করতে না পারার জন্যই কি রাধারমণ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলেন পার্টির সদস্যপদ? পার্টি-সদস্যপদ ত্যাগের সঙ্গে রাধারমণ ভবানীবাবুর নাম জড়ানোর ফলেই আমার মনে উদ্ভূত হয়েছে এইসব সংশয়ের কাঁটা। সংশয় ঘুচিয়ে কে-যে এর সদুত্তর দেবে, তা জানিনে।

যাহোক, এরপর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিশ বছর রাধারমণ কমিউনিস্ট পার্টির কোনো দৈনন্দিন রাজনীতির সঙ্গে আর সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন না। সাধারণভাবে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতিই তাঁর সহানুভূতি অক্ষুণ্ন ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হয়ে গেলেও (১৯৬৪ সালে) এর কোনো ব্যতিক্রম

ঘটছে বলে মনে হয়নি। সব কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি এবং সেই পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁর পরিচিত নেতা ও কর্মীদের প্রতিও বর্ষিত হতে দেখেছি রাধারমণ-এর দরদ ও ভালোবাসা। আর, যেহেতু তিনি ছিলেন স্পষ্ট বক্তা সেইহেতু কোনো পার্টির কোনো বক্তব্য অথবা কোনো পার্টি-নেতৃত্বের আচরণকে অসঙ্গত ও অন্যায় মনে করলে তিনি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে এবং তিরস্কার জানাতেও কসুর করেন নি। এমনি ধরনের দু-একটি ঘটনার আমি অন্তত প্রত্যক্ষদর্শী ও শ্রোতা। সুতরাং কোন কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর অনুরাগ বেশি ছিল, এ সব কথা একেবারেই অবান্তর।

এবার আমরা প্রবেশ করতে পারি রাধারমণ-এর জীবনের অন্য এক পর্বে। পার্টি-সদস্যপদ ত্যাগ করার পর তিনি ১৯৫৫ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের চাকরি-জীবন থেকেও অবসর গ্রহণ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, মীরাট-মামলা মিটে যাওয়ার পর রাধারমণ স্কুলের শিক্ষকতায় আর ফিরে যেতে পারেন নি, গ্রহণ করেছিলেন কর্পোরেশনের স্টোর-বিভাগে নতুন চাকরি। যাহোক, অবসর গ্রহণের পর এখন এই নিঃসঙ্গ মানুষটি কীভাবে সময় কাটাবেন? ইতি-কর্তব্য নির্ধারণ করতে রাধারমণ-এর বেশিক্ষণ লাগেনি। ঘটনাটি এইরকম :

১৯৩৮ সালে সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকায় ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্তি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধটি পড়ে রাধারমণ-এর মনে কিছু বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়। সুতরাং তিনি ঐ বিষয় নিয়ে পড়াশুনা ও ভাবনা-চিন্তা শুরু করেন। তাঁর মনে হয়—'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে সুনীতিবাবুর সিদ্ধান্ত ভুল, তাছাড়া আনুষঙ্গিক আরও অনেক বক্তব্যও সঠিক নয়। তিনি তাঁর কর্মজীবনের ফাঁকে কিছু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করলেও সুনীতিবাবুর যুক্তিকে খণ্ডন করার পক্ষে তা পর্যাপ্ত ছিল না। এইবার অবকাশ জীবনে সেই কাজে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োগ করলেন। কলকাতা মহানগরী পথ আর অলিগলি, বাড়ি-ঘর, ব্যক্তি ও পরিবার, নানা প্রতিষ্ঠান, স্মরণীয় সৌধ ও ধর্মস্থান, যোগাযোগ ও যানবাহন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নানা প্রাসঙ্গিক বিষয় জানার জন্য তিনি হয়ে উঠলেন অক্লান্ত এক পদাতিক-গবেষক। দিনের পর দিন তিনি পায়ে হেঁটে নিজের চোখে সব কিছু দেখেছেন, সংগ্রহ করেছেন বিপুল পরিমাণ তথ্য, সেগুলি নানা দুষ্প্রাপ্য পুঁথিপত্র, তথ্যদলিল ও প্রামাণিক গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে দীর্ঘকালের শ্রমসাধ্য গবেষণার ফসল রূপে " 'কলিকাতা' নামের ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ১৩৭৬ সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'এক্ষণ' পত্রিকায়

একে একে খণ্ডন করেছেন অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-এর যুক্তিজাল। এই প্রবন্ধটি পড়লে যে-কোনো পাঠকই বুঝতে পারবেন রাধারমণ-এর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার যুক্তিবিন্যাসের পরিশীলিত নৈপুণ্য। অনুরূপ ভাবেই রাধারমণ খণ্ডন করেছিলেন ডঃ সুকুমার সেন এবং বিনয় ঘোষ-এর কলকাতা বিষয়ক নানা মতামত। সম্ভবত দুটি বাদে কলকাতা-বিষয়ক তাঁর সবগুলি প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত 'এক্ষণ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়।

রাধারমণ মিত্র-র গবেষণা-লব্ধ সেই সম্পদগুলি মোট ১৩টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়ে 'কলিকাতা-দর্পণ' নামক অতুলনীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থই রাধারমণকে অমর করে রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। 'কলিকাতা-দর্পণ'-এ মুদ্রিত প্রবন্ধগুলি লিখতে সময় ব্যয় হয়েছে মোট ১১ বছর, আর ৮৫ বছর বয়সে রাধারমণ হয়েছেন গ্রন্থকর্তা। কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশনা-জগতের কোনো কর্মকর্তাই গ্রন্থটি প্রকাশে এগিয়ে আসেন নি, তবু এই গ্রন্থখানিই সাহিত্য আকাদেমি, বিদ্যাসাগর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুধা পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। এছাড়া রাধারমণ মিত্র-র উল্লেখযোগ্য অন্যান্য গ্রন্থ হলো ঃ লাইফ অব ডেভিড হেয়ার, কলকাতায় বিদ্যাসাগর এবং কলকাতার তিন মনীষী। যাদবপুর ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে প্রদান করা হয় সাম্মানিক ডি. লিট।

নিম্নবিত্ত সমাজের নিঃস্ব একজন মানুষ আবাল্য যে-প্রতিভাবলে বড় হয়ে উঠেছেন, আকৈশোর যিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র, দিলীপকুমার, বঙ্কিম মুখার্জি, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ বাঙলার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনে যৌবনে যিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার সংগ্রামে, যাঁর কুসংস্কারমুক্ত মন, যুক্তিবাদী চেতনা, ঋজু দৃঢ় ব্যক্তিত্ব আদায় করে নিয়েছিল গান্ধীজীর মতো মহান নেতার সস্নেহ সমীহ আর শ্রদ্ধা, যিনি ছিলেন শ্রমিক-আন্দোলনের অগ্রপথিক এবং এদেশে মার্কসীয় মতাদর্শ ও চিন্তা-চৈতন্য প্রসারের অগ্রদূত, যাঁর অধীত বিদ্যা আর নিরভিমান পাণ্ডিত্য ছিল তুলনাহীন, প্রথাসিদ্ধ গবেষণার বাইরে দাঁড়িয়ে যিনি উন্মোচন করেছেন নতুন এক গবেষণার পথ, যিনি আমৃত্যু যাপন করেছেন সৎ ও আদর্শনিষ্ঠ জীবন—সেই অসামান্য মানুষটি আমাদের নিঃস্বতর করে ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ৯৬ বছর বয়সে পঞ্চভূতে বিলীন হলেন।

আসুন, এই অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের অশরীরী স্পর্শ অনুভব করার জন্য

আমরা আজ ক্ষণকাল নীরবে নতজানু হই, আর পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে অনুরোধ করি রাধারমণ মিত্র-র নামে কলকাতা-বিষয়ক একটি গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ঃ

১. Modern India, Sumit Sarkar.
২. আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।
৩. বাঙলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, রণেন সেন।
৪ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, সরোজ মুখোপাধ্যায়।
৫, ৪৬ নং : একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন, চিন্মোহন সেহানবীশ।
৬. পরিচয়-এর আড্ডা, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ।
৭. বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, ডঃ পঞ্চানন সাহা।
৮. মুক্তির সন্ধানে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত।
৯ মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত।
১০. কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি স্মারকপত্র, ১৯৭৫।
১১ ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা, সুস্নাত দাশ।
১২. কলিকাতা-দর্পণ, রাধারমণ মিত্র।
১৩. পরিচয়, ভাদ্র, ১৩৫২ ; ১৪, ঐ, শারদীয়, ১৩৫২ ; ১৫, ঐ ফাগুন, ১৩৫৩ ;
১৬. ঐ, আষাঢ়, ১৩৫৪।
১৭. পরিচয়, শারদীয় সংখ্যা, ১৯৮৬।
১৮. দেশহিতৈষী, শারদসংখ্যা, ১৯৮৬।
১৯. গণশক্তি, ৮ ফেব্রুয়ারি ও ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
২০. কালান্তর, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।

রাধারমণ মিত্র স্মরণে

এ ভুবন এ জীবন অসমাপ্ত আর উদাসীন—
সেই পরিচয় মানি তবু জানি তার রাত্রিদিন
প্রত্যহের পাতা থেকে স্খলিত একটি জীবনের
বিষণ্ণ শূন্যতা থেকে মুক্তি নেই এই সংসারের,
যেখানে সে প্রবীণতা বুদ্ধি গাঢ় স্নেহের স্নিগ্ধতা
নারিকেল ফলবান, কঠিনে মিশানো কোমলতা
পরিচ্ছন্ন জ্ঞানযোগ, সংসারের মলিন সঙ্কট
স্পর্শ তাঁরে করেনিক' একান্তই শুভ্র অকপট ॥

এ মহৎ শূন্যতারে স্মরণ করার পুণ্য কাজে
আত্মীয় বিয়োগ-ব্যথা অশ্রুর অশ্রুত স্বরে বাজে
আশ্চর্য জীবনস্পর্শে জীবনের মহৎ গৌরব,
পরিচিত এককের ক্লান্তিহীন প্রাণমহোৎসব
আমাদের কাছাকাছি, সাধ্য নাই তারে ভুলবার
ব্যথাহত এ চিত্তের শ্রদ্ধানতি, করি নমস্কার ॥

শোকসন্তপ্ত
গোপাল হালদার
স্নেহধন্যা অরুণা হালদার
১২. ২. ৯২

ওয়ার্কার্স থিয়েটারের 'ভাঙা ডানার শব্দ' ঃ সমসময়ের বিশ্বস্ত দলিল

বহুকাল বাদে সম্ভবত একটি সদ্য-গঠিত নাট্যদল যাত্রারম্ভেই থিয়েটার পাড়ায় বেশ সোরগোল ফেলেই আত্মপ্রকাশ করলো। এটা যে শুধু নাট্য-প্রযোজনার কলাকৌশল সর্বাঙ্গীণ দক্ষতার ফলশ্রুতি—এমনটি বলা যাবে না; বরং আজকের প্রচারসর্বস্ব বিগ মিডিয়ার যুগে এই দলটি শুরু থেকেই চোখ ধাঁধানো চমকপ্রদ পোস্টারে এবং বৃহৎ সংবাদপত্রগুলিতে (প্রাতিষ্ঠানিক ও দলীয়—দু' ধরনের বহুলপ্রচারিত খবরের কাগজেই) বিশাল বিশাল বিজ্ঞাপন দিয়ে গ্রুপ থিয়েটারের দর্শকমহলে এক ধরনের প্রত্যাশার সৃষ্টিও করেছিল। এই বিশাল বিজ্ঞাপনগুলির বেশিরভাগই আবার বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে প্রদত্ত বাস্পনসর্ড অ্যাড। ফলে, গোড়াতেই বুঝা গিয়েছিল—দলটি নবগঠিত হলেও তার সাংগঠনিক ভিত্তি মোটেই কমজোরী নয়, অন্তত কিছু প্রভাবশালী মানুষজন এর পেছনে আছেন। যদিও আজকের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের দাক্ষিণ্যের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে, সিগারেট কোম্পানীগুলি তো গ্রুপ থিয়েটারগুলির প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক হয়ে বসেছে, তথাপি একেবারে সদ্যোজাত একটি নাট্যদল সূচনালগ্নেই এইভাবে একের পর এক স্পনসরার জোগাড় করে ফেলবে এবং তার দৌলতে শুধু প্রারম্ভিক প্রচারের আতিশয্যেই একলাফে সামনের সারিতে চলে আসবে, গ্রুপ থিয়েটার করতে করতে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন—এমন অনেকেও এই আশ্চর্য রহস্যটি ভেদ করতে না পেরে বিস্ময়ে একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। ফলে, চারপাশে নানা কানাকানি, ফিসফিসানি, চাপা কুৎসা ইত্যাদি ফেনিয়ে উঠেছিল। কিছুটা পরশ্রীকাতরতার ভাবও যে ছিল না—তা নয়, তবু সাম্প্রতিক গ্রুপ থিয়েটারের শান্ত নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে বেশ কিছুটা আলোড়ন জাগিয়ে সমকালের মঞ্চে পাদপ্রদীপের বর্ণালী আলোর সামনে এসে হাজির হলো ওয়ার্কার্স থিয়েটার তার 'ভাঙা ডানার শব্দ' নিয়ে।

সাধারণত গোড়া থেকেই প্রচারের ঢাক যেখানে সশব্দে বেজে ওঠে সেখানে একটু সতর্ক হতেই হয়, মনে হয়—প্রচুর প্রত্যাশা নিয়ে হলে ঢুকে শেষ পর্যন্ত না বোকা বনে বসি, বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ার প্রাচীন প্রবচনটি না আবার সত্যি হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশত অমর মিত্রের কাহিনী অবলম্বনে লোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাট্যরূপের এই প্রযোজনাটি আমাদের আশাভঙ্গ ঘটায় নি, অন্তত সারাটাক্ষণ নাটকটি আমাদের উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় টান টান রেখেছে, আর তাছাড়া এই সময়ের কিছু জরুরী কথা স্পষ্ট ভাষায় সে উচ্চারণও করেছে। সম্ভবত সব প্রচারই মিথ্যাশ্রয়ী হয় না, কিছু কিছু প্রচারে সত্যও লুকিয়ে থাকে।

আর একটি দিক থেকেও ওয়ার্কার্স থিয়েটারের এই প্রথম প্রযোজনাটির কিছু গুরুত্ব আছে। একটি বামপন্থী শাসনাধীন প্রদেশের প্রগতিবাদী নাট্যচর্চায় সমকালীন রাজনৈতিক টানাপোড়েনের, তার সমস্যা-সংকট-ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন ঘটবে—এমনটিই প্রত্যাশিত। তাছাড়া দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক থিয়েটার বামপন্থী বাংলার অহংকার। সেই 'নবান্ন'-র যুগ থেকে এমনকি প্রাক্-সাতাত্তরের স্বৈরতান্ত্রিক সন্ত্রাসের সময়েও তীব্র প্রতিবাদী রাজনৈতিক বিষয়বস্তুকে বাংলা নাটকের আঙিনায় দৃঢ়ভাবে বারবার তুলে ধরা হয়েছে, প্রতিপক্ষের রক্তচক্ষুও প্রগতিনাট্যের এই অভিযাত্রাকে দমাতে পারে নি, দর্শকও সে সময়ে সোচ্চারে এবং সোৎসাহে বরণ করে নিয়েছিলেন এই সব প্রতিবাদী নাট্যকর্মকে। কিন্তু সাতাত্তরের পর থেকেই ব্যাপারটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেলো; মঞ্চে আমরা যে-ধরনের বামপন্থী রাজনীতির নাটকীয় উপস্থাপনায় তনুমন সঁপে দিলাম, দর্শক সেই জাতীয় নাটকগুলি সম্পর্কে ক্রমশ আগ্রহ হারাতে লাগলেন। বামফ্রন্ট সরকার গ্রুপ থিয়েটার-গুলির সুস্থ নাট্যচর্চার প্রতি নানাভাবে আনুকূল্য প্রদর্শন করলেন, বলা চলে—এই প্রথম একটি সরকার সরাসরি প্রগতিধর্মী নাট্যদলগুলির প্রতি সহৃদয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন (যদিও ছিদ্রান্বেষী নিন্দুকেরা এই সহযোগিতার ঔদার্যের মধ্যেও স্বজনপোষণ ও দলীয় সংকীর্ণতার গন্ধ খুঁজে পান, তা' নিন্দুকরা তো সর্বত্রই থাকে, তাদের অত গুরুত্ব দিলে কোনো ভালো কাজই করা চলে না!), দানে-অনুদানে-পারিতোষিকে গ্রুপ থিয়েটারগুলির ভাণ্ডার উপচে পড়ছে প্রায়, তথাপি সরকারের হাজার সদিচ্ছা ও সক্রিয় মদত সত্ত্বেও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর নাটক ইদানীং দর্শকদের মোটেই আকর্ষণ করছেনা, বরং বিগত কয়েক বছরে যেকটি গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনা কিছুটা

হলেও দর্শকের সাগ্রহ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তা সে 'নাথবতী অনাথবৎ' 'কথা অমৃত সমান', 'মাধব-মালঞ্চী কইন্যা', 'নিলাম নিলাম' বা 'অলকনন্দার পুত্র-কন্যা'ই হোক, সবগুলিই তথাকথিত অরাজনৈতিক নাটক, বলা চলে—এগুলি এক ধরনের মানবিক মূল্যবোধের নাটক। ফলে, বর্তমানে গ্রুপ থিয়েটারগুলির মধ্যেও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর প্রতি যথেষ্ট অনাগ্রহ দেখা যাচ্ছে, দর্শকদের মতো তাঁরাও ভাবতে শুরু করেছেন—রাজনৈতিক নাটক মানেই পার্টির নাটক, ইদানীং তা পাবলিকে খাচ্ছে না, সুতরাং অন্য ধরনের নাটক বাছা দরকার। এই গুরুতর পরিস্থিতিতে 'ওয়ার্কার্স থিয়েটার'-এর মতো একটি নতুন নাট্যদল একটি আদ্যোপান্ত রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর নাটক মঞ্চস্থ করে তাঁদের দীর্ঘযাত্রা শুরু করলেন—এতে আমাদের মতো বামপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মীরা আশান্বিত হয়ে ওঠেন।

এটাও লক্ষণীয় যে, ওয়ার্কার্স থিয়েটারের এই নাটকে যে-রাজনীতি অভিব্যক্ত হয়েছে তার সঙ্গে সরকারী মদতপুষ্ট গড়পড়তা বামপন্থী রাজনৈতিক নাটকের আসমান-জমিন ফারাক। শাসনক্ষমতাসীন বামপন্থীরা রাজনৈতিক নাটকের যে-সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতে রাজনৈতিক বাস্তবতা মানে প্রাক্-সাতাত্তরের বাস্তবতা—অর্থাৎ, ইন্দিরা-সিদ্ধার্থ রায়ের 'আধা-ফ্যাশিস্ত' সন্ত্রাস; অথবা সাতাত্তর-উত্তর পরিস্থিতি হলো-গ্রামের কৃষকেরা পঞ্চায়েতের সাহায্যে আত্মসচেতন হচ্ছে এবং সংগ্রাম করছে, মানুষের এই সংগ্রাম বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা, অতএব কেন্দ্র দখল ছাড়া পথ নেই। বস্তুত, এই জাতীয় বক্তব্য নাটকের পর নাটকে শুনতে শুনতে দর্শকরা ক্লান্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। কেননা, সমকালীন জীবনের কোনো স্পন্দনই ঐ ছকে বাঁধা ফর্মুলানির্ভর রাজনৈতিক বক্তব্যে ধরা পড়ে না। প্রায় পনেরো বছরের এই বামপন্থী শাসনে একের পর এক কলকারখানা বন্ধ হয়, শ্রমিক কৌটো হাতে রাস্তায় রাস্তায় ভিখিরি হয়ে ঘোরে, পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সর্বত্র কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নামেও দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে, জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া হলেও তাঁর বিরুদ্ধে তেমন জোরালো কোনো আন্দোলন গড়ে ওঠে না এবং এখানেও বানতলা-বিরাটির ঘটনা ঘটে। না, আমাদের প্রায় কোনো বামপন্থী নাটকেই সমসময়ের এই জটিলতাকে স্পর্শ করা হয় না, আমরা সরকারী দাক্ষিণ্যচ্যুত হবার ভয়ে প্রবহমান জীবনের এই স্পন্দনকে আমাদের নাটকে আনি না। ফলে, ঐ স্বৈরতন্ত্র ও কেন্দ্রবিরোধী একঘেয়ে কথাগুলি শোনার চেয়ে দর্শক বেশি আকর্ষিত হন 'মাধব মালঞ্চী

ক্‌ইন্যা'র চটকদার মজায়, মুজফ্‌ফর আহমদ-এর জীবনীনাট্য সুপার ফ্লপ হয় সরকারের অপরিসীম মদত সত্ত্বেও। তারও পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইয়োরোপ আমাদের অনেক বামপন্থী নাট্য ও সাংস্কৃতিক কর্মীর প্রত্যয়েও চিড় ধরিয়েছে, উৎপল দত্ত 'লাল দুর্গ' লিখে সব ঠিক হ্যায় বলে ঘোষণা করলেও সব যে ঠিক ছিল না—এমন সংশয়ে আমরা অনেকেই আচ্ছন্ন হই। বামপন্থার এই দুর্যোগের দিনেও যে ওয়ার্কার্স থিয়েটার নামে একটি দল গড়ে উঠেছে এবং তারা গড়পড়তা ফর্মুলার বাইরে একটি সর্বঅর্থে বামপন্থী রাজনৈতিক নাটক নামিয়েছে—এজন্য অবশ্যই আমরা পুলকিত।

কেন এই নাটকটিকে গড়পড়তা ফর্মুলার বাইরে বামপন্থী রাজনৈতিক নাটক বলছি, তার একটু ব্যাখ্যা দরকার। প্রথমত, এই নাটকে দুর্বলভাবে হলেও এই সময়ের স্পন্দনকে ধরার একটা আন্তরিক চেষ্টা রয়েছে। এই নাটকে যে-বাস্তবতার ছোঁয়া লেগেছে, তা সাতাত্তর-উত্তর এই সময়ের জটিল বাস্তবতা—যেখানে সাধারণ মানুষ এখনও সন্ত্রস্ত হয় মস্তানবাহিনীর উপদ্রবে, রাজনৈতিক মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীরা তোলা তোলে, পয়সা খায়। যদিও এখানে একটি আপোসের চেষ্টাও আছে, যেমন—এই মস্তানবাহিনীকে দেখানো হয়েছে পশ্চিমবাংলার প্রাক্তন শাসক দল তথা কংগ্রেসের আশ্রিত দল হিসেবে। এখানে অবশ্য একটি সংগত প্রশ্ন উঠতে পারে—সত্যিই কি এলাকা কণ্ট্রোলকরা সমাজবিরোধীরা এখনও প্রাক্তন শাসক দলের অনুগত থাকে? নাকি, তারা ঝাণ্ডা বদলিয়ে আরো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায়? বিক্রমের মতো কংগ্রেসী মস্তান কি সত্যিই পুলিশকে ধমকিয়ে পছন্দ মতো কাজ করিয়ে নিতে পারে? আর যদি সত্যিই পারে, তাহলে তো এটাই প্রমাণ হয়—এই আমলেও কংগ্রেসী স্বৈরতন্ত্রের শিকড় এই রাজ্যে দৃঢ়প্রোথিত রয়েছে, এই পনেরো বছর পরেও! এতে নিশ্চয়ই বাম-জমানার মাহাত্ম্য বাড়ে না। তবে আর সত্য গোপন করে লাভ কি? বানতলা-বিরাটি ঘটানো সমাজবিরোধীদের আড়াল করা কেন? অবশ্য এইসব ছোটোখাটো আপোস সত্ত্বেও এই নাটক সমকালের জটিলতাকে অনেকাংশেই তুলে ধরেছে।

দ্বিতীয়ত, এই নাটকে নীরস রাজনৈতিক বক্তব্যকে মানবিক মূল্যবোধাশ্রিত করার একটি সচেতন প্রয়াস আছে, ফলে সামাজিক ও পারিবারিক যে সম্পর্কগুলি আজ সার্বিক অবক্ষয় ও নীতিহীনতার যুগে সংকটগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তাকে উন্মোচন করারও একটি চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এ নাটকে তাই রাজনৈতিক বিষয়বস্তু মানবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে

গেছে, বক্তব্যকে তাই কখনই ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে হয় নি। নাটকের প্রধান চরিত্র নান্টু সত্তর দশকের ব্যর্থ বিপ্লবের এক পরাজিত সৈনিক, পুলিশী সন্ত্রাসে তার ডান হাতটি অকেজো হয়ে গেছে। নান্টু আজ সমাজ-বদলের স্বপ্ন ভুলে গিয়ে একটি নিশ্চিন্ত নিরাপদ পারিবারিক আশ্রয়ে প্রিয়া বনিতার সান্নিধ্যে ছাপোষা গেরস্তর জীবনযাপন করে। এই জটিল সময় কিন্তু তাকে স্থির থাকতে দেয় না, একটি বাসে ছিনতাই বা ডাকাতির ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সে ক্রমশ জড়িয়ে পড়ে এলাকার জটিল রাজনৈতিক আবর্তে, মুখোমুখি হয় মস্তানবাহিনীর, যার নেতা বিক্রম তার একদা সহযোদ্ধা ছিল এবং পরে রং বদলিয়ে মাফিয়াসর্দার বনেছে। ইতিমধ্যে তার সংসারে এসে হাজির হয় তার সম্পর্কিত শ্যালক নরেশ, সে নাকি ইণ্টারভিউ দিতে এসেছে কলকাতায়। নরেশের অস্বাভাবিক চালচলন, কথাবার্তায় নান্টু সহ অনেকেই তাকে সেদিনের বাস-ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত বলে সন্দেহ করে। নান্টু এখন নিরুপদ্রব শান্ত জীবন চায়, সমস্ত ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে সে টেঁচে থাকতে চায় স্ত্রী মিনতিকে সঙ্গে নিয়ে। তবু তার অতীত তাকে ছাড়ে না, মর্মযন্ত্রণায় সে অস্থির হয়ে ওঠে, যে-স্বপ্ন দেখে একদিন সে দুরন্ত দুঃসাহসে মানবমুক্তির প্রসারিত আকাশে মেলে দিয়েছিল সমর্থ ডানা, সেই স্বপ্ন আজ ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে তার স্বপ্নদর্শী ডানাও; তবু তার ভাঙ্গা ডানার শব্দ আমাদের অনেকেরই বিবেকের আর্তনাদের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য নান্টু এক তুমুল ঘটনাসংঘাতের মধ্যে দিয়ে ফিরে পায় তার অতীতের আমিকে, এই উত্তরণে সমাপ্তি ঘটে নাটকের।

ওয়ার্কার্স থিয়েটার নবগঠিত নাট্যদল হলেও তার বেশ কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রীই অন্য দল থেকে এসেছেন এবং ইতিমধ্যেই তাঁরা শক্তিমান শিল্পী হিসেবে পরিচিত। ফলে, প্রযোজনাটির কোথাও আনাড়িপনার সামান্যতম চিহ্ন নেই, প্রয়োগ পরিকল্পনা এবং দলগত অভিনয় যথাযথ। তবু তার মধ্যে আমাদের বিস্ময়ে স্তব্ধবাক করে রাখেন বিক্রমের চরিত্রাভিনেতা এই নাটকের নির্দেশক স্বপন রায়। ছকে-বাঁধা মস্তানের টাইপ নয়, অজস্র ছোটো ছোটো কাজে স্বপন আমাদের এই চরিত্রটির মর্মমূলে পৌঁছে দেন। নান্টুর ভূমিকায় স্বপন ব্যানার্জীও অন্তর্মুখী অভিনয়ে চরিত্রটির তীব্র অন্তর্বেদনাটিকে অপরূপ দক্ষতায় আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তুলনায় বরং মিনতির ভূমিকায় মঞ্জু রাহা কিছুটা আড়ষ্ট। অপর মহিলা অভিনেত্রী মেনকা দাস পেশাদারী প্যাচ-পয়জার মেরে সহজেই দর্শকের হাততালি পেলেও একটু অতি অভিনয়ের

ঝোঁক তাঁর মধ্যে আছে। ইনস্পেক্টরের ভূমিকায় গোলাম কুদ্দুস বৈস্ত একটি কমিক রিলিফ চরিত্রকে সংযতভাবে প্রকাশ করেছেন, একটুও বাড়াবাড়ি করেন নি, যদিও সুযোগ ছিল প্রচুর। নরেশের ভূমিকাভিনেতা চয়ন রায়ও তাঁর চালচলন হাবভাবে চরিত্রটির অস্বাভাবিকতাকে মূর্ত করে তোলেন অনুপম নৈপুণ্যে। তবে আমাদের অবাক করেছেন শক্তি মাস্টারের ভূমিকায় শ্রী প্রভাত বসু, এক অসহায় পিতার নিরুপায় আর্তিও পরিণামে প্রতিবাদে ফেটে পড়া আশ্চর্য দক্ষতায় রূপায়িত করেছেন তিনি। আবহ ও মূল পারকল্পনায় দুলাল লাহিড়ীর পরিশ্রমী প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসনীয়।

অমল রায়

জ্যোৎস্নাময় ঘোষের গল্প

যে-কোনো রচনাই, যদি, অন্তত বিষয়ের দিক থেকে ঋজু ও ইতিবাচক হয়, তাহলে বিন্যাসের ঘাটতিটুকু পুষিয়ে যায় অন্যভাবে। জ্যোৎস্নাময় ঘোষ তাঁর প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্প-সংকলন 'অন্যধারার গল্প' আমাদের আশান্বিত করে।

জ্যোৎস্নাময়ের গল্পে বিষয়ের জটিল স্পর্শকাতরতা লেখকের তীব্র ও কখনো-কখনো নাটকীয় ভাষার দ্যুতিতে আরো আলোকিত ও সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে। প্রায় প্রতিটি গল্পেই, স্পষ্টভাবে শুধু দ্বিতীয় গল্পটিকে ('অক্ষক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাঙলার বুলা') বাদ দিয়ে, এক অব্যর্থ কৌতুকের ধারালো রশ্মি যাবতীয় রুক্ষতা ও অসঙ্গতিকে কেটে-কেটে উন্মোচিত করে। 'সংহিতার বিবর্তন ও গৃহস্থ রমাকান্তের গৃহ' গল্পে এক বিপন্ন, নিম্ন মধ্যবিত্ত একবেলার ঘটনা ও অনুভব স্পষ্ট অথচ তাৎপর্যময় হ'তে পেরেছে এই অবলম্বিত কৌতুকের সচেতন ব্যবহারেই। একই সঙ্গে প্রাচ্য ও পড়ন্ত মূল্যবোধের অটল অর্জন আর উপায়হীন অনাচারের চালাকি সম্বল ক'রে বেঁচে থাকেন বিরক্ত কমলাকান্ত। অবশ্য, 'বিরক্ত' বিশেষণেই তাঁর পরিচয় শেষ হয়ে যায় না। কারণ, তিলিতালিকার প্রকাশ্য স্নান, তরুণদের দুপুর-গল্প, রাস্তার কাঙাল, পরেশ ডাক্তার, চোরাকারবারী লক্ষ্মণ বোস ইত্যাদি বিস্তৃত প্রসঙ্গে তিনি সবসময় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হলেও, তাঁর মনের আকণ্ঠ বেদনার উচ্ছ্বাস ভ'রে ওঠে একক সহপাঠী, অধুনা-সচ্ছল বন্ধুর সহমর্মী উচ্চারণে। আবার, তাঁর ক্রোধের মাত্রাভেদ আছে। অন্য-কারো কাপুরুষতায় তাঁর যে উন্মত্ততা, তার সঙ্গে পার্থক্য রয়েছে মন্দির থেকে নিবেদিত দ্রব্যসম্ভার তুলে আনার সময় মন্দির কর্মচারীর বাধাদানে অধৈর্য বিরক্তির। এই সব নিয়েই রমাকান্ত, তাঁর মতো অজস্র নিঃসম্বল ভারতীয় স্বামী, পিতা ও সহপাঠী।

'অক্ষক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন ও ভাঙা বাঙলার বুলা' গল্পটি দেশভাগের ভয়ঙ্কর স্বরূপ একটি পরিবারের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার ভাষায় মেলে ধরেছেন

লেখক। নিঃশব্দে, কখনো-কখনো অনুচ্চ ইশারায় বুঝিয়ে দিয়েছেন সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের সুস্থ ও আরোপিত ব্যবহারগুলি। বুলার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নিপুণ অনুষঙ্গে অব্যর্থ হ'য়ে উঠেছে। চন্দনের সঙ্গে গভীরতম সম্পর্কে জড়িয়ে গিয়েছিল বুলা, কিন্তু, একসময়, চন্দনের কাপুরুষতার বিপরীতে ফিরোজের অনায়াস ও মুক্ত পৌরুষ অনিবার্য বিভায় জ্বলে উঠল, নিঃশব্দে, কিন্তু অনিবারণীয় তাগিদে চন্দনের জায়গা পেল ফিরোজ। কিন্তু, গল্পের শেষ হয়েছে তাদের নির্বিরোধ প্রণয়ে নয়, "ইতিহাসের আর-এক কালান্তক দাবানলে আমাদের সংস্কার আমাদের সঙ্কীর্ণতা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে"—তখন, সেই উত্তীর্ণ পরিবেশে সম্পূর্ণ হবে তাঁদের সম্পর্ক। এই ইশারাময় সমাপ্তির দীপ্তি গল্পের জটিল ও অন্ধকার ভাঁজগুলিকে সারবান করে তুলেছে।

'অবস্থান' গল্পটি ছোটো, কিন্তু সংহত ও তীব্রভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রতিষ্ঠান বিরোধী কিছু লেখকের উন্মত্ত আত্মসমর্পণের পাশাপাশি এক আদর্শবাদী লেখকের অবস্থানগত স্ববিরোধিতা উন্মোচিত হয়েছে এই গল্পে। "অমুক কাগজে লিখব না/বলাটা সহজ, কিন্তু বিকল্প কিছু গড়ে তোলার জন্য যে স্ট্রাগ্ল, সে-স্ট্রাগ্লটাই বা কোথায় তোমাদের?"—এই প্রশ্ন শুধু অনির বাবার নয়, অনির মতো লেখকদের জন্য গর্বিত ও চিন্তিত যে-কোনো শুভানুধ্যায়ীর মৌলিক জিজ্ঞাসা।

"বিদ্যাসাগরের জন্মসার্ধশতবর্ষ ও গ্রাম মধুবনীর নকুল মণ্ডল' গল্পে, স্বাভাবিকভাবেই, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আসল চেহারা মেলে ধরা হয়েছে। এইরকম ব্যঙ্গপ্রবন রচনা, বরং, বাংলায় লেখা হয়েছে বেশ কিছুই। গল্প তো আছেই অনেক, তাছাড়াও, মণিভূষণ ভট্টাচার্যের 'গান্ধীনগরে রাত্রি' কবিতা বইয়ের একাধিক কবিতায় এই প্রবণতাটিকে শিল্পসম্মত অবয়ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু জ্যোৎস্নাময়ের গল্পরচনার দক্ষতা এই গল্পটিকেও টানটান সাবলীলতা দিয়েছে। নকুলের উদ্দেশ্যে পাঠানো একটি নির্বিকার টেলিগ্রামের রহস্যভেদের পদ্ধতি ভারতবর্ষের মৌলিক দুর্গতির দিকে আমাদের চোখ ফেরাতে বাধ্য করে।

'কেন্দ্র-সংকট' গল্পে সামান্য অন্যরকম বিন্যাস। মাঝে মাঝেই ধূসর অবচেতনের স্পষ্ট ব্যবহার, অসমাপ্ত প্রসঙ্গ হঠাৎ বিষয়ান্তরে চ'লে যাওয়া গল্পকারের দক্ষতার প্রমাণ দেয়।

বামপন্থী দলগুলির অন্তর্গত মতবিরোধ ও অবিশ্বাসের ভয়ানক পরিণতি কী হ'তে পারে—'ধৃতরাষ্ট্র' গল্পটি জানিয়েছে। আদর্শগতভাবে পরস্পরবিরুদ্ধ

কয়েকটি যুবক, পারস্পরিক হানাহানির শেষে এক সময় আবিষ্কার করে, যে, তারা নিজেদেরই রচিত বধ্যভূমিতে পরস্পরকে নিয়ে—এসেছে, সামনে উল্লসিত প্রকৃত শত্রু। "মৃত্যুর আগে পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়াতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু জীবনেও যেমন, মৃত্যুতেও তেমনি ভিন্ন ভিন্ন শক্তির নির্দেশে, হাতে হাত রাখতে পারে নি তারা।"

"মাতঙ্গ" গল্পে নির্লজ্জ রাজনৈতিক নেতাদের চেহারা—মূলত ইন্দিরা গান্ধীর পতন—পুনরুত্থানের ছায়ায়—কেমন হয়, সচেতন ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ব্যবহারে তা স্পষ্ট করে তুলেছেন তিনি। এই ব্যঙ্গ ও কৌতুকের আঘাতেই জ্যোৎস্নাময়ের গল্প উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

'বিধ্বস্ত জলযান ও অলৌকিক আরোহীরা' গল্পটিও, 'কেন্দ্র সংকট' গল্পের মতোই, স্পষ্ট অথচ জটিল অবচেতনের ব্যবহারে। এমন কি ভাষা ও শব্দেও দ্রুত অসংলগ্নতা বজায় রেখে শেষ হয়েছে।

'তীর্থ' গল্পটি, আবার, স্বচ্ছ ও প্রকাশ্য বিন্যাসে রচিত। কিন্তু এই আপাত-স্বচ্ছতার আড়ালে রয়েছে সর্বাঙ্গ তীক্ষ্ণতা। শান্তিনিকেতনের অসার ও সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির হাস্যকর রসে দু'টি প্রজন্মের অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাসের আঘাতে-আঘাতে মেলে ধরেছেন তিনি। কোনো স্পষ্ট ও উদ্যত ভঙ্গির তুলনায় এই বিন্যাস অনেক আবেদনময় হয়েছে—সন্দেহ নেই।

'উত্তরাধিকার' গল্পের বিষয়—দুর্বৃত্তদের তাণ্ডব—জ্যোৎস্নাময়ের একাধিক সম্প্রতিকালের গল্পের অবলম্বন। নিরাপত্তাহীন তাই ভীরু, প্রতিবাদ-বিমুখ মানুষজনের কথা বলেছেন তিনি এই গল্পে, শিল্পীসুলভ মমতা ও নিরাসক্তি নিয়েই। তবে গল্পটিতে পৌরপিতা হিরণ্ময়ের প্রসঙ্গ নিখুঁত ও সুখপাঠ্য হলেও অনাবশ্যকভাবেই কিছুটা দীর্ঘ হয়েছে। যদিও, যে-নিপুণ ও চূড়ান্ত সচেতনতায় প্রসঙ্গটি বর্ণিত, তা-ই জ্যোৎস্নাময় ঘোষের গল্পের মৌল লক্ষণ। ইতস্তত নাটকীয়তাটুকু বাদ দিলে এই লক্ষণটিই আধুনিকতম ছোটগল্পের যোগ্যতম বৈশিষ্ট্য ব'লে চিহ্নিত হতে পারে।

সুমন গুণ

অন্য ধারার গল্প। জ্যোৎস্নাময় ঘোষ। প্রাতভাস। কুড়ি টাকা

সব কিছুতেই সাহিত্য হয়

প্রাক-বিপ্লব চীনে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টি-'হ্রদ, জলাশয় প্রভৃতিতে কীট-নাশক-তেল-দেওয়া বিরোধী' আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন। তাঁদের যুক্তি ছিল—এই তেল-দেবার ফলে জলাশয়গুলো বিষাক্ত হয়ে পড়ছে আর গ্রামের মানুষের পোষা হাঁস এবং পাখিরা সেই জল খেয়ে ধ্বংস হ'বার মুখে। পরিবেশ দূষিত হ'চ্ছে। তাঁদের সেই আন্দোলন বিশাল ব্যাপকতাও লাভ করেছিল।

মুনাফা-ভিত্তিক সভ্যতার মূল কথা—'সর্বোচ্চ-মুনাফা'। যত বেশি পণ্য, ততই মুনাফা। পণ্যই এই সভ্যতার 'খোদা', 'গড', বা 'ব্রহ্ম'। সুতরাং এই সভ্যতার লক্ষ্যই হ'চ্ছে সব-কিছুকেই পণ্য করে তোলা। সেখান থেকে মুনাফা লাভ করা। মানুষ আর মানুষের শ্রমশক্তি তো বটেই, মনুষ্য-নিরপেক্ষ প্রকৃতিও বা বাদ যায় কেন? মার্ক্স ওদের এই সর্বনাশা চরিত্র অনেক আগেই বুঝেছিলেন। তিনি সাবধানও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বোঝেন নি ক্ষমতা-মদ-মত্ত কিছু মানুষ প্রকৃতিকে ধ্বংস করে যারা মুনাফার পাহাড় গড়তে চায়—তাদের লাভের হিস্যা থেকে কিছু উচ্ছিষ্ট ক্ষমতাবানদের মুখ বন্ধ করিয়ে রাখে। আমরা কলকাতার ওপরেই দেখি—অপ্রতুল প্রাকৃতিক-সম্পদের ধ্বংসের ওপর মুনাফার জৌলুস ঘটে রডন-স্কোয়ার, সত্যনারায়ণ পার্কে। তাহ'লে উপায়? তাহ'লে কি ধ্বংস হয়ে যাবে—মনুষ্য-নিরপেক্ষ-পরিবেশ। থাকবে না সবুজ? পৃথিবী থেকে উবে যাবে নির্মল-জলরাশি, রঙ বেরঙের পাখি? কিন্তু তাহ'লে কি মানুষ বাঁচবে? যে মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রকৃতি উজাড় করে দিয়েছে নিজেকে, যে-প্রকৃতির সাথে, এবং প্রকৃতির ওপর কাজ-কর্ম করতে গিয়েই তার জ্ঞানের প্রথম পাঠ গ্রহণ করেছে মানুষ, মানুষেরই একাংশ আজ বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় তাকে শেষ করতে নেমে, শেষ করতে চাইছে মনুষ্য-প্রজাতিকে। যে-হেতু 'প্রজাতি'টার নাম 'মানুষ', তাই এটা সম্ভব নয়।

মানুষ কেমন করে এক টুকরো 'জলাশয়' বাঁচাতে এগিয়ে আসে তারই বর্ণনা করেছেন গল্প বলার ঢঙে, তরুণ সাহিত্যিক কিন্নর। কিন্নর ইতিমধ্যেই প্রতিবাদী গল্পকার হিসাবে স্বীকৃত। তাঁর ছোট গল্পগুলোর জন্যই তিনি খ্যাত। সম্ভবত এটা তাঁর প্রথম বড় বই। সতীপ্রসন্ন স্বচ্ছল নিঃসন্তান প্রৌঢ়। কলকাতার অদূরেই থাকেন। একটাই তাঁর আদর্শ—মানুষকে পরিবেশ সচেতন করে তুলবেন। এই আদর্শকে সামনে রেখে তিনি কখনও ছোটেন 'মেট্রো'-তে পরিবেশ নিয়ে কোন ভালো ছবি এসেছে কি না দেখতে,

কখনও বা পুরানো ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর পাতা পড়ে চলেন। নিজে প্রকাশ করেন একটা কাগজ। বড় বড় পেপার হাউসের সামনে পড়ে সেটাও ধুঁকতে থাকে। তবুও দশটা বছর তিনি সেটা টেনে চলেছেন। কিন্তু একদিন আবিষ্কার করলেন প্রাকৃতিক-পরিবেশকে গ্রাস করে যারা মুনাফা লুটছে, কাগজের জগতে তাদেরই সংস্করণ—একটা পেপার হাউস গিলে নিতে চাইছে তাঁর কাগজ 'পরিবেশ'-কে। হাতে ধরে যাকে তিনি লেখক তৈরি করলেন, যাঁর ওপর তাঁর কাগজ প্রায় পুরোটাই নির্ভর করে, তিনিই সতীপ্রসন্নকে না-জানিয়ে একটা বড়-পেপার হাউসের কাজে লেগে গেছেন। যা হয় আর কি! 'লিটিল ম্যাগ'-গুলো কাঁটালপাতা খাইয়ে ছাগল ছানাটাকে হৃষ্টপুষ্ট করেন বড় পেপার হাউসের থানে বলি হবার জন্য। মুষড়ে পড়লেন সতী-প্রসন্ন, কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। পাড়ার নেতারা টাকা খেয়ে একমাত্র জলাশয়টাকে বহুতল বাড়ির জন্য বিক্রি করে দিয়েছেন, গরীব মুসলমান বস্তীর বাসিন্দাদের দুর্দশার শেষ নেই। তাঁরা শঙ্কিত। প্রতিবাদ করতে পারছেন না। পাড়ার নও-জওয়ান মানুষ এগিয়ে এলেন। সতীপ্রসন্নকে ঘর থেকে টেনে নামালেন রাস্তায়। ফেস্টুন, পোস্টার হাতে, মানুষগুলো জলচর প্রাণীদের একমাত্র আশ্রয়—জলাশয়টা বাঁচাতে-সেটাকে ঘিরে রেখেছেন। বৃষ্টি হচ্ছে। যতটুকু জল সেঁচে ফেলা হয়েছিল—বৃষ্টিতে সেটা আবার পূরণ হয়েও যাচ্ছে। এমনি ভাবে প্রকৃতি নিজেকেই নিজে বাঁচাচ্ছে, সাহায্য করছে তারই শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ। সতীপ্রসন্নরা 'স্টাডি' ছেড়ে রাস্তায়।

তথ্যের ভারে ভারাক্রান্ত নয় বইটা, অথচ গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর তথ্য। অন্য সময়ে যে-গুলো পড়তে ইচ্ছা করে না, গল্পের মধ্যে সেগুলো কখন মুখস্ত হয়ে যায়। যেমন—কলকাতায় কত ফাঁকা জমি দরকার, কত আছে, সে গুলোরই বা কি অবস্থা। প্রতিদিন কত জঞ্জাল জমা হয়, জঞ্জাল থেকে কি পরিমাণ দূষণ হয়। কলকাতা করপোরেশনের ময়লা নিকাশী ব্যবস্থাটা কি রকম ইত্যাদি।

পরিবেশ নিয়ে যাঁরা এত হৈ-চৈ করেন, তাঁদের আসল দুর্বলতা কিন্নর ঠিকই ধরেছেন, আর ধরেছেন বলেই তাঁর নায়ক—হতাশায় ভেঙে না পড়ে রাস্তায় নেমেছেন।

আজিজুল হক

প্রকৃতি পাঠ: কিন্নর রায় / দে'জ পাবলিশিং ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

'দর্শক'-এর তিরিশ বছর

১৯৬০ থেকে ১৯৯০—দীর্ঘ তিরিশ বছর অতিক্রম করে 'দর্শক' এখন একতিরিশে। এখনও তার যৌবনদীপ্তি প্রখর। তিরিশ-পূর্তির সেই দৃপ্ত যৌবনকে নন্দিত করার মানসে ১১ মে '৯১ তারিখে কলকাতা সদর স্ট্রীটে এক আত্মীয়-ঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভিন্ন ভাষাভাষী অনুরাগীগণ উপস্থিত ছিলেন সেই অনুষ্ঠানে।

'দর্শক'-এর আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকে সংপৃক্ত অমৃতময় মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করার পর সেই সময়কার সুধীজন একে-একে স্মৃতিচারণ করতে থাকেন। চিত্রকর চারু খান 'দর্শক'-এর সঙ্গে তাঁর গাঢ় সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করেন। নির্মলেন্দু মান্না স্মৃতিধৃত অসংখ্য ঘটনার কথা বলেন। সুধীর কুমার করণ ও কার্তিক লাহিড়ী বক্তৃতা প্রসঙ্গে পত্রিকার দীর্ঘ আয়ুষ্কাল কামনা করেন।

কবি অমিতাভ দাশগুপ্ত তাঁর ভাষণে 'দর্শক' ও সম্পাদক দেবকুমার বসুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা জানান। তাঁর প্রস্তাবমত দর্শক-এর অন্যতম প্রাণপুরুষ শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে এক মিনিট কাল নীরবতা পালন করা হয়।

শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় 'দর্শক'-এর জন্মকাল থেকেই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তাঁর প্রায় দুই শতাধিক অনবদ্য রেখাচিত্রসমূহ পত্রিকার মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। সেইকালে যে বুধগোষ্ঠী 'দর্শক'-এ সমবেত হতেন তাঁদের আলোচনা ও প্রচেষ্টায় 'দর্শক' পত্রিকার জন্ম। 'চলমান বিশ্বকোষ' প্রয়াত বিনয়কৃষ্ণ দত্ত ছিলেন পুরোভাগে। তিনিই নাম রাখেন 'দর্শক'—উদ্দেশ্য জীবনকে সত্যরূপে দর্শন করা, বিশ্বসংস্কৃতির রূপ ও রূপান্তরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করা এবং স্বদেশের ঐতিহ্য ও গরিমাকে নিষ্ঠাসহকারে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার, ভোলা চট্টোপাধ্যায় (ভি. সি.) ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, রবি মিত্র ও শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় লেখায় ও রেখায় মনো-

নিবেশ করেন বলা বাহুল্য, স্বাতন্ত্র্যে ও চরিত্রে প্রকাশমাত্রই দর্শক বিশিষ্ট পত্রিকারূপে গণ্য হয়। ভারতীয় লোকসভায় একাধিকবার আলোচনা হয়েছে এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটিকে নিয়ে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে লোকসভার মিনিট বুক-এ ; অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় যিনি লোকসভার অন্যতম সম্মানীয় সভ্য ও খ্যাতিমান বক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং বর্তমানে কলকাতার বাসিন্দা —খোঁজ নিলে তাঁর কাছেও এ-তথ্যের সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে।

আর্থিক আনুকূল্য বিশেষ না থাকলেও, আজকের প্রজন্মের কাছে এসব অলীক বলেই মনে হবে, তবু এটা সত্য! কারণ,'দর্শক' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হলেও পৃথিবীর প্রায় সব বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ই তার গ্রাহক তালিকাভুক্ত।

বহু বিচিত্র ধরনের লেখা ছাপা হয়েছে দীর্ঘ তিরিশ বছরে এই পত্রিকাটিতে। সবই সংশ্লেষণ ধর্মী ও তথ্যপূর্ণ। দেশের ও বিদেশের সাহিত্য, শিল্প-স্থাপত্য, শিক্ষা, অভিনয়, সভ্যতা ও ঐতিহ্য—সব কিছু নিয়েই নানা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একটা ছোট পত্রিকার চরিত্র-রক্ষার্থে এই নিষ্ঠা ও উদ্যম বিস্ময় জাগায় বই-কি।

'দর্শক'-এর এই ঐতিহ্য ও গরিমার কথা আরও অন্যান্য বক্তা নানাভাবে সেদিন উল্লেখ করেছেন। তাঁর ফাঁকে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার গীতিরূপ পরিবেশন ন গায়ক অধ্যাপদ প্রণব দাশগুপ্ত। স্বরচিত গান শোনান অনুকূলচন্দ্র দাস ও গণসংগীত শিল্পী অজিত পাণ্ডে। বক্তব্য পেশ করেন— ভাষাতত্ত্ববিদ্ গুরুচরণ মুর্মু। সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় নাট্যাচার্য শিশির-কুমারের উপর এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। রসসাহিত্যিক কুমারেশ ঘোষ স্বভাবসিদ্ধ সরল ভাষণে পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন চারণকবি বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণকুমার চক্রবর্তী ও কৃষ্ণা রায়। উল্লেখযোগ্য যে প্রবীণ হিন্দীভাষী কবি নথমল কেডিয়া কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের আনন্দ দেন।

ডক্টর জগন্নাথ ঘোষ ও রঞ্জিত রায়চৌধুরী ছিলেন যুগ্ম আহ্বায়ক। অনুষ্ঠানটি সুচারুরূপে পরিচালনা করেন দেবকুমার বসু।

সম্রাট সেন

অভিনন্দিত নাট্যকার চন্দন সেন

এবছর রাজ্য সরকারের পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাডেমি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে মনোনীত করেছেন চন্দন সেনকে। আরও উল্লেখ্য যে, তাঁর 'দায়বদ্ধ' নাটকটি এবার শিরোমণি পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

চাকদহ স্কুলের শিক্ষক চন্দন এখন পশ্চিমবাংলার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলনে এক অপরিহার্য নাম হয়ে উঠেছেন। সায়ক নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর সংযোগ সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে। তাছাড়া এ রাজ্যের বাইরে এমনকি বাংলা-দেশেরও বহু নাট্যদল নিয়মিত তাঁর বিভিন্ন নাটক অভিনয় করে যাচ্ছেন। লেবেদফ.ড্রামা সার্কেল-এর স্রষ্টাও তিনি। তাঁর 'দুই হুজুরের গল্প', 'সোনার মাথাওয়ালা মানুষ', 'জ্ঞানবৃক্ষের ফল', পুশকিনের জীবন নিয়ে লেখা 'ঝড়ো পাখি' থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসাধন্য সাম্প্রতিক 'দায়বদ্ধ' নাটকটি একজন প্রগতিশীল নাট্যকারের উত্তরণের পথরেখা উজ্জ্বলভাবে চিহ্নিত করেছে। ভারতীয় গণসংস্কৃতি সংঘের অন্যতম প্রাণপুরুষ এই মানুষটির দায়বদ্ধতা ও শিল্পচেতনা আমাদের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকে আরও গতিময় ও সমৃদ্ধ করুক। তাঁকে আমাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন ও ভালোবাসা জানাই।

অরিন্দম রায়চৌধুরী

ব্রোঞ্জ ও চিত্রে সোমনাথ হোর-এর মরমী 'ক্ষত' প্রদর্শনী

ক্ষত : মননের-সমাজের-রাষ্ট্রের।

ক্ষত : ব্যক্তি মানুষের। ক্ষতের যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে যায় প্রকৃত অনুভবী সৃষ্টিকামীকেই। যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অনাহার, চতুর্দিকে মানুষ আর প্রাণীর দুঃসহ হাহাকারের ক্ষত সেভাবেই একজনের মধ্যে ঝড় তোলে, যে জানে ঝড়ের প্রকৃত ভয়াবহতা। স্বাধীনতার পুর্বে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে কিশোর শিল্পী দেখতে গেলেন ভয়াবহতার সেই রূপ। তুলির টানে এবং কলমের ছন্দের আঁচড়ে ধরে রাখতে হবে সে ইতিহাস। কেন না তিনি শুধু চিত্রী নন, রিপোর্টারও।

বোমার আঘাতে পেট ফাঁপা মোষ-ছাগল,ক্ষেতে বোমার ঘায়ে ক্ষত-বিক্ষত মৃত নারী দেখতে দেখতে ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল শিল্পী। আর্তের চেহারা দেখে মনে মনে লজ্জায় কুঞ্চিত শিল্পী। পার্টির নির্দেশ—ব্যক্তি-স্বার্থ বৃহত্তর মানব-স্বার্থে ত্যাগ করতেই হয়। মানসিক দুর্বলতা ঠেলে কর্তব্যে অবিচল শিল্পীকে তাঁর কাজ করে যেতেই হবে। তুলির আঁচড়ে ধরে রাখতে হবে তাৎক্ষণিক সেই সব ঘটনার দৃশ্যাবলী।

স্মৃতি বড়ো যন্ত্রণাময়। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে সভ্যতার এই বীভৎসা, অবধারিত মৃত্যুর পিঠে পিঠ দিয়ে মানুষের এই বেঁচে থাকা শিল্পীর চোখে 'ক্ষত' হয়ে দেখা দিল। এই শিরোনামশোভিত শিল্পীর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি, আচার্য জগদীশ বোস রোডের 'সুখসাগর'-এ। উদ্যোক্তা সীগাল বুকস। শিল্পী সোমনাথ হোর।

ক্ষত-র আরো এক ব্যাখ্যা দিলেন শিল্পী নিজেই – 'সামাজিক জীবনের অসাম্য—কিছু লোক উপার্জন করছে, বিলাসিতা করছে, অন্যদিকে বিপুলতর অংশ খেতে পাচ্ছে না, বিলাসহীন জীবন-যাপন করছে, এটাই আমার কাছে ক্ষত।' দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে পোড় খাওয়া, কমিউনিস্ট শিল্পী চিত্তপ্রসাদের অনুসন্ধী সোমনাথ হোর প্রকৃত অর্থেই আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের যে বিরোধী, তা তাঁর চিত্র ও ভাস্কর্য দর্শন মাত্রেই অনুভূত হয়।

আগেই বলা হয়েছে, তাঁর ছবি আঁকার শুরু দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধের যারা শিকার, তাদের নিয়ে। কিন্তু এরও আগে ৪০-৪১ সালে সোমনাথবাবু কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন। চোখের সামনেই দেখেছেন ভিয়েতনামের মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম, দেখেছেন সত্তরের দশকের বামআন্দোলনের অন্তর্ঘাতী হিংসা, দেখেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। প্রতি ঘটনার প্রতিফলন, ঘাত-প্রতিঘাত পড়েছে তাঁর মনে। সত্তরের দশকের ঘটনা-পরম্পরা সম্বন্ধে তিনি বললেন—'৬৯-৭০ সালে বাম-আন্দোলন যখন অন্তর্ঘাতী হিংসায় আচ্ছন্ন হলো, সমাজবিরোধীদের হাতে চলে গেল, বীভৎস চেহারা নিল, বিচলিত হলাম। কাটা হাত পা'র জায়গায় 'ক্ষত' বেরিয়ে এলো। এখানে বিষয়বস্তু হিসেবে শরীরটা বড় কথা নয়, ক্ষতের চেহারা কী হতে পারে তা কাগজের ওপর করি এবং শৈল্পিক রূপ দেবার চেষ্টা করি। ভালো-মন্দর বিচার সময় করবে।'

ছবি আঁকার আদিপর্ব সম্পর্কে তাঁর স্বীকারোক্তি—'কিছুদিনের মধ্যেই তেতাল্লিশ বা পঞ্চাশের মন্বন্তর এলো। তখনই কমিউনিস্ট চিত্রশিল্পী চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। উনি আমাকে রাস্তায় রাস্তায়, হাসপাতালে সঙ্গে নিয়ে হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন—কী করে ভুখা এবং অসুস্থদের ছবি আঁকতে হয়। আমি কাঁচা হাতে তাই করতে লাগলাম। পার্টি থেকে রঙ তুলি কাগজ কিনে দেওয়া হলো। আমি পোস্টারে দুর্ভিক্ষের ছবি এঁকে বন্ধুদের সহায়তায় গ্রামে দেখিয়ে এক নতুন ধরনের আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লাম। কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটি খুব উৎসাহ দিল। কিছু কিছু 'জনযুদ্ধ'; 'পীপল্‌স্ ওয়ার'-এ ছাপাও হলো। গণনাট্য সংঘের গান, আমাদের পোস্টার তখনকার দিনে এক নতুন হাওয়া তৈরি করল। ...এ সবের মধ্য দিয়ে আমি চট্টগ্রাম শহরে পার্টির সদর দফতরে সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করলাম। ছবি আঁকা, পোস্টার করায় আমার অসীম উৎসাহ। কিন্তু তখনও আমি মৌলিক রচনায় স্বচ্ছন্দ নই।' সেই তিনিই ১৯৪৫ সালে পি. সি. যোশীর আগ্রহে এবং নিখিল চক্রবর্তী ও স্নেহাংশুকান্তি আচার্যের সহযোগিতায় সরকারী আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। এবং এর পরবর্তী সময় থেকে এখনো পর্যন্ত তিনি শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। '৪৭ সালে যিনি উড এনগ্রেভিং-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন, তিনিই '৪৯-এর আত্মগোপন পর্বে লিনোকাট আর পোস্টারে নিমগ্ন থাকেন। আর্ট স্কুলে থাকাকালীন জয়নুল

আবেদীনের প্রত্যক্ষ শিষ্যত্বে তিনি করণকৌশলের ওপর বিশেষ জোর দেন। সেই নব আবিষ্কারের নেশায় এখনো তিনি মেতে আছেন।

শিল্পী-জীবনের দীর্ঘ যাত্রাপথে শিক্ষকতার সঙ্গে নিজস্ব উদ্ভাবনীর নেশায় এখনো তিনি ব্যাপৃত। ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ছাপচিত্র বিভাগ গড়ে তোলা, দিল্লী পলিটেকনিকের শিল্প-শিক্ষা বিভাগে ছাপাই চিত্র বিভাগের দায়িত্ব নেওয়া, শান্তিনিকেতন কলা বিভাগে যোগদান এবং এরই মধ্যে কাঠ খোদাই ছবি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রঙীন এচিং নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও তিনি নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

১৯৭০ সালের গোড়ায় হ্যাণ্ডমেড পেপার পাল্পের ওপর তিনি প্রথম সৃষ্টি করেন 'উণ্ডস্' বা 'ক্ষত'। সাদা কাগজের ওপর সামান্য রক্তরঙীন ছোঁয়া-তা-ও করেছিলেন কয়েকটি। জাপানে এই নতুন ধরনের কাজের প্রদর্শনীটির নাম কিন্তু ছিল 'হোয়াইট অন হোয়াইট।' '৭৭ সালে সোমনাথ হোর মেতে ওঠেন ভাস্কর্যে। তাঁর নিজেরই কথায়—'১৯৭ -এর মে মাসের গোড়ায় ভিয়েতনামের জয় ঘোষিত হলো। দীর্ঘ ২৯ বছর এই অসম-সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে দূরে অবস্থান করেও আমরা নানাভাবে এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সমগ্র এশিয়ার সংগ্রামী মানসিকতা প্রতি মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার আগ্রাসী কর্মকাণ্ডকে অবিচল এবং অবিরাম ভাবে ধিক্কার জানিয়েছে। আমার ভেতর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক নতুন কল্পনা রূপ নিল। ব্রোঞ্জে তৈরি করলাম এক মাতৃমূর্তি—বিদীর্ণ বক্ষে কমলবেষ্টিত ঊর্ধ্বমুখী নবজাতক, যার বিভায় উদ্ভাসিত ভিয়েতনামী মাতৃত্ব। উন্নতশির মাতা তাকে নিশ্চিত আশ্বাসে বক্ষে ধারণ করেছেন। ছাপচিত্রের নানা কাজের সঙ্গে প্রায় আড়াই বছর ধরে কাজ করার পর এই মূর্তি যেদিন শেষ হলো, সেই দিনই রাতের অন্ধকারে (৩ নভেম্বর ১৯৭৭) চিরকালের জন্য সেটি হারিয়ে গেল। চল্লিশ ইঞ্চি উঁচু ও চল্লিশ কেজি ওজনের এই মূর্তি সরানো যথেষ্ট কঠিন কাজ ছিল।'

বিনোদবিহারী, রামকিঙ্কর, দীনকর প্রমুখ শিল্পীদের সান্নিধ্যধন্য সোমনাথ হোর-এর শান্তিনিকেতনের জীবন শুধুই শিল্পসৃষ্টির জন্য এক গভীর অভিনিবেশে মগ্ন থেকেছে। একের পর এক ঘটনা-পরম্পরার মানসিক ক্ষত চিন্তনের আবর্তে, ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় প্রতিফলিত হয়েছে ভাস্কর্যে। এখানেও তিনি অনন্য। সৃষ্টির মুহূর্তে তাঁরই স্বীকারোক্তি—'...১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশে এক নতুন খেলায় মেতে উঠলাম। আমাদের ভাস্কর্য বিভাগের ছাত্র চন্দ্রবিনোদ পাণ্ডে

এবং আরো তুয়েকজন অপ্রয়োজনীয় মোমের টুকরো ফেলে দেয়; আমি তাই জুড়ে জুড়ে মূর্তি তৈরি করি—উদ্দেশ্যহীনভাবে। চন্দ্রবিনোদের তা ভালো লেগে গেল। সে বললো, এগুলি ব্রোঞ্জে ঢালাই করব। প্রথাবহির্ভূত বলে বিপুল উদ্যোগে এবং পরিশ্রম করে সেগুলি ঢালাই হলো। অবসর-যাপন আমার চুলোয় গেল। আমি নতুন মাধ্যমে জড়িয়ে গেলাম। পুরনো-ধ্যান-ধারণা (কনসেপ্ট)—ক্ষত। মোমের টুকরো, মোমের ডাটি, আগুনে তাতানো ছুরি, ল্যাম্পের শিখা—এসব নিয়ে নতুন 'ক্ষত চিন্তা'। …১৯৮৩ সালে কলাভবন থেকে পাকাপাকি-ভাবে অবসর নেওয়ার পর মনে হলো, আবার ব্রোঞ্জের কিছু কাজ করব। আমাদের লাল বাঁধের গ্রামের নিজস্ব বাড়িতেই ভাটি, ধাতু গলানোর উনুন ইত্যাদি প্রস্তুত করা হলো। খাঁটি মধু জাত মোম থেকে পাত তৈরি করে, কখনও নমনীয় কখনও ভঙ্গুর পাত টুকরো করে, ভেঙেচুরে, বিভিন্ন আকারের ভাঁটির সাহায্যে সেগুলিকে দাঁড় করিয়ে 'ক্ষত'রই অন্য এক মাত্রার সন্ধানে যাত্রা শুরু করলাম। আমার এই কাজগুলিকে ভাস্কর্য বলে চিহ্নিত করতে অস্বস্তি হয়। এর ওজন নেই, বস্তুপুঞ্জ নেই, আয়তন নেই। আছে শুধু ক্ষতরূপ। তবে অবয়বে হাওয়া খেলে। এগুলো ব্রোঞ্জ বলাতেই আমার স্বস্তি।'

সত্তর উত্তীর্ণ শিল্পীর শান্তিনিকেতনের লাল বাঁধের আস্ত বাড়িটাই শিল্পের কর্মশালা। স্ত্রী রেবা হোর ও একমাত্র কন্যা চন্দনাও শিল্পী। রেবা হোর চিত্র রচনা ও পোড়া মাটির ভাস্কর্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। চন্দনা সম্প্রতি ললিতকলায় নিজস্ব চিত্র-জগত আবিষ্কারে মগ্ন। একই পেশায় নিবেদিতপ্রাণ গোটা একটি পরিবার—এও এক তুর্লভ নজির। তুর্লভ ব্যতিক্রম।

ছোট-বড় মিলিয়ে একচল্লিশটি ব্রোঞ্জ 'ক্ষত' মূর্তি; পেন-ইঙ্ক প্যাস্টেল, ব্রাশের টানের তিরিশটির মতো স্কেচ; ছটি লিথো (রঙীনসহ), তেইশটি হোয়াইট অন হোয়াইট—এই নিয়ে উণ্ডস্ বা ক্ষত-র সাম্প্রতিকপ্রদর্শনী সোমনাথ হোর-এর বৃহৎ পূর্বাপর প্রদর্শনী। এবং যেহেতু তাঁর ছাপাই ছবি, স্কেচ, হোয়াইট অন হোয়াইট ইম্প্রেশন দর্শকসাধারণের আগে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, সেহেতু ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের এই বিরাট প্রদর্শনী তাঁদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চমক। কেতাবী ভাষায় ভাস্কর্যের ওজন, বস্তুপুঞ্জ প্রভৃতি নিয়ে যে- তাত্ত্বিক মতামতই থাকুকনা কেন, নিঃসঙ্কোচে মেনে নিতে অসুবিধে নেই যে, এগুলি ভাস্কর্যই।

প্রদর্শনীর সর্ববৃহৎ কাজ 'পথের পাঁচালি ১৩৫০'(ফুটপাথ ১৯৪৩)। অস্থিসার দম্পতির মৃত শিশুকে সামনে রেখে ক্রন্দন। ক্ষুধায় বিকৃত তাদের মুখ। পেছনে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা শূন্য পাত্র হাতে কন্যা। মুহূর্তে এক বোবা কান্না অথবা পরিবেশের ভয়াবহতা চলচ্ছক্তিহীন নির্বাক করে দেয় দর্শককে। কালো ইটে পথ পরিকল্পনার উপস্থাপনাও দৃষ্টিনন্দন। আর এভাবেই ঘুরতে ঘুরতে প্রেমিক-প্রেমিকা যুগলকে, গুড়িসুড়ি বসে থাকা খেঁকি কুত্তাকে, ঘাড়ে দুহাত দিয়ে চিন্তান্বিত বসে থাকা পুরুষ মূর্তিকে, জড়োসড়ো পাঁচ বোনকে, ফাঁপা পেটের মোষকেও দর্শক দেখে একই নিবিষ্টতায়। এবং প্রতি মূর্তির সামনে, বিপন্ন বিপর্যস্ত-আর্ত-নিরন্ন মানুষের হাহাকার, দরিদ্র ও নিপীড়িতে যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে যেতে হয়। শিল্পের এখানেই সার্থকতা। শিল্পীর মনের ক্ষত চাড়িয়ে যায় দর্শকেরও মনে। অপার ভাবনায় নিমজ্জমান হন দর্শক।

দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা তাঁরই কাছে জানা—'দুর্ভিক্ষে কলকাতার মানুষ মারা যায়নি। চট্টগ্রামসহ অন্যান্য গ্রাম থেকে আসা মানুষেরা মারা গিয়েছে। শস্য বোঝাই হাজার হাজার নৌকো শত্রুবাহিনী যাতে ব্যবহার না করতে পারে, এই অজুহাতে নষ্ট করে দেওয়া হয়। ষাট শতাংশ শস্য এভাবে নষ্ট করা হয়েছিল। সব খাদ্য মজুতদারদের ঘরে চলে গেল। ইস্পাহানি, হেমেন দত্ত (এ বিষয়ে হিন্দু মুসলিমের এক পরিচয় 'মজুতদার' সব মজুদ করে রাখে।' সেই দুর্ভিক্ষ পিড়ীতদের তিনি অন্তর দিয়ে দেখেছেন। সামাজিক এই বৈষম্যও তাঁর কাছে 'ক্ষত'।

প্রদর্শিত মূর্তিগুলির নামকরণ থেকেই অনুমান হয়ে যায় শিল্পী সোমনাথ হোর কাদের কথা বলতে চান। মূর্তিগুলির নামকরণে ব্যবহৃত চলতি শব্দ। দিনমজুর, শিশু, সুপ্ত কিশোর, সাথী, বাউল, দিদির সঙ্গে, অন্ধ বালক, আর্তি, পথমাতা, থালা হাতে কিশোর, যুগল বন্দী, খেঁকি, মহিষ, ছাগী, চন্দ্রাহত, মিথুন, ক্ষুধা, প্রার্থনা প্রভৃতি ছোটই হোক বা অপেক্ষাকৃত বড় হোক মূর্তিগুলিতে নেই কোন ভণিতা। কারণ কৌশলের অসামান্য দক্ষতায় স্বল্প পরিসরে দেশ-কালের নিরিখে ঘটনা বা মুহূর্তের সাবলীল ভাব প্রকাশ। এ তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, যুগল বন্দী ভাস্কর্যটির। সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় এ মূর্তি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ক্রশ দুটি হাতের ওপর স্থাপিত দুটি মুখ। একটি তার মুসলিম অপরটি তার হিন্দুর। সম্প্রীতির এই সমুজ্জ্বল উপস্থাপনা প্রদর্শনীকে অন্য মাত্রা দেয়। একই ভাব রঞ্জিত অন্য

ভাস্কর্যটির নাম 'দ্বৈত'। একই বন্ধনে আবদ্ধ শিহরিত দুজনার বসে থাকা। শীর্ণ-জীর্ণের এফেক্ট আনার জন্য হাত-পায়ের স্থলে ছাঁচ বা আধার হিশেবে ব্যবহৃত বাঁশ। শরীরের অন্য অংশে প্রয়োজনমাফিক ভঙ্গুর ব্রোঞ্জ পাত। নিপুন কারিগরের এ এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাস্কর্য ধারা।

তিনিই বলতে পারেন—'কাজ করে আনন্দ পাই। যে কোন শিল্পকর্মে বেদনার মুহূর্তগুলিও আনন্দ ঘন হয়ে উঠতে পারে। কণ্ঠ সঙ্গীতে নাভিমূল থেকে যে ধ্বনি প্রচণ্ড শক্তিতে উৎক্ষিপ্ত হয়, সেতারে ক্রীড়ারত অঙ্গুলি যখন ক্ষত বিক্ষত হয়, তখন শারীরিক কষ্টের অবধি থাকে না, কিন্তু শিল্পীসত্তা তাকে অতিক্রম করে এক অতীন্দ্রিয় আনন্দলহরীতে।' সেই তিনিই বলতে পারেন—'রাজনীতি ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব ভাবনা, তাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিল্পী শিল্পরচনাও করতে পারেন। কিন্তু রসানুভূতির অভাব ঘটলে, তাতে আওয়াজ হবে, সঙ্গীত হবে না।'

প্রদীপ পাল

প্রয়াত মণীন্দ্র চক্রবর্তী স্মরণে

আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলে প্রগতি সাহিত্য ও কমিউনিস্ট আন্দোলনকে যাঁরা একটি বিন্দুতে মেলাতে চেয়েছিলেন, সদ্য-প্রয়াত মণীন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন তাঁদেরই প্রথম সারির পদাতিক।

ওপার বাংলার ফরিদপুর জেলার উনশিয়া গ্রামে ১৯৩৮-এ তাঁর জন্ম। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ১৯৫৮-য় রাজ্য সরকারের খনি ও খনিজ-সম্পদ বিভাগে চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৬৪ থেকে আসানসোলে মণীন্দ্রবাবুর কর্মজীবন শুরু হয়। সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি একেবারে গোড়ার পর্ব থেকেই তিনি ছিলেন কর্মচারী আন্দোলনেরও অন্যতম সংগঠক।

১৯৬৬ এ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প 'খোঁয়াড়'। পরবর্তীকালে 'পরিচয়'-এ তাঁর আরও দুটি গল্প বেরোয়—'উপমহাদেশ' এবং 'প্রতিভার সন্ধান ও স্বীকৃতি'।

'কালান্তর' পত্রিকার রবিবারের পাতায় প্রায় আড়াই দশক ধরে লিখে গেছেন তিনি। খনি অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সে-সব লেখা থেকে বাছাই করে ১৯৭৯-এ প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কালান্তরের গল্প'। এরপর মনীষা গ্রন্থালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ফুটবল ও জীবন'। তাছাড়া দুটি কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর—'প্রতিদিন' এবং 'আনবিক মানবিক'।

একজন দায়িত্বশীল রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে সব ধরনের কাজে অংশগ্রহণের ঔদার্য তাঁর ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন তাঁকে যেমন আহত করেছিল, পেরেস্ত্রোইকা তাঁকে ঠিক ততখানিই উজ্জীবিত করেছিল, মস্তিষ্ক সংকোচন রোগে ভুগছিলেন কয়েক বছর। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ ঘটে ১৯৮০-তে। এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে গেছেন তিনি। আমাদের এই ঘনিষ্ঠ সহযোগীর কর্মিষ্ঠ স্মৃতি অম্লান থাকুক।

অমিতাভ দাশগুপ্ত